নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন

এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

প্রকাশক ঃ
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক ,প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

আর তাহলেই মানবীবিদ্যাচর্চার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে গবেষণা কাজে ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন সাহায্য করায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ মাওলা ব্রাদার্সের পরিচালক আহমেদ মাহমুদুল হক-এর প্রতিও, গ্রন্থমালা প্রকাশের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন বলে। তবে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রাবন্ধিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি, সেজন্য অভিভূত। আগামীতে আমাদের পরবর্তী উদ্যোগে তারা একইভাবে সহায়তার হাত প্রসারিত করে দেবেন বলে আশা করি।

তথ্যসূত্র

ইসলাম, মাহমুদা (২০০২), *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, ঢাকা : জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেসন্স।

Phillips, Anne (1994), *The Polity Reader in Gender Studies*, Cambridge: Polity Press.

UNDP. United Nations Development Program (1995), *Human Development Report 1995*, UNDP: New York.

সেলিনা হোসেন
মাসুদুজ্জামান

সূচিপত্র

রাজনীতি

আন্দোলন

রাজনীতি

নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও নারী

নাজমা চৌধুরী

প্রারম্ভিক মন্তব্য

নারীর ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। নারীর সবল ও সচেতন অস্তিত্বের বিকাশ ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য :

- নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ;
- নারীর জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ;
- নিজের সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিমণ্ডল, পরিধি ও সম্ভাবনার বিস্তার।

উল্লিখিত সকল উপাদানকে নারীর ক্ষমতায়নের পরিমাপক রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নের বস্তুগত, পরিবেশগত, আইনগত ভিত অনেক দেশেই কমবেশি বিদ্যমান। বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তবতা নারীর প্রতি গভীর বৈষম্যের ইঙ্গিত করে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। এ-ও প্রতীয়মান হয় যে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা দুর্বল—উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে। অথচ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের প্রধান উৎস ও বিচরণক্ষেত্র। ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত হয়েছে ১২টি বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে নারীর অনগ্রসরতা, পশ্চাদপদতা তীব্র মাত্রায় বিরাজমান।

নারীর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে বিশ্ব নারী সম্মেলনের বক্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রনিধানযোগ্য। কেননা, বিশ্বের বিরাজমান অবস্থা সামগ্রিকভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্রীপর্যায়ে প্রস্তুতি বৈঠক হয়। আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং নারী-পুরুষের সমতা ও

সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সকল বৈষম্য নিরসনে কৌশল উদ্ভাবন করা হয়, যা বেইজিং সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় ইনপুট রাখে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে গৃহীত জাকার্তা ঘোষণা ও জাকার্তা কর্ম-পরিকল্পনায় 'ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের অসম সম্পৃক্ততা' বৈষম্যের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং 'নীতি নির্ধারণ ও ক্ষমতায় নারীদের প্রবেশে সহায়তা প্রদান'-এর জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করা হয়।

এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম একজন নারী সরকারপ্রধানের পদ লাভ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা প্রণয়নের ব্যাপারে নারীরা বাদ পড়েছে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় তারা স্বল্পসংখ্যক আসন লাভ করে থাকেন। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের উচ্চ পদে নারীর উপস্থিতি অত্যন্ত স্বল্প। নারী-পুরুষের বৈষম্যের ধারণা রাজনৈতিক দলের ঘোষণা, নথিপত্র ও নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নারীর সমঅধিকারের নিশ্চয়তা স্বতন্ত্র আইন দ্বারা কার্যকর করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এ ধরনের অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে পদেক্ষপ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকারকে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়। আইন সভা, মন্ত্রণালয় ও সিভিল সার্ভিসের উচ্চতর পদে এবং বিচার বিভাগে নারীর উপস্থিতি ২০০০ সন নাগাদ অন্তত ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকল কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সরকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও কোটা নিরূপনসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। উচ্চতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও উপদেষ্টা পদসমূহে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্যে যোগ্য নারী সম্পর্কিত তথ্যমালা তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নারীর মানবাধিকার রক্ষার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আইনের জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাত বিলোপ করার আশু প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। পারিবারিক আইনের সংস্কার, অভিন্ন সিভিল কোড প্রবর্তন এবং সম্পত্তি ও জমিতে মালিকানা ও উত্তরাধিকারে নারীর সমান অংশ নিশ্চিতকরণের উল্লেখ করা হয়। স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানের নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার ব্যাপারে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

বেইজিং কর্মপরিকল্পনা রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সীমিত উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তা থেকে উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করে ব্যাপক পরিসরে কৌশল নির্মাণের কথা বলেছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বয়ম্ভরতার প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান অংশগ্রহণ নারীর অগ্রগামিতায় মূল ভূমিকা পালন করবে এই প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। আরো বলা হয় নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম-অংশগ্রহণ একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। বৈশ্বিক পরিসরে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আইন পরিষদে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক পরিষদে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য। সরকার এবং প্রশাসনে নারীর সম-প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সংখ্যাগত টার্গেট নির্দিষ্ট করার পক্ষে বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা অভিমত প্রকাশ করে। নারীকে নির্বাচনে ও মনোনয়নে পুরুষের মতো সমান অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কোন ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি নারীর প্রতিনিধিত্বের অনুকূল হয়, সে সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়। নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন কাঠামো ও প্রক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে জোর তাগিদ দেয়া হয়। নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় এবং দলীয় নীতি নির্ধারণী কাঠামোয় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেবার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়। দলের রাজনৈতিক এজেন্ডায় জেন্ডার ইস্যু সন্নিবেশিতকরণের আবশ্যকতা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া নারীকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, নারীর পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, তথ্য, শিক্ষা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিস্তার, বেসরকারি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্রাইভেট সেক্টরে সমতা অর্জন ইত্যাদি বহুবিধ কৌশল বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় বিধৃত করা হয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত দুটি বিষয়কে—জাতীয় সংসদে নারীর প্রবেশযোগ্যতা ও নারী ইস্যুর প্রতি রাজনৈতিক দলের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতা ও সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখানেই নারীর জোরালো উপস্থিতি প্রয়োজন। নারীর ক্ষমতায়নের সাথে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় জড়িয়ে আছে। এই উপাদানগুলো নারীর কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা ধারণ করে রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ক্ষেত্রসমূহ। নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কেননা, নারীর প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা নারী তার জীবন ও অভিজ্ঞতার আলোকে ধারণ করে থাকে। এখানেই নারীর ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পারস্পরিক সম্পৃক্তি। বিভিন্ন নারী সংগঠন বিভিন্ন সময়ে এই দুটি ইস্যু নিয়ে দাবি উত্থাপন করেছে, অ্যাডভোকেসি করেছে। কিন্তু তেমন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়নি বা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি।

চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে তুলে ধরা হয় যে, নারীর প্রতি বিরাজমান অসমতার মোকাবেলা করে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হতে পারে রাজনীতি। কেননা রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান নিবন্ধে তুলে ধরা হলো দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত ইস্যু : নির্বাচনী রাজনীতি তথা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ এবং এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আরো ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে, যে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বেসরকারি সংস্থা, নারী সংগঠন, স্থানীয়

স্বায়ত্তশাসন, আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী ও সম্পদ বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এতো ব্যাপক আলোচনার অবতারণা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধির সংখ্যাগত অবস্থান

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ৩০০টি আসন সম্বলিত এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। এই আসনগুলো সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি সাপেক্ষে একক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই আসনগুলো উন্মুক্ত এবং এই আসনের জন্য প্রার্থিতার যোগ্যতার মাপকাঠিতে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য সংবিধান করেনি। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই আসনগুলোতে পুরুষের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজমান। নারী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে অনেক দূরে। এর কারণও অনেক। রাজনীতিতে প্রবেশযোগ্যতার সহায়ক শিক্ষা, পেশা, কর্মক্ষেত্রের প্রান্তিক অবস্থান, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিকভাবে আরোপিত নারী চরিত্রের 'গুণাবলি' এবং সামাজিক-পারিবারিক ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নারীকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশে অনুপ্রাণিত করে না বা টিকে থাকতে সহায়ক হয় না। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিগড়ে গড়েওঠা সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সবল, সচল ও ক্রিয়াশীল অস্তিত্বের প্রতি সমাজ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না। রাজনীতির কাঠামোগত বাধা অতিক্রম করা নারীর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতিতে নারীর সীমিত অংশগ্রহণ ও দুর্বল অংশীদারিত্বের জন্য উপরে উল্লিখিত কারণগুলি চিহ্নিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের গবেষণায়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি; সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারের বাস্তবরূপ দেবার নিশ্চয়তা এখানে অনুপস্থিত।

সুদীর্ঘ তিন দশকে রাজনীতির অঙ্গনে নারীর কিঞ্চিত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে; ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে নারী-প্রার্থিতার সংখ্যা। বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, নব্বইয়ের দশকে নারী-প্রার্থিতা ও নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যা আশির দশকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ এবং জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা এবং প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংখ্যাও প্রায় সমপর্যায়ে ছিল। অবশ্য সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে মোট প্রার্থী সংখ্যার তুলনায় তা অতি নগণ্য। ১৯৯১-এর নির্বাচনে নারী প্রার্থী মোট প্রার্থী সংখ্যার ১.৫ শতাংশ ছিল; জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.৯ শতাংশে। অক্টোবর ২০০১ সনের নির্বাচনে এই অনুপাত প্রায় অনড় অবস্থানে রয়েছে—২ শতাংশে।

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের দাবিসমূহের একটি অনিবার্য দাবি হলো : প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অংশগ্রহণ সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধি করা হোক। দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে ন্যূনতম নির্দিষ্ট হারে, যেমন ১৫ শতাংশ বা ২০ শতাংশ নারীকে মনোনয়ন দানের দাবি নারী সংগঠনগুলো বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, সভা-

সমিতির মঞ্চ থেকে উত্থাপন করে আসছে। নারী সংগঠনগুলো এ আশাবাদও ব্যক্ত করেছে যে, কোনো রাজনৈতিক দল এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে এগিয়ে আসলে, নির্বাচনী কৌশলের কারণে অন্যান্য দলেরও এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। সার্বিক ফলাফল ইতিবাচক হবে এই কারণে যে, চিহ্নিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও প্রার্থিতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে ভারতে গত শতাব্দীর আশির দশকের উদাহরণ দেয়া যায়। নেপালে ১৯৯০-এর গোড়ায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারী সংগঠনগুলোর শক্তিশালী ভূমিকার ফলে নতুন সংবিধান রাজনৈতিক দলগুলির জন্য নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়নের ন্যূনতম সংখ্যা বেঁধে দেয়। অবশ্য পরবর্তী নির্বাচনসমূহে মনোনয়ন প্রদানকালে এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা হয়নি।

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে বিভিন্ন নির্ণায়ক ক্রিয়াশীল থাকে, যার মাধ্যমে মনোনয়ন সুনিশ্চিত হয় ও নির্বাচনে জয়ী হবার পথ সুগম হয়। সাধারণত দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় সংগঠনে বা স্থানীয় এলাকায় আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী :

- যাদের জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং কার্যকর যোগাযোগ বা যোগসূত্র রয়েছে,
- যারা নির্বাচনী প্রচারণাকালে পর্যাপ্ত এবং সক্রিয় দলীয় সমর্থন আদায় ও ব্যবহারে সক্ষম, এবং
- যাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং সম্ভাব্য আর্থিক উৎসের প্রাচুর্য রয়েছে—তাদের দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে।

বিগত প্রায় দুই দশকে নির্বাচনী রাজনীতিতে অস্ত্র ও পেশীশক্তির উত্থান নারী প্রার্থিতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, সন্দেহ নেই (নির্বাচন আচরণবিধি ফেব্রুয়ারি '৯১ এবং জুন '৯৫ দ্রষ্টব্য)। নারীর পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপাদান সঞ্চয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে নির্বাচনী রাজনীতির পরিমণ্ডলে নারীর কিঞ্চিত সংখ্যাবৃদ্ধি তাদের রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

রাজনৈতিক দলসমূহ সাধারণত নারীকে নির্ভরযোগ্য, অর্থাৎ নির্বাচনে দলের পক্ষে আসনটি জয় করে নিয়ে আসায় সক্ষম, এরকম প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করে না। এমনকি রাজনীতির অঙ্গনে যে সকল নারীর পদচারণা রয়েছে, তাদের আশঙ্কা যে, পুরুষের সাথে মনোনয়নে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো শক্তি, সামর্থ্য বা সংযোগ তাদের নেই। এ কারণে তাদের অনেকেই নারীর জন্যে সংরক্ষিত আসনের পক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন।

১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থী ছিলেন। একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে মোট নারী প্রার্থিতা দাঁড়ায় ৪৮-এ (মোট ৪৪টি নির্বাচনী এলাকায়)। ১১টি আসনে তারা জয়যুক্ত হন। অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী আসনের ২৩ শতাংশ

আসন তাঁরা লাভ করেন। তবে বস্তুতপক্ষে এই ১১টি আসনে মোট ৫ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও আরো ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। বিজয়ী প্রার্থীর সাথে দুটি নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটের ব্যবধান ছিল নিতান্তই নগণ্য।

সারণি : সপ্তম সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট : শতকরা হিসাব

১১-২০	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫০ এবং তদুর্ধ্ব
২	৩	৫	৬	২

(দ্রষ্টব্য : এখানে ১৮ জন প্রার্থীর ভোটের পরিসংখ্যান দেওয়া হলো। অন্য ৩০ জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়)

অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, শতকরা এই উচ্চ হারের ভিতর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রাপ্ত ভোট। তবে যারা এই সারণিভুক্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় সবাই দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং তারা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ দিন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে জড়িত।

মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টিতে (৬২.৫ শতাংশ আসনে) নারী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এদের প্রায় সকলেই নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত বৈধ ভোটের ১ শতাংশের নিচে ভোট পেয়েছেন। লক্ষণীয় যে, মোট ২৫২৬ পুরুষ প্রার্থিতার ক্ষেত্রে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থাৎ ৬৮.৫ শতাংশের। এই পরিসংখ্যান অন্তত এটুকু প্রমাণ করে যে, নারী প্রার্থীরা তুলনামূলকভাবে নিজেদের খুব একটা খারাপ ঝুঁকি বা রিস্ক বলে প্রমাণিত করেননি। রাজনৈতিক দলগুলোর সপ্তম সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যতে প্রার্থী মনোনয়নের দিকনির্দেশনা পাবার কথা। ১৯৯৬ সনে নির্বাচন কেন্দ্রে নারী ভোটারের ব্যাপক উপস্থিতি প্রমাণ করেছিল যে নারী একটি বিশাল political constituency, যাদের সমর্থন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য শুভ ফলাফল নিয়ে আসবে।

১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ১৫টি উপনির্বাচনে দুজন মহিলা প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এঁরা দুজন পুরুষ সাংসদের স্ত্রী। স্বামী, পিতা বা অন্য নিকট পুরুষ আত্মীয়ের সূত্র ধরে, তাঁদের রাজনৈতিক শক্তির উপর ভর করে, নারীর রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ, যা পূর্ববর্তী সংসদগুলোতেও ঘটেছে—কোনো কোনো মহলে সমালোচিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'নিরাপদ' নির্বাচনী এলাকা কোনো রাজনীতিকই হারাতে চাইবেন না—নিজের, পরিবারের এবং দলের স্বার্থে। আগে এ ধরনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ বা ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী বা শিষ্য কোনো পুরুষকে মনোনয়ন দেওয়া হতো। সাম্প্রতিক কালে নারী (কন্যা, স্ত্রী, বোন) রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্যতা রাখতে সক্ষম হবার সম্ভাবনা ধারণ করেছেন বলে তারাও সহজেই মনোনীত হচ্ছেন।

সংখ্যাগত দিক থেকে ২০০১ সনের নির্বাচনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। নারী প্রার্থিতা বৃদ্ধি পায়নি, বরং কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে। এই নির্বাচনে মোট ৪৭টি আসনে ৩৭ জন নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে জিতেছেন ৬টি আসনে। আবারো বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ভোট পেয়েছেন ৫টি নির্বাচনী এলাকায় বিজয়ী বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ ধারার অধীনে জাতীয় সংসদে ৩০০টি আসনের অতিরিক্ত ১৫টি আসন নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সংবিধানের ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীদের ৩০০টি সাধারণ আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার ব্যাহত করে না। জাতীয় সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০টি আসনের সদস্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৯-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ও সংরক্ষণের সময়কাল বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৩০ ও ১৫ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে, অর্থাৎ সংবিধান প্রবর্তনের ১৫ বৎসর পূর্তির প্রাক্কালে, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। সুতরাং শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে ১৯৮৮ সালের নির্বাচিত সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না।

এ সময় নারী সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে সংবাপত্রে বিবৃতি, সভা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বেশকিছু সংগঠন সংরক্ষণের পক্ষে অবস্থান নেন। মূল দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়—সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা এবং তা পূরণ করার পদ্ধতি। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাবৃদ্ধির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়, যদিও সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্য থাকে। সংরক্ষিত আসনের জন্য প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হয়, তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, বা নির্বাচনী এলাকা কীভাবে নির্ণীত হবে, সে সম্পর্কে কিছুটা মতদ্বৈধতা থেকে যায়।

জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক অবস্থানগত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশে সংবিধান-গৃহীত স্বল্পমেয়াদী এবং অন্তবর্তীকালীন এই ব্যবস্থা নারীর রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ে সহায়ক হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকেই সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার পদ্ধতি একটি বিশেষ রূপ নেয়, যখন প্রধান দল আওয়ামী লীগ নেতৃস্থানীয় নারীদের ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সংসদের সংরক্ষিত আসনের জন্য মনোনীত করে। পরবর্তী নির্বাচনগুলোতেও এই প্রবণতা বজায় থাকে। বাস্তবে সাধারণ আসনগুলো 'পুরুষের' আসন হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষ রাজনীতিকের দ্বারা লালিত নির্বাচনী এলাকা নারীর জন্য দুর্ভেদ্য ও অনতিক্রমণীয় হয়ে যায়। এই সময়ে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

মনোনয়নের দিকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংরক্ষিত আসনগুলো 'নারীর জন্যে' চিহ্নিত হয়ে গেছে। সংবিধান নারীর জাতীয় সংসদে প্রবেশের যে সর্বনিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করেছিল, বাস্তবে তা 'সর্বোচ্চ সীমা' হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিপোর্টে নির্বাচন কমিশন সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। বস্তুতপক্ষে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আসনগুলোই যে শক্তির আধার, তা প্রমাণিত হয় যখন দুটি প্রধান দলের শীর্ষে নারী নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং তারা সরাসরি ভোটে একাধিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে জাতীয় সংসদে, তথা রাজনীতির চত্বরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর নির্বাচন প্রক্রিয়া আসনগুলোকে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। নারী রাজনীতিকের জন্য তৃণমূলে ও দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক সমর্থনের ভিত তৈরি হয় না।

১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনী দ্বারা সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। সংশোধনী অনুযায়ী সে সময় বিদ্যমান সংসদের পরবর্তী সংসদ থেকে এ ব্যবস্থা বলবত এবং ১০ বছর কাল তা স্থায়ী হবে বলে বলা হয়। নব্বইয়ের গণআন্দোলনের মুখে পূর্বতন সরকারের পতন ঘটলে ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নারীর জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসন পুনরায় সংসদে সংযোজিত হয়। এই ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা অনুযায়ী কার্যকর থাকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে ক্ষমতাসীন সরকার নারী আন্দোলনের মূল বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে এবং ১৯৯৭ সালে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে বিধৃত ঘোষণাকে উপেক্ষা করে সংবিধানের প্রস্তাবিত চতুর্দশ সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন করেন, যা প্রকৃতপক্ষে পূর্বে প্রচলিত সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থারই পুনর্বহাল। সরকারের বক্তব্য ছিল বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের কারণে সাংবিধানিক সংশোধনী সম্ভব হয়নি।

নারী সংগঠনগুলো এ সময় তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করে নীতি নির্ধারকদের সমর্থন আদায়ের জন্য ব্যাপক অ্যাডভোকেসি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। মাঠে, মঞ্চে, জনপথে, নারী সংগঠন ও আন্দোলন সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার হয়। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিকে প্লাটফর্ম করে জোট বা কোয়ালিশন তৈরি হয়। অন্যান্য ইস্যুকে কেন্দ্র করে গঠিত জোটও সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করার দাবি জানায়। নির্বাচনের প্রাক্কালে মূল দুটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নিজ নিজ অবস্থান ঘোষণা করা হয়, যা নারী আন্দোলনের দাবিকে মোটামুটি প্রতিফলিত করে। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের পরে দলীয় নেতৃত্ব কর্তৃক ঘোষিত অবস্থান থেকে সরে এসে এখন নানা আনুষাঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি নির্বাচনের (নারী আসনে) দাবি নাকচ করে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দল ও নারী ইস্যু

রাজনৈতিক দল মনোনয়ন ও সমর্থনের মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তিকে সংসদে প্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। বলতে গেলে রাজনৈতিক দল সংসদের প্রবেশ দ্বারের প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। দেখা যায়, রাজনৈতিক দল লিঙ্গভিত্তিক সমমনাদের নেটওয়ার্কিংয়ের প্রতিফলন ঘটিয়ে রাজনীতির অঙ্গনে পুরুষ-আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তোলে। পুরুষের মধ্যে নেটওয়ার্কিং ও মনিটরিংয়ের প্রভাব এবং পূর্বে বর্ণিত নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সামর্থ্য অর্জনের ভিত্তিতে দলীয় মনোনয়ন লাভ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে প্রায় সকল উপাদানই অনুপস্থিত। তবে বলা হয়ে থাকে যে পুরুষের অনুরূপ মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর জন্যে যারা পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ আত্মস্থ বা ধারণ করেন, তাদের জন্যে সংসদে প্রবেশের পথ অতটা দুর্গম নয়। বিভিন্ন দেশের গবেষণায় আরো দেখা গেছে, নারীকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বাইরের/outsider অবস্থান থেকে ভেতরে প্রবেশের প্রচেষ্টা নিতে হয়েছে, অতিক্রম করতে হয়েছে বহিরাগত প্রবেশার্থীর জন্যে সৃষ্ট বা আরোপিত সকল বাধা। কোনো কোনো বিশ্লেষকের মতে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট বাধার তুলনায় কাঠামোগত বাধা নারীর পক্ষে অতিক্রম করা কঠিন। নারীর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার কাঠামোগত কারণের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তারা নারীকে সংসদে প্রবেশের সহায়ক বা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দলীয় কাঠামো, সিদ্ধান্ত এবং নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারী প্রান্তিক বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় রয়ে গেছেন। এই প্রান্তিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে প্রবেশের বিকল্প/পরিপূরক রাস্তা হলো সংরক্ষিত আসন বা কোটা পদ্ধতি। উপরের আলোচনায় দেখা গেছে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার নির্বাচন-পদ্ধতি নারীর রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সহায়ক হয়নি। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর জোরদার অস্তিত্ব তৈরির লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই আসনগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ের ভোটদাতাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে অব্যাহত সংযোগ সৃষ্টির যে দাবি নারী আন্দোলনের রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো বলতে গেলে তা উপেক্ষাই করে এসেছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দুটি মূল দলই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নারী আন্দোলন কর্তৃক উত্থাপিত দাবি সংযোজন করেছিল। হয়তো-বা এভাবে তারা নারীর ভোটকে আকর্ষণও করেছে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী কালে, নানা ধরনের সাংবিধানিক সমস্যা উত্থাপন করা হয়েছে। নারী সংগঠন ও জোটগুলোর মধ্যে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি বা নির্বাচনী এলাকার আয়তন সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ মতপার্থক্যের কারণে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনীর পূর্বশর্ত হিসেবে এই ইস্যুগুলোতে নারীসমাজের ঐকমত্য সৃষ্টির কথাও বলা

হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের সকল সংশোধনীই যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে তা নয়।

এছাড়া বলা বাহুল্য যে বড় দলগুলো কর্তৃক এই ইস্যুগুলো নির্বাচনী ইশতেহারের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি একধরনের জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, নারী আন্দোলনের দাবি 'সম-প্রতিনিধিত্বের' নয়—বর্ধিত প্রতিনিধিত্বের। নারী আন্দোলনের এই দাবিকে বাস্তব স্বীকৃতি দেওয়াকে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব রাজনৈতিক ছাড় দেবার সামিল বলে গণ্য করেছে; যে ছাড় পুরুষ রাজনীতিকের রাজনৈতিক অঙ্গনকে সঙ্কুচিত করতে পারে।

ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত জরিপভিত্তিক তথ্য এবং সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, প্রায় নজীরবিহীন সংখ্যক নারী ভোটার সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ভোট দান করেছেন। এ-ও ধারণা করা হয় যে, নারী ভোটার সচেতনভাবে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করেছেন। তারা ভবিষ্যতে নির্বাচনী ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখার ক্ষমতা ধারণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নারী গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

নির্বাচনী ইশতেহার একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শিক কমিটমেন্টের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে দল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে স্বীয় আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের নির্বাচন ও নির্বাচন-উত্তর রাজনীতি এ সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়কে ঘিরে খুব কমই আবর্তিত হয়েছে। তবু নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক দল কর্তৃক অগ্রগণ্য বিষয় বলে বিবেচিত ইস্যুসমূহ স্থান পায় এবং এ কারণে নির্বাচনী মেনিফেস্টো রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট বলে পরিগণিত হয়।

নারীর সমতা ও অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গ বাংলাদেশের রাজনীতির ভাষায় (political discourse) স্থান পায়নি। ১৯৯১-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি দল ও জোটের নির্বাচনী ইশতেহারে দেখা যায়, নারী অধিকারের প্রসঙ্গ এসেছে জাতিসংঘ সনদের 'পরিপূর্ণভাবে' অথবা 'পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের' ঘোষণার মাধ্যমে। যৌতুক ও নারী নির্যাতন দমন, সংবিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং নারীকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রশিল্প ও অন্যান্য কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প গঠন, সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াসের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজের সম্মানজনক ভূমিকা নিশ্চিতকরণ, নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরোধিতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, দলগুলো অনুরূপ কর্মসূচি পুনর্বার ব্যক্ত করেছে। নারী নির্যাতন নির্মূল করার পক্ষে প্রায় সব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই ঘোষণা দিয়েছে।

উপসংহার

বৃহৎ বৈশ্বিক পরিসরে নারীর ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়কে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেই আলোকে বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে বাংলাদেশে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অঙ্গনে সংখ্যাগত অবস্থান ও দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ততার মাত্রা তুলে ধরা হলো। বাংলাদেশের মূলস্রোতের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলে নেতৃত্বের ক্ষমতা ধারণ করে আছেন দুজন নারী। ১৯৯১ সাল থেকে তারা পর্যায়ক্রমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এছাড়া রাজনীতির অঙ্গনেও দলীয় কাঠামোয় এবং নেতৃত্বের নৈকট্যে অবস্থান করছেন মুষ্টিমেয় সংখ্যক নারী রাজনীতিক। সামগ্রিকভাবে তবু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে নারীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ দুর্বল।

বর্তমান প্রবন্ধে নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের একটি দিক—জাতীয় সংসদে নারীর সংখ্যাগত অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রথমত, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদের সংখ্যাগত দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের হার একটি বিশেষ মাত্রায় না থাকলে সেই গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির পরিবেশ, মূল্যবোধ, নীতি, সিদ্ধান্ত, কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই হার কত হওয়া বাঞ্ছনীয় এ সম্পর্কিত একটি মত হলো যে, প্রতিষ্ঠানটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ অর্জন করলে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখা সম্ভব। আবার কোথাও প্রতিনিধিত্বের ৪০-৬০ ভিত্তিক নারী-পুরুষ বিভাজন কাম্য মনে করা হয়। সুতরাং প্রতিনিধিত্বের সংখ্যার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, সকল নারীই নিজস্ব সত্তা, অধিকার ও বৈষম্য-বঞ্চনার উপলব্ধি সচেতনভাবে ধারণ করেন সেটা নাও হতে পারে। 'নারীবাদী চেতনার যদি সাদামাঠা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থ এভাবে করা যায়, যে-চেতনা নারীর প্রতি বৈষম্যের উপলব্ধি ধারণ করে, সনাতন সমাজের প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিকতায় আবদ্ধ থাকতে অস্বীকার করে, পুরুষের সাথে সমঅধিকার এবং মানুষ হিসেবে মানবাধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্যে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের অনুঘটকেব দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ থাকে, তাহলে নারীমাত্রেই নারীবাদী হয় না। নারীবাদী চেতনাসমৃদ্ধ (Feminist consciousness) নারী লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে প্রয়াসী হন এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের পরিধি বা আওতায় অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হন। তিনি চেষ্টা করেন পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানকে নারী ইস্যুর প্রতি সংবেদনশীল করতে। সুতরাং সংখ্যার হিসেবের সাথে সচেতন নারীসত্তার সংমিশ্রণ হতে হবে।

তৃতীয়ত, নারী কোনো একক অভিন্ন গোষ্ঠী নয়। সে শ্রেণী, ধর্ম, সম্প্রদায়, কৃষ্টি ইত্যাদি বিবিধ বিভাজনে বিভক্ত। কিন্তু সকল বিভাজনের মধ্যে প্রায় সর্বজনীনভাবে বিরাজমান নারীর অধস্তন অবস্থান। রাজনৈতিক দল নারীর স্বার্থ উত্থাপন ও রক্ষায় অপারগ হলে নারী সংগঠন/আন্দোলনের কোনও বিকল্প পন্থা নির্ধারণের সম্ভাবনা আছে কি? সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দৃশ্যপট কি হতে পারে? নারী সংগঠন বা আন্দোলন নারীর স্বার্থ

উত্থাপন ও তা পাবলিক পলিসি এজেন্ডার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে তাদের ভূমিকার মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ করতে পারে। নারী ইস্যু উত্থাপন ও সঞ্চালনে নারী সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতার গুরুত্ব কোথাও কোথাও দেওয়া হয়ে থাকে। তবে রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়। কারণ, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রশক্তির নৈকট্যের কারণে ক্ষমতাপুষ্ট; আর সাধারণত নারী সংগঠনের অবস্থান ক্ষমতার বলয়ের বাইরে। নারীর জন্যে জাতীয় সংসদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্ধিত সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের দাবিতে সৃষ্ট স্থিতাবস্থা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও নারী সংগঠনের কি সম্ভাব্য কৌশল নির্মাণের সম্ভাবনা রয়েছে? এ যাবত অনুষ্ঠিত সম্মেলন, গোলটেবিল আলোচনা, ওয়ার্কশপ, সাংগঠনিক জোট গঠন, মানববন্ধন, র‍্যালী, স্মারকলিপি ও দাবিনামা পেশ—ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম নারী সংগঠন ও সমমনা নাগরিক গোষ্ঠী অনুসরণ করে এসেছে। কিন্তু এ সকল কর্মপন্থা ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। সময়ের প্রয়োজনে নারী আন্দোলন বলিষ্ঠ ও উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বনের চিন্তাভাবনা করতেও পারে। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব বা নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রার্থিতাকে উৎসাহিত করে, দলীয় মনোনয়ন অর্জনে সমর্থন যুগিয়ে, নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে নারী সংগঠন ও আন্দোলন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সচেষ্ট হতে পারে। এই সমর্থন ও সহায়তা আসতে পারে নারী আন্দোলনের এমন প্লাটফর্ম থেকে, যা দলীয় রাজনীতি এবং এর প্রভাব বলয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত। নারী সংগঠনের এই সমর্থন ও সহায়তা নারী প্রার্থীর দলীয় সম্পর্ক ও পরিচিতি অগ্রাহ্য করে নারীইস্যুর প্রতি কমিটমেন্টের আলোকে হতে পারে। এর মাধ্যমে দুটি সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, নারীর জন্যে প্রায়-অবরুদ্ধ জাতীয় সংসদের দ্বার এবং পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দলীয় কাঠামোয় নারীর প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আর সেই সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে নারী ইস্যু-সচেতন বলিষ্ঠ প্রতিনিধি আর্বিভাবের সম্ভাবনা, যে-প্রতিনিধিত্ব নিজ পরিসরে অর্জিত শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার করে নারীইস্যু ও রাষ্ট্রনীতির সমীকরণ ও সংযুক্তি ঘটাতে সক্ষম হবে। বলা বাহুল্য, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী—নারীর ভোটকে পুঁজি করে নারী আন্দোলন নিরবচ্ছিন্ন বিরামহীন প্রয়াসের মাধ্যমে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করার সক্ষমতা ধারণ করে।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

মাহমুদা ইসলাম

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নারী

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ এবং ঐ পরিষদের আস্থাভাজন মন্ত্রিপরিষদ আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসন করে। বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ। যে-রাজনৈতিক দল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য সংসদে নির্বাচিত হয়, সেই দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, অর্থাৎ মন্ত্রিবৃন্দ জাতীয় সংসদের সদস্য এবং যতদিন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ সরকার হিসেবে দেশ শাসন করে এবং জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে। কাজেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। এই দুই রাজনৈতিক তথা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সকল সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সর্বাধিক ও সর্বময় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও সংবক্ষণের একমাত্র অধিকারী।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদে অংশগ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন ও সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ও কার্যকর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ।

বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে সমান অধিকার দান করেছে। আঠারো বছর বয়সী সকল নারী ও সকল পুরুষ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোটার হতে এবং ভোট দিতে সক্ষম। প্রেসিডেন্ট পদে, জাতীয় সংসদের স্পিকার পদে, জাতীয় সংসদের সদস্য পদে এবং মন্ত্রীপদে নির্বাচিত হবার সমান অধিকার প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক পুরুষের আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সকল পদে নারীর অংশগ্রহণ নগণ্য। কোনো নারী কখনও প্রেসিডেন্ট বা স্পিকার পদ লাভ করেনি। জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদে নারীর অংশগ্রহণ অত্যন্ত

সীমিত। আইন প্রণয়নে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই বললেই চলে। বস্তুত বাংলাদেশে নারী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। নানা কারণে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এবং পুরুষের তুলনায় বৈষম্যের শিকার।

২. মন্ত্রিপরিষদে নারী

১৯৯১ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা—উভয় পদ দুজন মহিলা সংসদ সদস্য অলংকৃত করে আছেন। কিন্তু এ দুজন ছাড়া অন্য কোনো মহিলা মন্ত্রিপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বভার পাননি। ৪০ থেকে ৬০ জনের মন্ত্রিপরিষদে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা কখনও দুয়ের বেশি ছিল না। এখন মাত্র একজন মহিলা মন্ত্রী আছেন। যে নগণ্য সংখ্যক মহিলা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন, তাদের এমন সব দফতর প্রদান করা হয়েছে যেগুলির কর্মকাণ্ড নারীর ঐতিহ্যবাহী সনাতন গার্হস্থ্য এবং মাতৃত্ব সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। যেমন নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি। সপ্তম সংসদ পর্যন্ত এদের অধিকাংশ ছিলেন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জাতীয় সংসদ আসনে অপ্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য; সাধারণ আসনে সর্বজনীন বয়স্ক ভোটে সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্য নন। সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিত্ব

মন্ত্রিপরিষদে নারীর অবস্থান

বছর	মন্ত্রিপরিষদের আকার	মন্ত্রিপরিষদে মহিলা	মর্যাদা ও ক্ষমতা
১৯৯১	৩৯	প্রধানমন্ত্রী-১ প্রতিমন্ত্রী-১ মন্ত্রী-০	প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্য। প্রতিমন্ত্রী সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য; নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত।
১৯৯৬	৩৮	প্রধানমন্ত্রী-১ মন্ত্রী-২ প্রতিমন্ত্রী-১	প্রধানমন্ত্রী ও একজন মন্ত্রী সরাসরি নির্বাচিত; অন্য দুজন পরোক্ষভাবে মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত; দফতর : মন্ত্রীদের ১ জন কৃষি এবং ১ জন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত। প্রতিমন্ত্রী মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত।

করতে হলে বা গুরুত্বপূর্ণ দফতর পেতে হলে যথেষ্ট রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন— রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাজনীতিবিদ হিসেবে স্বীকৃতি এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে জনসমর্থনের মাধ্যমে ঐ রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে হয়। কিন্তু রাজনীতিতে আগ্রহী মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং সংরক্ষিত আসনে অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যদের জনসংযোগ কম, ফলে ক্ষমতা ধারণ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করার দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক শক্তি তাদের নেই। রাজনৈতিক দলগুলিতে, জাতীয় সংসদে এবং নির্বাচকমণ্ডলীতে দুর্বল ভূমিকার কারণে মন্ত্রিপরিষদে মহিলা মন্ত্রীদের অবস্থান দুর্বল এবং ক্ষমতা ক্ষীণ।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান অত্যন্ত বিষাদময়; যুগের সাথে মন্ত্রিপরিষদে মহিলার সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়েনি, বরং একবিংশ শতাব্দীতে হ্রাস পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী যেহেতু মহিলা, কাজেই মন্ত্রিপরিষদে মহিলাদের দাপট বেশি হবে, এমন ধারণা করার পেছনে যুক্তি নেই। নারী হোন বা পুরুষ হোন, প্রধানমন্ত্রীকে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করতে হয়, সেটি পুরুষ-প্রধান এবং পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক ও নারীর বিপক্ষে বৈষম্যমূলক। রাজনৈতিক দল প্রধামন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস; রাজনৈতিক দলগুলি সনাতন পুরুষসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে না। প্রধানমন্ত্রী মহিলা হলেও প্রচলিত অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া তার উপায় নেই। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিদ্যমান দৃঢ়মূল রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে পারবেন না। এমনকি, যুক্তরাজ্যের মতো পাশ্চাত্য দেশেও লৌহমানবী প্রধনমন্ত্রী মার্গারেট থেচার ক্ষমতায় থাকার জন্য নারীবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> "যাঁরা বলেন যে, সফল মহিলার পক্ষে তথাকথিত পুরুষসুলভ গুণাবলি রপ্ত করার প্রয়োজন নেই, তারা ভুলে যান যে, সমাজ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত নারী ও পুরুষের পরিচয় জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ ও ধারণ নারীকে কর্তৃত্বের ভূমিকায় গ্রহণযোগ্য করার একমাত্র সম্ভাব্য কৌশল।" (Those who argue that it should not be necessary for successful women to adopt so-called masculine attributes ignore the fact that, given social definitions of male and female identity traits, this may be the only possible strategy to gain acceptance as a woman in an authority role. (page 96, Global Gender Issues, Paterson and Runyan, Westview Press)।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী নেতা মহিলা হলেই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটবে তা নয়; এটাই সত্য যে, প্রধান দুটি পদে মহিলার অবস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে নারী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন।

৩. জাতীয় সংসদে নারী

তিনশো সাধারণ আসন বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মহিলা সদস্যের সংখ্যা আজ পর্যন্ত দশে উন্নীত হয়নি। যদিও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ভোটদানকারী মহিলা

ভোটারের সংখ্যা ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যানুপাত প্রায় সমান, কিন্তু জাতীয় পরিষদে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলা প্রার্থী এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্য—উভয় সংখ্যাই অতি নগণ্য।

জাতীয় সংসদে মহিলা
(৩০০ সাধারণ আসনে মাহলা)

বছর	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	নির্বাচিত মহিলার সংখ্যা
১৯৭৩	০২	—
১৯৭৯	—	০২
১৯৮৬	১৫	০৫
১৯৮৮	—	০৪
১৯৯১	৩৯	০৬
১৯৯৬	৩৬ (বি. এন. পি-৩. আওয়ামী লীগ-৪ জাতীয় পার্টি-৩)	০৭

দ্রষ্টব্য : কিছু সংখ্যক মাহলা একাধিক আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং কেউ কেউ উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে এসেছেন। ফলে সংখ্যায় কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের বিপরীতে মহিলা সদস্যের উপস্থিতি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

বাংলাদেশের সংবিধানে ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে ৩০০ সাধারণ আসনের অতিরিক্ত ৩০টি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এই ৩০টি আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের পরোক্ষ ভোটে ৩০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হতেন। সংসদের ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন প্রায় সকলেই পুরুষ; কাজেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের সকল মহিলা সদস্য বাস্তবে পুরুষ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ফলে সংসদের সাধারণ আসনে যে-রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচন সুনিশ্চিত ছিল। বস্তুত ৩০টি সংরক্ষিত আসনে কখনও ভোটাভুটি হয়নি; সকল সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতেন। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের বেশিরভাগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তেমন সংযুক্ত ছিলেন না; তাদের তেমন রাজনৈতিক পটভূমি ছিল না। নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বা নারীর চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছিল। মোটকথা, নির্বাচন বা মনোনয়ন দানের ব্যাপারে নারী উন্নয়ন কিংবা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান আছে কিনা, তা বিবেচনা করা হত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, বরং রাজনৈতিক দলের ওপর-মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ মনোনয়নের চাবিকাঠি ছিল।

দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নারীর স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকারের অভাবের সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনের অসুবিধা যুক্ত হয়ে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর ব্যাপারটি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। সংসদে ও মন্ত্রিপরিষদে তাঁরা আশানুরূপ বা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেননি; নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারেননি।

পরোক্ষ নির্বাচন কখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক সকল দেশে, আইন পরিষদে নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে, সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে যে-সকল মহিলা সদস্য হয়েছিলেন, তারা জনগণের সরাসরি ভোটে সাধারণ আসনে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের সমকক্ষতা বা সমমর্যাদা দাবি করতে পারেননি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন থেকে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা যায়, তার সঙ্গে পরোক্ষ নির্বাচনে প্রাপ্ত ক্ষমতার তুলনা হয় না। একটি সংরক্ষিত মহিলা নির্বাচনী এলাকা বস্তুত ১০টি প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনী এলাকার সমান। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত একজন মহিলা সদস্যের বিপরীতে একই নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচনী এলাকায় ১০ জন সরাসরি নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ছিলেন। এমন বিসদৃশ পরিস্থিতিতে, মহিলা সদস্যগণ পুরুষ সদস্যদের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করতে পারেননি। দাবি আদায় করার কথা ভাবতেও পারেননি। একজন পুরুষ সদস্য তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে যত নিবিড় ও কার্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন, দশগুণ বড়ো নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে মহিলা সদস্য তত ফলপ্রসূ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম নন। নির্বাচনী এলাকা যত বড়ো হবে নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে গণসংযোগ তত কম হতে বাধ্য। অন্যদিকে নির্বাচন যদি পরোক্ষ হয় তবে গণসংযোগ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যবৃন্দ ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি। ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছেন। তাঁদের কার্যকারিতা জনগণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁরা নারী নির্যাতন রোধ বা পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারেননি। বস্তুত যৌতুক, বলাৎকার ও নারীব প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ ক্রমবর্ধমান। মহিলা সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী এবং রাজনীতিবিদদের অক্ষমতার জন্য অবশ্য তাদের দায়ী করা ঠিক নয়; যে-রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী পুরুষ-প্রধান পরিবেশে তাদের কাজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা ও পরিবেশ উভয়ই নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক ও বৈষম্যমূলক। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ এবং অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে নারী রাজনীতিবিদগণ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রভাব খাটাতে সক্ষম হবেন না। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার তথা মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলে রয়েছে রাজনৈতিক দল।

৪. রাজনৈতিক দলে নারীর অবস্থান

জাতীয় সংসদের নির্বাচন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনীত করে এবং মনোনীত প্রার্থীরা দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। যে-দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সে-দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ ন্যূনতম পর্যায়ে রয়েছে; দলের নীতিনির্ধারণী উচ্চপর্যায়ে নারী রাজনীতিবিদদের অন্তর্ভুক্তি নামমাত্র।

রাজনৈতিক দলের উচ্চপর্যায়ে নারী

রাজনৈতিক দল	পর্যায়	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	০১
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েট	১৩	০৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	০৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	০১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	০৪
জামাতে ইসলামী	মজলিশ-ই-শুরা	১৪১	-
	মজলিশ-ই-আমলা : কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২৪	-

উৎস : উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা আছে যার ভূমিকা স্পষ্ট নয়। মহিলা শাখার অর্থপূর্ণ নারী বিষয়ক কর্মসূচি নেই এবং নারীর সমস্যা ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভাব আছে। মহিলা শাখার সকল সদস্য নারী এবং তাদের প্রধান কাজ সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক গোষ্ঠীর আদেশ-নির্দেশ পালন; কিন্তু উক্ত গোষ্ঠীতে বা গোষ্ঠীর নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ডে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ নেই। বস্তুত মহিলা শাখার পৃথক অস্তিত্বের ফলে, মহিলা রাজনীতিবিদগণ বৃহত্তর দলের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে থাকেন এবং দলের অভ্যন্তরে তুলনামূলকভাবে নিচু মর্যাদা ও ভূমিকা দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। মূলত দলের নারী শাখা জেন্ডার পার্থক্যকরণের রাজনৈতিক প্রতিফলন। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণত মহিলাগণ রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চান না; কারণ যাঁরা যোগ দেন তাঁরাও মহিলা শাখায় কোণঠাসা হয়ে থাকেন; দলীয় কর্মকাণ্ডে তেমন অংশগ্রহণের সুযোগ পান না।

অপরপক্ষে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে পরোক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা নারীর রাজনৈতিক দলে যোগদানকে নিরুৎসাহিত করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন পেলে বিনা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য নির্বাচন সুনিশ্চিত ও খুব সহজ; নির্বাচনী প্রচারণার জন্য খরচ নেই; পরাজয়ের ঝুঁকি নেই। বিপরীত পক্ষে, সাধারণ আসনে নির্বাচন ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। রাজনৈতিক দলের সমর্থন পেলেই যে নির্বাচিত হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। অন্যান্য দলের প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। এখন বাংলাদেশে নির্বাচনের ব্যয় অত্যধিক; পরাজিত হলে অর্থনাশ। তাছাড়া মনোনয়ন পেতে হলে এবং ভোটে জিততে হলে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন অত্যাবশ্যক এবং রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে ভোটদাতা জনগণের মধ্যে বছরের পর বছর কাজ করে আস্থা অর্জন করতে না পারলে জয়লাভ অনিশ্চিত। কাজেই কে যায় এমন অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা ও কায়ক্লেশের মধ্যে? দীর্ঘ ও কষ্টকর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও লবির মাধ্যমে মনোনয়ন নিয়ে সহজে সংসদ সদস্য পদ লাভ কি বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়? অতীতে উচ্চাভিলাষী মহিলাগণ রাজনৈতিক টানাপোড়েন পরিহার করে সহজ পথ অবলম্বন করেছেন এবং কৃতকার্য হয়েছেন। কাজেই রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হয়ে লাভ কি? স্বাধীনতার কয়েক যুগ পরেও নারীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি অনীহা এবং সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনিচ্ছার অন্যতম কারণ পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। বস্তুত সংরক্ষিত আসনে পরোক্ষ নির্বাচন নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এখন সংরক্ষিত আসন নেই। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভবিষ্যত পদ্ধতি নির্ধারিত হয়নি। কেউ কেউ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলছেন। পরোক্ষ নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক নয়, এ সত্য আজ সর্ববাদীসম্মত। তবে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ঐ পদ্ধতির সুফল ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। উক্ত অভিজ্ঞতা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে বিধায় আলোচনার অবকাশ রাখে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন

বর্তমানে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদকে ৯টি ওয়ার্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসনের বিধান করা হয়েছে। অপরপক্ষে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদকে ৩টি ওয়ার্ডে ভাগ করে প্রতি ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য একটি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সাধারণ ও মহিলা আসনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেক পুরুষ এবং মহিলা ভোটারের তিনটি ভোট আছে। নির্বাচনে প্রত্যেক মহিলা ও পুরুষ ভোটার চেয়ারম্যান পদের জন্য একটি, সাধারণ আসনের জন্য একটি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য একটি করে ভোট দেবেন। অর্থাৎ

চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সবাই পুরুষ ও মহিলা ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হবেন।

বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মহিলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রার্থী হিসেবে, ভোটদাতা হিসেবে এবং প্রচারাভিযানকারী হিসেবে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ করা গেছে। ১২,৮২৮টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪৪,১৩৪ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেক আসনে গড়ে চারজন প্রার্থী ছিলেন।

মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার, নির্বাচনী প্রচারণা, ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান এবং জনসংযোগ ইত্যাদি পদ্ধতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। মহিলা প্রার্থী ও তাদের সমর্থক প্রচারকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলের কাছে ভোটের প্রচারণা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলেন। এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রচারণার বিপক্ষে কোনো মহল থেকে বিরোধিতা হয়নি এবং গ্রামের মাতব্বররা পুরুষ ভোটারদের কাছে মহিলা প্রার্থী এবং তাদের মহিলা সমর্থকদের প্রচারণায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। গ্রাম পর্যায়ে নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে এখন মহিলাদের জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনে ব্যাপক অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধক নেই। খান ফাউন্ডেশন নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) জরিপে এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের অধিকাংশের হিসাব অনুসারে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ মহিলা ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন এবং প্রচারণা চালাতে অসুবিধার সম্মুখীন হননি। পরিবারের সদস্যগণ মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাকে খুশি মনে গ্রহণ করেছিলেন এবং সকল প্রার্থী পরিবার, প্রতিবেশী ও নিজ নিজ গ্রামের জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁদের মতে, মহিলাদের জন্য নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের উৎসাহব্যঞ্জক অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান; সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণে মহিলাদের কোনো সামাজিক বাধা নেই।

কিন্তু সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মহিলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মহিলা সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীর ক্ষমতায়নে অনুকূল অবদান রাখতে পারেনি। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও তারা স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শতকরা ৮২ জন মহিলা সদস্য ক্ষমতায় যাওয়ার আশা নিয়ে নির্বাচনে নেমেছিলেন। তাদের আশা পূর্ণ হয়নি—তারা আশাহত হয়েছেন।

শতকরা ৮২ জন মহিলা সদস্য মনে করেন যে, সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যগণ তাঁদের সমকক্ষ গণ্য করে না, বরং তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য ধরে নিয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্য প্রায় সবাই পুরুষ এবং পরিষদে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তারা মহিলা সদস্যদের কাজে সহায়তা করে না এবং

কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দিতে চায় না। ফলে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেও সংরক্ষিত আসনের কারণে জেন্ডার বিভাজন নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। বস্তুত, ৫৬ শতাংশ মহিলা সদস্য মনে করেন যে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পরিষদের কার্যক্রমে যথাযথ অংশগ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যবৃন্দ সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের সমান সুযোগ, মর্যাদা ও ভূমিকা পাচ্ছেন না; ফলে তাঁরা আশানুরূপ অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

খান ফাউন্ডেশন ও আমেরিকান সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে দুবার সাধারণ আসনে নির্বাচিত এবং একবার সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের একজন মহিলা সদস্য দুই পদের অভিজ্ঞতা তুলনা করে ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, ভবিষ্যতে তিনি মহিলা সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে সাধারণ আসনে ফিরে যাবেন, কারণ মহিলা আসনের চেয়ে সাধারণ আসনে কাজ করার সুযোগ সুবিধা বেশি এবং মর্যাদা ও সম্মান অধিক। মোটকথা, সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসনের মধ্যে একটি অলিখিত বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশ পুরুষ, কাজেই বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার বৈষম্যকে জিইয়ে রেখে নারীর ক্ষমতায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বলা যায় যে, বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন পরীক্ষিত হয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফল নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে যায়নি। প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যবস্থা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়নি।

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সাধারণ আসনে নারীর নির্বাচন এবং সাধারণ আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে জনসংখ্যায় নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতে জাতীয় সংসদে নারীর সাধারণ আসন অর্জন নারীর ক্ষমতায়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু সাধারণ আসনে উন্মুক্ত নির্বাচনে ৩০০ সাধারণ আসনের অর্ধেক, অর্থাৎ ১৫০টি আসনে মহিলা প্রার্থীর নির্বাচন সহজ নয়। কারণ যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞা, বঞ্চনা, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার নারীকে রাজনীতিতে পেছনে হটিয়ে রাখা হয়েছে। নারীকে রাজনীতিতে পুরুষের একই সারিতে টেনে আনতে হলে নারীর রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণ চিহ্নিত করতে হবে।

৬. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর পশ্চাৎপদতার কারণ

৬.১ পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

বাংলাদেশে পুরুষকেন্দ্রিক ও পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত রাজনীতিকে 'পুরুষের বিশ্ব" বিবেচনা ও বিশ্বাস করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, রাজনীতিবিদ হতে হলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নেতৃত্বদানের প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব, কর্তৃত্ব, বলিষ্ঠতা, আগ্রাসিতা ইত্যাদি গুণাবলি অত্যাবশ্যক এবং এই সকল গুণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের একচেটিয়া। সমাজ মনে করে যে, একজন

পুরুষের মধ্যে এই সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা। অপরপক্ষে, নারীর মধ্যে এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকার কথা নয়। যদি কদাচিৎ থাকে, তবে ঐ মহিলাকে পুরুষালি মেয়ে বলে ব্যঙ্গ ও হেয় করা হয়। সমাজে ও পরিবারে সে ধিকৃত হয়। এই পুরুষশাসিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রাজনীতিতে নারীকে কোণঠাসা করে রেখেছে এবং তার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করেছে।

রাজনৈতিক নেতা হতে হলে রাজনৈতিক দলে ক্ষমতার ভিত্তি গড়তে হয়। ক্ষমতার ভিত্তি গড়তে হলে দীর্ঘকাল দলে থেকে দলের পক্ষে কাজ করতে হয়। কেবল দলে নাম লেখালেই চলে না, প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। কর্মী থেকে নেতায় উন্নতি ঘটে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন লাভ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। ইদানীং শ্রমিক ও অন্যান্য ইউনিয়নের নেতৃবর্গ, বিভিন্ন স্বার্থঘটিত গোষ্ঠী, যেমন চেম্বার অব কমার্স, সামরিক-বেসামরিক আমলা, স্থানীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ রাজনীতিতে পদার্পণ করে পূর্বঅভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দলের মনোনয়ন পেয়ে থাকেন। তবে রাজনীতিতে আসার আগে নিজ নিজ পদের সুযোগ নিয়ে তাঁরা তাঁদের সম্ভাব্য নির্বাচনী এলাকার সেবা করে নিজেদের স্থান গড়ে তোলেন। এলাকায় তাঁদের পরিচিতি মনোনয়ন লাভে সাহায্য করে। কিন্তু এদেশের মহিলারা মনোনয়ন প্রাপ্তি ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের উপরিউক্ত সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাজনীতিতে তাদের সাক্ষাৎ অংশগ্রহণের সুযোগ কম; ইউনিয়নে, স্বার্থঘটিত গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র প্রভৃতিতে তাদের সংখ্যা ও ভূমিকা উল্লেযোগ্য নয়।

রাজনীতির পথ ধরে ক্ষমতালাভের অসুবিধার জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ মহিলা রাজনীতিবিদ সমঝোতার মাধ্যমে কিংবা জীবিত বা মৃত খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আত্মীয়তার সুবাদে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের শীর্ষ নেত্রীদ্বয় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পুরুষ রাজনৈতিক নেতার নিকটতম আত্মীয় এবং হত্যাকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট নেতৃত্ব-সঙ্কট সমাধানের উপায় হিসেবে সমঝোতার মাধ্যমে নেতৃত্বে বরিত হয়েছেন। তবে পরবর্তীকালে তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছেন এবং নিজস্ব শক্তিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলে নিজস্ব ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য তাঁরা পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ স্বীকার ও আত্মস্থ করে নিয়েছেন এবং সেভাবেই নিজেকে গড়ে নিয়ে কাজ করছেন। বলতে গেলে তারাও বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের শিকার।

৬.২ অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশে এখন রাজনীতি এক টাকার খেলা; বিশেষভাবে নির্বাচন এখন প্রার্থীদের জন্য বেশ ব্যয়বহুল। যারা নির্বাচনে অধিক অর্থ ব্যয় করতে পারে, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে তাদের মনোনয়ন দিতে উৎসুক।

অর্থ ও সম্পদ উভয় দিক দিয়ে নারী অসুবিধার সম্মুখীন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী, বিশেষত গ্রামীণ নারীর নিজস্ব উপার্জন নেই; উপার্জন থাকলেও ব্যয়ের স্বাধীনতা নেই; পরিবারের আয় ও সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ নেই। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও আর্থিক পরনির্ভরশীলতা নারীকে নিজ মেধা ও যোগ্যতার গুণে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

অপরপক্ষে, নির্বাচনের জন্য এখন যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তার পরিমাণ এমন বিপুল, যা সৎপথে উপার্জিত হতে পারে না। প্রায় সকল ক্ষেত্রে, নির্বাচনে কালো টাকার অতিশয় প্রাবল্য। কিন্তু নারীরা যে সকল পেশায় কাজ করে, সেগুলোতে কালো টাকার পাহাড় গড়ার সুযোগ কম। ফলে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোতে টাকার প্রতিযোগিতায় নারী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে; নির্বাচনে প্রতিযোগিতা দূরের কথা।

৬.৩ পেশিশক্তির প্রতিবন্ধক

রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন পেশিশক্তির দাপট। রাজনীতিবিদ টাকা দিয়ে ক্যাডার পোষণ করেন এবং পেশিশক্তিকে লালন পালন করেন। সন্ত্রাস ও ধ্বংসের উন্মাদনা নির্বাচনে প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলেছে।

রাজনীতিতে পেশিশক্তির ব্যবহার নারীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি হুমকি স্বরূপ। কারণ, পুরুষের তুলনায় নারী সহিংসতার অধিকতর শিকার। নারীর নিরাপত্তা জাতীয় সমস্যার রূপ নিয়েছে; রাজনীতিতে অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। অথচ রাজনীতি করতে হলে বহিরাঙ্গনে ব্যাপক পদচারণা আবশ্যক। সন্ত্রাস ও অরাজকতার বর্তমান কুটিল পরিবেশে নারীর পক্ষে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়েছে। ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকলেও পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে নারীকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে।

৬.৪ জেন্ডার প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশের সংস্কৃতি মাতৃত্বকে নারীর প্রধানতম ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং নারীর অন্যান্য সকল কাজ কর্মের ওপরে গৃহস্থালিকে স্থান দেয়। জেন্ডার কর্ম-বিভাজন নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পরিপন্থী আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে।

নারীর গৃহস্থালি ও সন্তান পালন দিনব্যাপী সার্বক্ষণিক কাজ; এ কর্মে নির্দিষ্ট সময়সূচি বেঁধে দেওয়া যায় না। কাজেই একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কখন, কতটা সময় দিতে পারবেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ফলে গৃহস্থালির কাজের সঙ্গে রাজনৈতিক কাজের সংঘর্ষ অনিবার্য। অপরপক্ষে, পুরুষের কাজের বাঁধা সময়সূচি থাকে এবং ঐ সময়সূচি তারা আগে থেকেই জানে; ঐ নির্দিষ্ট সময়সূচির বাইরে তারা নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। রাজনীতিতে পুরুষপ্রাধান্যের কারণে,

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড—যথা সভা, বৈঠক, গণসংযোগ ইত্যাদির দিনক্ষণ সময় পুরুষের সুবিধা মতো নির্ধারণ করা হয়; নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করা হয় না। ফলে নারী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আশানুরূপ সময় দিতে পারে না; নেতৃত্বে পিছিয়ে পড়ে।

অধুনা একটি শিক্ষিত পেশাজীবী মহিলা শ্রেণী গড়ে উঠছে; এরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্বাধীন। পেশাজীবী মধ্য ও উচ্চমধ্যবিত্ত মহিলা রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত; কিন্তু 'দ্বিগুণ কর্ম দিবস'-এর বোঝা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক। পুরুষের মতো তারা ঘরের বাইরে চাকরি বা অন্যান্য কর্ম করে উপার্জন করে। কিন্তু উপার্জনশীল কাজ ছাড়াও তাদের গৃহস্থালি ও সন্তান পালনের দায়িত্ব বহন করতে হয়, যা পুরুষকে করতে হয় না। নারী দুই স্থানে কাজ করে—অফিসে কর্মস্থলে এবং ঘরে; ঘর গৃহস্থালি ও সন্তান পালনে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু পুরুষ কাজ করে এক স্থানে—অফিসে; তাদের ঘরের কাজ করতে হয় না। পুরুষ অফিসে কাজ করেই খালাস। এমতাবস্থায় কর্মজীবী মহিলাকে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে হয়; পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি সময় অফিসে ও ঘরের কাজে কাটাতে হয়। ফলে পুরুষ রাজনীতিতে যতটা সময় দিতে পারে, কর্মজীবী মহিলার পক্ষে ততটা সময় দেওয়া অসম্ভব। বলা বাহুল্য 'দ্বিগুণ কর্ম দিবস' নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে কঠিন প্রতিবন্ধক এবং নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে ব্যাহত করে।

৬.৫ স্বাধীন ভোটদানে প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশে নারীর ভোটাধিকার আছে; কিন্তু স্বাধীনভাবে ইচ্ছামাফিক প্রার্থীকে ভোট দানের গ্যারান্টি নেই। এ দেশের অধিকাংশ গৃহবধূ, গ্রামীণ নারী, ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগের অধিকার ও গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়। ফলে তারা নিজের পছন্দসই প্রার্থী বেছে নিয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারছে কিনা, তার প্রমাণ নেই। হতে পারে অভিভাবক ও গুরুজনের পছন্দ মোতাবেক প্রার্থীকে ভোট দেবার জন্য তাদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা অভিভাবকদের স্বার্থে ভোট দিচ্ছে। তারা যে নারীর সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রার্থীকে ভোট দিচ্ছে, এমন বলা যাবে না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে যেভাবে 'পল্লবিনী লতা' হিসেবে গড়ে তোলা হয়, তাতে রাজনীতিতে আগ্রহ নিয়ে সঠিক ভোটদান নারীর পক্ষে সহজ নয়। টেনিস ক্লাফিন তার Constitutional Equality : A Right of Woman গ্রন্থে বিশদ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "যদি ভোটাধিকার প্রাপ্ত নারীকে বাধ্য, বিনম্র, আত্মবিসর্জনপ্রবণ ও আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত চরিত্র গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায়, তা হলে নারীর ভোটদান সমস্যা নয়। বস্তুত ব্যালট বাক্স সমস্যা নয়; সমস্যা গৃহে, যেখানে স্বামী একচ্ছত্র শাসক এবং নির্দেশ প্রদানকারী। স্বামীকে যদি বাধ্য করা না হয়, তা হলে স্বামী স্ত্রীর ওপর তার ঐতিহ্যবাহী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না।" অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ নারী স্বামী, তথা অভিভাবকের নির্দেশ মেনে ভোট দিতে বাধ্য; নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ভোটদান তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী পরনির্ভর গৃহবধূর সনাতন পরিবেশে বাস করে; বিশেষত গ্রামেগঞ্জে নারী নানাভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। তাদের স্বাধীন আয় উপার্জন নেই; নিজের বা পরিবারের উপার্জিত আয়ের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের নিজস্ব সম্পদ নেই বললেই চলে; থাকলে তা পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে।

নারীর গতিবিধি পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; পর্দার প্রাবল্য কমলেও উঠে যায়নি। সাধারণত পুরুষ প্রার্থীরা তাদের কাছে অদৃশ্য; পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার সুযোগ খুব কম। ফলে বিভিন্ন পুরুষ প্রার্থীর মধ্যে তুলনা করার সুযোগ নেই; অপরপক্ষে নির্বাচনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের সামান্যই ধারণা দেওয়া হয়। খুব কম মহিলাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত। ভোট দিয়ে তাদের কী লাভ, তা তারা জানে না।

ধর্মীয় মৌলবাদী একটি অংশ নারীর অধীনতায় বিশ্বাস করে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনে নারীর সক্রিয় ও সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণের বিরোধিতা করে। এমন রাজনৈতিক দল আছে যারা প্রকাশ্যে নারীর নিকৃষ্টতা, পুরুষের অধীনতা এবং গৃহবন্দি অবস্থায় বিশ্বাসী এবং তা প্রচার করে। দুঃখের বিষয় প্রগতিশীল বলে দাবি করে, এমন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আঁতাত করতে পিছপা হয় না। নির্বাচনের সরকারি প্রচারণা পোস্টারে—"আমার ভোট আমি দেব, যাকে ইচ্ছা তাকে দেব"—এ শ্লোগানের কার্যকারিতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এরকম পরিবেশে নারীর সঠিক ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা বিরল।

৭. বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা

বর্ণিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপায় কী? রাজনীতিতে পরিপূর্ণ সম্পৃক্ততা এবং জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে অধিক সংখ্যায় মহিলা সদস্যের নির্বাচনের মধ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনে মহিলা সদস্যের সংখ্যা প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে উন্নীত করতে হবে। সাধারণ আসন ব্যতীত, সাধারণ আসনের বাইরে অতিরিক্ত মহিলা সংরক্ষিত আসন নারীকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারবে না। পরোক্ষ নির্বাচন যে কার্যকর নয়, তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ আসন থেকে ভিন্ন, অতিরিক্ত মহিলা সংরক্ষিত আসনের অভিজ্ঞতা ইউনিয়ন পরিষদে আশাব্যঞ্জক হয়নি। জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি ফলপ্রসূ হবে না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য যে সকল অসুবিধা ও দুর্বলতায় ভোগেন, জাতীয় সংসদে সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য অসুবিধা দেখা দেবে।

জাতীয় সংসদে সাধারণ আসন ৩০০; ইতোপূর্বে মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৩০টি আসনের ব্যবস্থা ছিল। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০ বা ৮০ করা হলে মোট আসন সংখ্যা বেড়ে যাবে বটে; কিন্তু মহিলা সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকার

আয়তন ও জনসংখ্যা সাধারণ আসনের চেয়ে বড়ো ও বেশি থেকে যাবে; সমান হবে না। কাজেই মহিলা আসন ও সাধারণ আসনের মধ্যে ব্যবধান থেকে যাবে; যেহেতু সাধারণ আসনে প্রধানত পুরুষ নির্বাচিত হবে, কাজেই জেন্ডার বৈষম্য দূর হবে না। নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে মহিলা আসনের সদস্যগণ সাধারণ সদস্যদের তুলনায় অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। ফলে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও, দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন; ক্ষমতার সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা বড়ো হলে নির্বাচনী ব্যয়ও বেশি হবে। বিশাল এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণার বিশাল ব্যয়ভার নারী প্রার্থীরা কিভাবে বহন করবেন? উপরন্তু, সাধারণ আসনের এলাকা ক্ষুদ্রতর থাকবে বিধায় ব্যয় কম হবে। ফলে নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি হবে। নির্বাচনী ব্যয় বেশি হবে, অথচ সাধারণ আসনের সমান মর্যাদা, ভূমিকা ও ক্ষমতা আয়ত্ত হবে না—বড়ো দুঃখজনক ব্যাপার নয় কি? কাজেই সাধারণ আসনে অধিক সংখ্যায় নারী প্রার্থীর সদস্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুযোগ প্রদান ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প সমাধান নেই।

সাধারণ আসনে কতজন মহিলা সদস্য থাকলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটবে, সে সম্পর্কে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের একটি সংগঠন UN Division for Advancement of Women (UNDAW) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত সমীক্ষায় UNDAW সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সবকার, রাজনৈতিক দল ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে উন্নীত হলে, নারীর সমস্যা ও অগ্রগণ্যতা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যথাযোগ্য গুরুত্ব, বিবেচনা ও গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে; অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক।

অন্ততপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট ৩০০ সাধারণ আসনের একতৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ১০০ আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করে বিধান জারি করতে হবে যে, জাতীয় সংসদের ১০০টি আসনে কেবলমাত্র মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে; রাজনৈতিক দল ঐ নির্দিষ্ট ১০০ আসনে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারবে এবং পুরুষ প্রার্থী ঐ আসনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। অবশিষ্ট ২০০ আসনে নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। ২০০ আসনে মহিলা প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ প্রদানের কারণ, বাংলাদেশের জনসংখ্যায় নারীর অনুপাতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাতীয় সংসদে আসন বণ্টন করলে, মহিলা সদস্যের সংখ্যা মোট আসনের অর্ধেক, অর্থাৎ ১৫০ হওয়ার কথা। কাজেই ১০০টি আসন মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করার পরেও, নারী-পুরুষ সমতার নিরিখে অবশিষ্ট ২০০ আসনের ৫০টি আসন নারী সদস্যের প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, এই ২০০ আসনে পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে নারী প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের সবগুলোতে একই নিয়মে ও পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। নারী ও পুরুষ আসনের নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচকমণ্ডলীর আয়তন এক সমান হবে; ছোটো বড়ো হবে না। একই সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল আসনে নির্বাচন করতে হবে। মোদ্দা কথা, কোনো সংরক্ষিত আসন থাকবে না; সকল আসন সাধারণ আসন বলে বিবেচিত হবে। তবে, বৈশিষ্ট্য এই থাকবে যে, ১০০টি চিহ্নিত আসনে কেবল মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

কেবলমাত্র মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট ১০০ আসন কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? ৩০০ আসন থেকে ১০০ আসন বাছাইয়ের পদ্ধতি কী হবে? প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রতি নির্বাচনে লটারির মাধ্যমে আসনগুলি চিহ্নিত করা হবে। যেহেতু আসনগুলো চিরতরে নির্দিষ্ট থাকবে না বরং প্রতি নির্বাচনে হেরফের হবে, কাজেই রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩০০ আসনের সবগুলিতে মহিলা প্রার্থী গড়ে তুলতে হবে; দেশের সর্বত্র সকল রাজনৈতিক দলে পুরুষ ও নারী পার্টি সদস্যদের অনুরূপভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো আর নারী রাজনীতিবিদকে একপাশে ঠেলে রাখতে পারবে না; দলের কেন্দ্রে নিয়ে তাদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো জেন্ডার বৈষম্য কাটিয়ে উঠতে বাধ্য হবে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একাধারে সম্ভাব্য নারী ও সম্ভাব্য পুরুষ প্রার্থী তৈরি করতে বাধ্য হবে।

লটারিই যে একমাত্র উপায় তা নয়; বিকল্প পদ্ধতিও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে লক্ষ্য এই থাকবে যে, ন্যূনতম ১০০ আসনে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হবে।

শত শত বছরের বঞ্চনার ফলে রাজনৈতিক দলগুলোতে ১০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম রাজনীতি-সচেতন ও যোগ্য মহিলা প্রার্থী অবিলম্বে পাওয়া যাবে না। তবে পর্যায়ক্রমে অল্পসংখ্যক আসন দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ১০০ আসনের মূল লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে সরকার, রাজনৈতিক দল, নারী আন্দোলন ও সুশীল সমাজ একযোগে সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে উপযুক্ত পরিবেশ অবশ্যই গড়ে উঠবে। একদিকে যেমন রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও যোগ্য মহিলা সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই পরিবেশ গড়ে উঠবে, অপর দিকে তেমনি ক্রমান্বয়ে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থী নির্বাচনের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তবে অঙ্গীকার পূরণের প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকার স্বার্থে অবিলম্বে জাতীয় সংসদে ১০০টি আসনে নারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট সাল ও তারিখ সংবিধান সংশোধন করে আগাম নির্ধারণ করা জরুরি। নতুবা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেতে পারে; বাস্তবায়নে বাধা আসতে পারে।

বাস্তবায়নের এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং ৩৩টি আসন দিয়ে এই প্রক্রিয়া চালু হতে পারে। ১০০টি আসন সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তারিখের নিরিখে অন্তর্বর্তীকালের জন্য পর্যায়ক্রমে ৩৩, ৬৬ এবং চূড়ান্ত ১০০ আসনে নারীপ্রার্থী নির্বাচনের মধ্যবর্তীকালীন সময়সূচি সংবিধান সংশোধন করে এখনই বেঁধে দিতে হবে।

প্রস্তাবিত সাংবিধানিক বিধানাবলি সঠিকভাবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং স্ব স্ব দলে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে; গ্রামের তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজধানীর উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র মহিলাদের রাজনৈতিক দলে যোগদানকে উৎসাহিত করতে হবে। রাজনৈতিক দল মহিলাদের দলভুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, দলীয় মহিলাদের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করবে এবং দলের সকল শাখা, পরিষদ, কমিটি কাউন্সিলে সংখ্যানুপাতিক মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

নতুন ব্যবস্থায় সাফল্য অর্জনের জন্য নারী আন্দোলন ও সুশীল সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। নারীর রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মত করানোর দায়িত্ব নারী আন্দোলনের ওপর বর্তায়। সুশীল সমাজকে সঙ্গে নিয়ে নারী সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ধৈর্য সহকারে কাজ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে সকল বাধা অপসারণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব জাগাতে হবে। নারী আন্দোলন রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক শীর্ষ নেতৃত্বের এই দৃঢ় ও আন্তরিক অঙ্গীকার আদায় করতে যদি সক্ষম হয় যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, জীবনের সর্বত্র নারীর সমান ও ন্যায্য অংশগ্রহণ ব্যতীত বাংলাদেশের সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন সুদূরপরাহত তাহলেই নারী তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী : সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা

সালমা খান

বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে সারা বিশ্বে আজ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী নেতৃত্বের বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত ইস্যু, যদিও এখনো আলোচনাটি মূলত নারী আন্দোলনকেন্দ্রিক—কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলধারার এজেন্ডাতে এটির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীর আগমন ঘটেছে সর্বপ্রথম ১৯৬০ সালে, শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে যখন প্রধানমন্ত্রী হন। তারপর ইসরায়েলের গোল্ডামেয়ার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, যুক্তরাজ্যের মার্গারেট থ্যাচার, ফিলিপাইনের কোরাজন আকিনো থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তানেব বেনজির ভুট্টো, বাংলাদেশের খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার রাজনৈতিক মঞ্চে আগমন ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানো নতুন রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিককালে নিউজিল্যান্ডের নারী নেতৃত্বে সার্বিক অর্থে 'ফিমেল পাওয়ার' বা নারী শক্তির প্রতিফলন ঘটেছে বলা চলে।

নিউজিল্যান্ডের সম্প্রতি নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল সিলভিয়া কার্টরাইট রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি দখল করেছেন। এছাড়াও সেখানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল, প্রধান বিচারপতি সবাই মহিলা। এমনকি প্রাইভেট সেক্টরে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো কোম্পানি টেলিকম করপোরেশনের প্রধান নির্বাহীও একজন মহিলা। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একে যদিও ব্যতিক্রম বলা চলে, তবে নিউজিল্যান্ডের 'নারী শক্তি'র জয়ের একটি ঐতিহাসিক কারণ হল সেখানেই ১৮৯৩ সালে নারী প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে। নিউজিল্যান্ডের বর্তমান অবস্থাতে স্বাভাবিকভাবেই সমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী রাজনৈতিক ক্ষমতারও জন্ম দিয়েছে।

রাজনীতিতে নারী পরিপ্রেক্ষিতের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বিশ্বে এ পর্যন্ত ৩০ জন নারী (নিউজিল্যান্ডের গভর্নর জেনারেল, যিনি ২০০১ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন তাকে নিয়ে) রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হলেও

জাতিসংঘের সমীক্ষায় দেখা যায়, পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনীতিতে নারীর প্রবেশগম্যতা, মর্যাদা বা প্রভাব পুরুষের সমকক্ষ নয়। ক্ষমতার প্লাটফরমে এই অসমতাই নারী-পুরুষের বৈষম্যের মূল কারণ বলে ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বিতর্ক হয়, নারী নেতৃত্বের বিষয়টি কি শুধু ন্যায় ও ক্ষমতা বন্টনের ইস্যু, নাকি 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখা'র প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নারী নেতৃত্বের মৌলিক প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেবে? এক্ষেত্রে বর্তমান নারী আন্দোলনের ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার মতবাদ অনেকটা এক—অর্থাৎ নারী যেহেতু জনসংখ্যার অর্ধেক, সে কারণে ন্যায় ও সমতার প্রশ্নটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক রক্ষণশীল দেশও নারী নেতৃত্বের ইস্যুকে প্রতীক হিসেবে হলেও গুরুত্ব দিচ্ছে। ইরানের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডানপন্থী ইরানি ফারদা সোসাইটির মহাসচিব ফারাহ্ খোসরাভির প্রার্থিতা এর একটি উদাহরণ। সমাজে নারীর শীর্ষ অবস্থান ন্যায়সঙ্গত করতে প্রথমবারের মতো একজন মহিলাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ দেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি খাতামি। এছাড়া গভর্নর হিসেবেও একজন মহিলাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ধরনের নারী নেতৃত্ব সমাজের মূলধারায় কোনো প্রভাব ফেলতে না পারলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী অংশীদারিত্বের ইস্যুকে পুরোভাগে আনতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে পশ্চিমা দেশে, বিশেষত স্ক্যানডেনেভিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে যেখানে ষাট দশকের পর থেকে নারীরা ব্যাপক হারে রাজনীতিতে যোগ দিতে ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাবার লড়াইয়ে তৎপর হয়েছে, সেখানে সমতা ইস্যুর সঙ্গে সঙ্গে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রশাসনে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মৌলিক গুণগত পার্থক্য আনার দিকে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এডিথ ক্রিসন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী কিম ক্যামবেল, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রোহারলেম, আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন এবং আইসল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট ভিগদিস ফিনবোগাডতির—এরা সবাই নেতৃত্বে এসে রাষ্ট্রীয় নীতি ও শাসন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ন্যায়পাল নিয়োগ, ইক্যুয়েল অপর্চুনিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন (বিশেষত কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার), উন্নত শিশু পরিচর্যা, বৃদ্ধভাতা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। সাম্প্রতিককালে ইউরোপের নারী নেতৃত্ব নারী-পুরুষের সমান কর্ম, মজুরি ও অবসর ভাতা অধিকার, নারীর প্রজনন অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার, মানবাধিকার ও শান্তির ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। নরওয়ে সরকারে নারীর শক্তিশালী অবস্থানের কারণে বিশ্বব্যাপী নরওয়ে মানবাধিকার, শান্তি ও পরিবেশ রক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। মন্ত্রিসভার অর্ধেক নারী হওয়ায় সুইডেন পরমাণু শক্তি ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ করেছে। এসব উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় নারীর সমঅংশীদারিত্ব নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করতে ও সামাজিক উন্নয়ন জোরদার করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী

হাতে গোনা যে কজন নারী পৃথিবীতে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন এশিয়ার সাতজন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই মূলত উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতায় এসেছেন। তবে এঁদের অনেককেই পরবর্তীকালে কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং পুরুষপ্রধান ক্ষমতার পরিমণ্ডলে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য পুরুষের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক সূক্ষ্মতার পরিচয় দিতে হয়েছে। শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯৬০ সালে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর বহু টানাপোড়েনের সম্মুখীন হন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে শুধু নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতই করেননি—বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় থাকা কালে দেশে গভীর অর্থনৈতিক সংস্কার প্রচলন করেন এবং কঠোর হস্তে মার্কসবাদী বিদ্রোহীদের দমন করেন।

শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা যদিও ক্ষমতায় আসার পর থেকেই গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় পর্যুদস্ত, তা সত্ত্বেও দেশের সঙ্কটকালে বৃহত্তর জনগণ তাঁকেই পুনর্বার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সঙ্কটকালে পুরুষের তুলনায় নারীর নেতৃত্ব দক্ষতা কোনো অংশেই কম নয়, বরং অধিক প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে তাঁদের অগ্রসর হতে হয় বলে অধিকাংশ নারীনেত্রী পুরুষের তুলনায় ধৈর্য ও সতর্কতার পরিচয় দেন।

এশিয়ার নারীনেত্রীরা পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও তাঁরা সবাই জাতীয় সঙ্কট ও রাজনৈতিক জটিলতার সন্ধিক্ষণে সমঝোতাপ্রার্থী হিসেবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছেন। পিতা বা স্বামীর ঐতিহ্য তাঁদের জন্য রাজনীতির দুয়ার খুলে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি করেছে। অধিকাংশ নারীনেত্রীর মধ্যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। বেনজির ভুট্টো, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন। অং সাং সু চি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিরলস সংগ্রামে একদশকের অধিক গৃহবন্দি ছিলেন। ইন্দোনেশিয়ার মেঘবতী সুকর্নপুত্রী দীর্ঘকাল সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে অবশেষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। এঁরা সবাই রাজনীতিতে প্রবেশের পর শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উচ্চমানের সাংগঠনিক দক্ষতা ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়ার নারীনেত্রীদের মধ্যে সবচাইতে দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থেকেছেন শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ও ভারতের ইন্দিরা গান্ধী। তবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধীই বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। তাঁর দক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা ও কুশলী পররাষ্ট্রনীতি তাঁকে জনপ্রিয়তা না দিলেও বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য নারীনেত্রীদের পথ ধরে ক্ষমতায় এলেও ইন্দিরা গান্ধী কৈশোরকাল

থেকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলা যায়। প্রধানমন্ত্রিত্বের আগেই নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরীণ জটিলতার সঙ্গে পরিচিত হন, যা পরবর্তীকালে তাঁকে দলের প্রাচীনপন্থী প্রবীণ নেতাদের হটিয়ে জয়ী হতে সহায়তা করেছে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম মেয়াদে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধীর সবচেয়ে বড়ো অর্জন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করা। অভ্যন্তরীণ শাসনেও ইন্দিরা তার পূর্বসূরি পুরুষ নেতাদের তুলনায় অধিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তার প্রচেষ্টার ফলে ১৯৭৪ সালে ভারত এ অঞ্চলের প্রথম পরমাণু শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বেনজির ভুট্টো পিতার মৃত্যুর পর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ও ১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হকের মৃত্যুতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের ব্যাপারে বেনজির ভুট্টোর সঙ্গে খালেদা জিয়ার মিল রয়েছে। বেনজিরের বৈশিষ্ট্য ছিল পিতার সাহচর্যে তিনি কৈশোর বয়স থেকে রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হন এবং পশ্চিমে উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পান, যা তাঁকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ও তুখোড় বক্তা হিসেবে গড়ে তোলে। এই আত্মবিশ্বাসপ্রসূত দক্ষতা তাঁকে পাকিস্তানের মতো একটি রক্ষণশীল দেশে সামন্তবাদী ভূস্বামী ও মৌলবাদীদের মোকাবেলায় দু'বার নির্বাচনে জয়ী হতে সহায়তা করেছে এবং গোঁড়া পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যেও নারীঅধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার সাহস জুগিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার নারীনেত্রীদের মধ্যে একমাত্র বেনজির ভুট্টোই নারীর প্রতি বৈষম্যের ইস্যুকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ খাতের ব্যাপক সংস্কার ও নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাসের পদক্ষেপ তাঁর সরকারের কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়। তবে কথিত দুর্নীতি, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও রাজনীতিতে সামরিক শক্তির প্রভাব তার নেতৃত্বকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং দুই মেয়াদেই তাঁর সরকার দুর্নীতির দায়ে পরাজিত বা বরখাস্ত হয়।

নারীনেতৃত্ব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর রাজনৈতিক সংগ্রাম শুধু প্রতিপক্ষকে হটিয়ে ক্ষমতার সিংহদুয়ারে পৌঁছানোর মধ্যেই নিহিত নয়, থুবড়ে পড়া রাজনৈতিক দলকে এবং বহুক্ষেত্রে নিজ দলের উচ্চাভিলাষী পুরুষ সদস্যদের বিরুদ্ধেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হতে হয়েছে। এজন্য তাঁদের নিতে হয়েছে কঠিন সিদ্ধান্ত এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী ফল বহু ক্ষেত্রে নারীনেত্রীদের অধিক বিতর্কিত করেছে। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সঙ্কটকালে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ইন্দিরা গান্ধীকে শুধু বিতর্কিতই করেনি, একনায়কত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা দীর্ঘদিন ধরে শ্রীলঙ্কাকে শান্তির স্বপ্ন দেখিয়ে এলেও তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তই দেশকে আরো জাতিগত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তবে বর্তমানে সেখানে বইছে শান্তির সুবাতাস। অবশ্য এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলো কোনোক্রমেই নারীনেত্রীদের দুর্বলতা বা অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয় না, বরং তাদের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বহিঃপ্রকাশ, যা অনেক সময় আন্তর্জাতিক বিশ্বেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। ইন্দিরা গান্ধী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সফল নেতৃত্ব দিয়ে উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান জোরদার ও বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায় অবদান রেখেছেন। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার রাষ্ট্রপরিচালনায় অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন ১৯৬৭ সালে মাত্র তিন দিনের যুদ্ধে সিনাই উপত্যকাসহ গাজা ও জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে ইসরাইল দখল স্থাপন করে। তাঁর নেতৃত্ব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসরাইলকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায়। মার্গারেট থ্যাচার দোর্দণ্ডপ্রতাপে যুক্তরাজ্য শাসন ও ফকল্যান্ড যুদ্ধ জয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহে নারীর অবস্থান

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব প্রদান ও মৌলিক অবদান মূলত নির্ভর করে দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও সমাজের সর্বস্তরে নারীর সমঅংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির ওপর। এশিয়ার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহ—যেমন শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন রাষ্ট্রপরিচালনায় নারীনেতৃত্বের জন্য বিশ্বে খ্যাতিলাভ করলেও, এর প্রতিটি দেশেই আইনসভা ও দলীয় নির্বাহী কাঠামোতে নারীর অবস্থান নগণ্য। যে কারণে ক্ষমতার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে কোনো নারী শীর্ষে ওঠার সুযোগ লাভ করেনি। ঘটনাচক্রে পারিবারিক উত্তরাধিকার তাঁদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করলেও লিঙ্গবৈষম্য বিলোপ বা লিঙ্গ সংবেদনশীল রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারেননি।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবে সকল রাজনৈতিক দল ও আদর্শ পুরুষতান্ত্রিক। দলের ঘোষণাপত্র বা গঠনতন্ত্রের কোথাও নারীর পরিপ্রেক্ষিত বা সমতার ইস্যুটি যথাযথ স্থান পায়নি—প্রধান সবগুলো দলেই রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর ভূমিকা অনুল্লেখ্য—নারীকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে, বেনিফিশিয়ারি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে মহিলা শাখার উল্লেখ থাকলেও মূল দল পরিচালনায় নারী অংশীদারিত্বের কোনো উল্লেখ নেই। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে মহিলা অঙ্গদল গঠনেরও উল্লেখ নেই। সবচেয়ে হতাশার বিষয় হল, মূল রাজনৈতিক দলগুলোর ইলেকশন মেনিফেস্টো বা নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেও নারী ইস্যুটি একটি প্রান্তিক ইস্যু হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে যুবশক্তি, অনুন্নত সম্প্রদায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, পরিবেশ ইত্যাদি বিক্ষিপ্ত বিষয়ের সঙ্গে নারীর উন্নয়ন ও মর্যাদার প্রশ্নটি এসেছে। মূলত নারীর পশ্চাৎপদতা ও অসহায়ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার ও সমঅংশীদারিত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি। বিএনপির

ঘোষণাপত্রে যদিও 'নারীসমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি'কে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে নারীকে জাতীয় গঠনমূলক ও অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, ক্ষমতার অংশীদারিত্বের প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি। জাতীয় পার্টি অনুরূপভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নারী সম্পৃক্ততার ঘোষণা দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী শরিয়া আইন ও ইসলামি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অধিকার রক্ষার ঘোষণা দিয়েছে। একমাত্র বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি তাদের ঘোষণাপত্রে সর্বক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সংবিধান, আইন, সামাজিক অনুশাসনের প্রতি ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও সংস্কারের' অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে তিনটি পার্টি ক্ষমতায় এসেছে এবং বিশেষ করে যে দুটি পার্টি নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছে, অর্থাৎ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ—তারা কখনই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়নি। এ ব্যাপারে কোনো আইনি বা আদর্শগত পরিবর্তনের পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি।

অন্যদিকে নারীসম্পৃক্ত বিশেষ ইস্যুসমূহ, যেমন নারীর প্রতি আইনি বৈষম্য, পুরুষের তুলনায় নারীশিক্ষার হার অর্ধেক হওয়া, দেশের মোট ৫.১ কোটি শ্রমশক্তির ২ কোটি নারী হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেকের কম পারিশ্রমিক পাওয়া এবং পরিসংখ্যানে নারীর অবদান কোনোভাবে প্রতিফলিত না হওয়া, নারীর স্বাস্থ্যসূচক পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্ন হওয়া, গড় আয়ু কম হওয়া এবং বিশেষভাবে ক্রমবর্ধমান হারে যৌনহয়রানি, নারীর প্রতি পরিবারে ও সমাজে সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়া, যা আজ নারীর প্রতি সহিংসতায় বাংলাদেশকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান দিয়েছে (জাতিসংঘ জনসংযোগ তহবিল রিপোর্ট)—এগুলো সবই গুরুত্বের দিক থেকে যেকোনো শাসকের জন্য জাতীয় অগ্রাধিকারের ইস্যু, উন্নয়নের ইস্যু ও মানবাধিকার ইস্যু বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। উপরন্তু এগুলো নারীকেন্দ্রিক ইস্যু হওয়ায় নারীনেতৃত্ব এগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে বলে সমাজ আশা করে। কিন্তু আমাদের নারীনেতৃত্ব এগুলোকে শুধু প্রান্তিক গোষ্ঠীর ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করায় ১০ বছরের নারীনেতৃত্ব এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গবৈষম্যের কারণে বাংলাদেশের নারী তার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারছে না বিধায় আজও বাংলাদেশ সার্বিক উন্নয়ন সূচকে ১৫৪টি দেশের মধ্য ১৪৬তম অবস্থানে থেকে যাচ্ছে।

নারী নেতৃত্বের এই দুর্বলতার কারণ কী? অনেকে মনে করেন, এশীয় দেশগুলোতে নারীনেতৃত্ব পারিবারিক সূত্র ধরে আগমন করায় অধিকাংশ নারী দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ক্ষমতায় আসেননি এবং এজন্য দেশের মৌলিক সমস্যার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে না। এসবই তাঁদের সাফল্যকে সীমিত করে দেয়। এই তথ্যে কিছুটা বাস্তবতা থাকলেও একে মূল কারণ বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় এলেও গ্রামে-গঞ্জে-রাজপথে নিরলস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই তাঁদেরকে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

রাজনীতিতে নারীর প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি

নারীশিক্ষার হার, মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা ও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণীতে নারীর প্রবেশগম্যতার সুযোগ এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও সমতা স্থাপনের প্রক্রিয়া গতিশীল করার লক্ষ্যে সাময়িক অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন বা বিশেষ কোটা পদ্ধতি রাজনীতিতে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দীর্ঘদিন ধরে নারীর ভোটের অধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিশ্বে গড়ে মাত্র ১০.৫ শতাংশ নারী আইন পরিষদের সদস্য এবং ৬.১ শতাংশ নারী মন্ত্রিত্বের পদে অধিষ্ঠিত। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডিথ ক্রিসন উক্তি করেন যে, ক্ষমতার শীর্ষে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপনের একমাত্র উপায় হল বাধ্যতামূলক কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক নারীর জন্য রাজনীতিতে প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি করা। রাজনীতির উচ্চ পর্যায়ে ন্যূনপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করা হয়, যা নারীর বিশেষ অবস্থান, সমস্যা ও মূল ইস্যুকে পুরোভাগে আনতে এবং তা মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্থাসমূহকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় প্রশাসন ও রাজনীতি যে শুধু পুরুষকেন্দ্রিক হয় তাই নয়, দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা নারীপ্রেক্ষিত বিবর্জিত হয় এবং নারী সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও প্রান্তিক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে বাধ্য হয়।

আজকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে নারী সাংসদের গড় হার ১৩.৩ শতাংশ, নরডিক দেশগুলোতে অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের কারণে মহিলা সাংসদের হার ৩৪ শতাংশ এবং মহিলা মন্ত্রীর হার ৩২ শতাংশ। বর্তমান সুইডেনের মন্ত্রিসভার ৫০ শতাংশই মহিলা। এসব দেশে স্থানীয় সরকার ও পৌরসভায় মহিলার অংশগ্রহণের হার ৩০-৫০ শতাংশের মধ্যে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রায়নের প্রসার একদিকে যেমন রাজনীতিতে নারীর সমঅংশগ্রহণের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ কোটা পদ্ধতির বিলোপ ঘটায় বহু দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র কোটা পদ্ধতিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পুরুষের সমপর্যায়ে যোগ্য নারীর প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির কার্যকর সাময়িক কৌশল হিসেবে গ্রহণ না করে প্রতীক হিসেবে কিছু নারীকে উচ্চপর্যায়ে বৃহত্তর নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত করেছে, যা বাংলাদেশে লক্ষ করা যায়।

এ ধরনের পদ্ধতি নারীকে মূলত পুরুষতান্ত্রিকতার মুখপাত্র হিসেবেই উপস্থাপিত করে—প্রশাসনকে নারীপ্রেক্ষিত থেকে প্রভাবান্বিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে দুটি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যায়। প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে

নারী প্রার্থী মনোনয়নে বাধ্য করা—যা নেপাল, তাঞ্জানিয়া, আর্জেন্টিনা, সুদান ইত্যাদি দেশ প্রচলন করেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, সংসদে মোট আসনের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা, যাতে মহিলা সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে নারী প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ, অর্থাৎ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রচলন ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আনুপাতিক হারে নারীর জন্য মনোনয়ন নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমেই রাজনীতিতে নারীর ন্যূনতম কাম্য পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব—যাকে 'ক্রিটিক্যাল মাস' বলা হয়ে থাকে (৩০ শতাংশ), তা অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যরা সংসদ সদস্যদের (প্রকৃতপক্ষে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনপ্রাপ্ত সদস্যদের) দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এই কারণে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপরিচালনায় 'নারী পরিপ্রেক্ষিতে'র প্রতিফলন কখনোই হয়নি। জনসংখ্যার তুলনায় নারী আসনের সংখ্যা ও নির্বাচন পদ্ধতি দুটোই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে একটি প্রতীকে রূপান্তরিত করেছে। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের নারীসমাজ সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির দাবি জানিয়ে জোরালো আন্দোলন করছে, যা এখন সমগ্র সুশীল সমাজের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপরিচালনায় নারী

স্বাধীনতার ২৯ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় নারী নেতৃত্বের অধীনে শাসিত হয়েছে। সামরিক শাসনামল বাদ দিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রপরিচালনায় নারীই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। একটি দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ হয়েও ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর ১২তম দেশ, যার শীর্ষ নেতৃত্বে উঠে আসেন একজন নারী। আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যার প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়েই মহিলা, যা আজও বহাল আছে। পরবর্তীকালে নিউজিল্যান্ড এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার মৃত্যুতে ১৯৮২ সালে এক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অবস্থায় খালেদা জিয়া বিএনপির হাল ধরেন। দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে একটি নবগঠিত সংমিশ্রিত মত ও আদর্শের দলকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির অভাব থাকলেও কঠিন পরিশ্রম, ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর দলসহ সাত দলের জোটের নেতৃত্ব দেন তিনি। খালেদা জিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক বিজয় ছিল আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে এরশাদবিরোধী দলীয় আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায়, যা অবশেষে এরশাদ সরকারের পতন ঘটায় এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করে, তাঁর দলকে ক্ষমতায় আনে। খালেদা জিয়ার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলন করা, অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা, কৃষি সংস্কার, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মেয়ে শিক্ষা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা ও 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি চালু করা, নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খালেদা জিয়া শাসনের একটি মাইলফলক ছিল চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্লাটফরম ফর অ্যাকশান বা কার্যক্রম দলিলে সংরক্ষণ ছাড়া স্বাক্ষর দান করে নারীর পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপনের অঙ্গীকার করা। কিন্তু সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য তাঁর সরকার তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

খালেদা জিয়া তখন ক্ষমতায় আসেন মূলত সামরিক শাসনের প্রতিকূলতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতিতে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব এবং মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে। সেজন্য খালেদা জিয়ার কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রিত্বের আগে দীর্ঘ নয় বছরের সংগ্রামে তিনি মৌলিক গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে আপোসহীনতা দেখিয়েছেন, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটানো হয়নি। খালেদা জিয়ার শাসনামলে দেশে যেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিপর্যয় ঘটেনি, তেমনি দারিদ্র্যহ্রাস, নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কোনো ক্ষেত্রেই এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশে প্রথমবার একজন নারী ক্ষমতার শীর্ষস্থানে এলেও নারীর মূল সমস্যা বা ক্ষেত্রগুলো জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি—নীতি ও প্রশাসনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দুর্বলতাই প্রতিভাত হয়। কারণ দেশের অনুন্নয়নের মূল কারণগুলো ওতপ্রোতভাবে নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে মোকাবেলার পরিবর্তে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবেলা করলে তা হতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচায়ক। খালেদা জিয়ার শাসনের আরেকটি শূন্যতা ছিল—পূর্ববর্তী নয় বছরের স্বৈরশাসনের সময় অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার বিবর্জিত যে পরিস্থিতির শিকার তিনি নিজে হয়েছেন, ক্ষমতায় আসার পর তা নিরসনের কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গণতন্ত্র চর্চা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ন্যায়পাল বা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা বা জনগণের মানবাধিকার রক্ষা ও পরিবীক্ষণের জন্য কোনো স্বাধীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বিলোপ করারও উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ফিলিপাইনের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট কোরাজন অ্যাকিনোর ভূমিকা তুলনীয়। খালেদা জিয়ার মতো তিনিও ক্ষমতায় আসেন অগণতান্ত্রিক সরকারের দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসন ও জনগণের ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সেই কারণে ১৯৮৬ সালে কোরাজন অ্যাকিনো ক্ষমতা গ্রহণের পরই সর্বপ্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি দেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ফিলিপাইনের সংবিধান ব্যাপক সংশোধনের মাধ্যমে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবাধিকার, শিক্ষা ও সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে ফিলিপাইনের সংবিধানই একমাত্র মডেল, যা সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং অন্যান্য আইন রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবাধিকার সংরক্ষণের নীতি পালনের অঙ্গীকারে বাধ্য করে। সকল নাগরিকের কাছে এজন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর উত্তরাধিকারসূত্র ধরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যদিও হাসিনা বাল্যকাল থেকে রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, তবুও এর আগে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। ১৯৮৬ সালে এরশাদ সরকারের নির্বাচনে যোগ দিয়ে তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করলে তিনি আবার বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মাধ্যমে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রে খালেদা জিয়ার তুলনায় অধিক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান এবং দলের পক্ষে দক্ষ নেত্রীর ভূমিকা পালন করেন। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে হাসিনার এই দক্ষতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনার অর্জনের তালিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইনডেমনিটি আইন বাতিল ও বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্থাপন ও ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি করা ইত্যাদি। নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক নারীকে তৃণমূল প্রশাসনে সম্পৃক্ত করা এবং 'সিডও' সনদকে (নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ) অধিক কার্যকর করার লক্ষ্যে সনদ থেকে দুটি সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও সনদের অপশোনাল প্রটোকল পূর্ণ অনুমোদন করা তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের বাইরে দেশের পরিচিতি ও সুনাম অর্জনেও হাসিনার বিশেষ অবদান রয়েছে।

হাসিনা সরকারের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা হল দেশে আইনশৃঙ্খলা অবস্থার ব্যাপক অবনতি। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খালেদার মতো হাসিনা সরকারও মানবাধিকার কমিশন গঠন বা ন্যায়পাল নিয়োগ করেননি। তিনি অঙ্গীকার করেও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বিলোপ করেননি।

এ পর্যায়ে খালেদা ও হাসিনা সরকারের মূল্যায়ন অযৌক্তিক হবে না। উপরন্তু পরপর দুজন নারী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জনগণের মনে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে একটি তুলনা করার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দুজনই এশিয়ার অন্যান্য মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের মতো পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। ইন্দিরা গান্ধী বা বেনজির ভুট্টোর মতো এঁদের কৈশোর জীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঘটেনি—তবে অন্যদের মতো এঁরাও রাজনৈতিক দলের সঙ্কটমুহূর্তে 'কমপ্রোমাইজ কেনডিডেট' বা আপোসপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন এবং দলকে ভাঙনের মুখ থেকে রক্ষা করার জন্য পুরুষপ্রধান দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ের জন্য দলের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হওয়া যতটা সহজ ছিল, ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছাবার পথ ছিল তার চাইতে অনেক দুরূহ। খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হতে দীর্ঘ ৯ বছর এবং হাসিনাকে দীর্ঘ ১৮ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে সম্পূর্ণ পুরুষপ্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে—যেখানে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নমত ও আদর্শের সংমিশ্রণ রয়েছে, তাদের সংঘবদ্ধ ও আন্দোলনমুখী করে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো অবশ্যই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের পরিচায়ক। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুজনকেই উত্তরাধিকারসূত্রে নেত্রী হয়েছেন বলে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। একটি অনুন্নত, সমস্যাসংকুল ও পুরুষতান্ত্রিক দেশে যেখানে সাধারণ মানুষ ভাগ্যোন্নয়নের আশায় প্রতিনিয়ত বিকল্পের সন্ধান করছে, সেখানে একনাগাড়ে নেতৃত্বে টিকে থাকা অসীম বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মুসলিম প্রধান দেশে নারী সরকারপ্রধান হয়েও তারা কেউ রক্ষণশীলতার শিকার হননি এবং সাধারণ জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা একটি বিরাট অর্জন।

শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দুজনেই দলের প্রধান ও সরকারপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। একত্রে দুটি শক্তিশালী পদে অধিষ্ঠিত থাকা তাদের জন্য যেমন সুবিধাজনক হয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তাদের সুশাসনের অন্তরায় হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দল ও সরকারপ্রধানের দায়িত্বে একজন থাকলেও এর ব্যতিক্রম রয়েছে সঙ্গত কারণেই। বিশেষ করে দল ও সরকারপ্রধানের ভিন্নতা গণতন্ত্রের শেকড়কে সুদৃঢ়, ব্যাপক ও অধিক স্বচ্ছ করতে সহায়ক হয়, দল ও সরকারের স্বার্থকে ভিন্ন করে দেখলে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সব ক্ষেত্রে দলীয়করণের যে প্রথা চালু হয়েছে, নেতৃত্বের এই দ্বৈত ক্ষমতা তাকে আরো জোরদার করেছে।

অপর দিকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, দুজনেই নিজেকে গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে দাবি করলেও নিজ দলে তাঁরা গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ খুব কমই দেন। প্রকৃতপক্ষে এ দুজন নেত্রীর স্ব স্ব দলের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তা বর্তমান বিশ্বে অন্য কোনো গণতান্ত্রিক নেতা উপভোগ করেন না বলে

অনেকে মতপ্রকাশ করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণশক্তিকে মূলত ব্যক্তিগত আনুগত্যের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। নেতৃত্বের এই শক্তিকে তারা জনগণকে একতাবদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি—বহু ক্ষেত্রে জনগণকে বিভক্ত করেছেন। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা একদিকে যেমন তাদের নিজেদের শাসনামলকে সংঘর্ষপূর্ণ করেছে, তেমনি দেশের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে করেছে দুর্বল। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের সমঝোতা হয়নি, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল উত্থাপন ও পাস করার ব্যাপারটি। সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও নারীসমাজ সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের যে দাবি জানিয়েছে, তা সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই সমর্থন করে বলে দাবি করলেও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করায় এবং সরকারি দল সংসদে বিরোধী দলের যোগদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্ব না দেওয়ায় তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সমঝোতার অভাব শুধু নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সীমিত করে দিয়েছে তাই নয়, ভবিষ্যৎ নারী নেতৃত্বকেও অনিশ্চিত করে রেখেছে। কারণ নারীকে নেতৃত্বের শীর্ষে উঠতে হলে উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, তার প্রয়োজন একটি শক্ত 'সাপোর্ট বেস' যা একমাত্র সম্ভব আইন পরিষদে বা সংসদে অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের উপস্থিতিতে।

নারী রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব

জাতিসংঘের কার্যোপলক্ষে আমার কিছু নারী রাষ্ট্র/সরকারপ্রধানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সম্প্রতি আমার এঁদের কয়েকজনের সঙ্গে নারী নেতৃত্বের বিষয়টি নিয়ে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল সিলভিয়া কার্টরাইট আট বছর সিডও কমিটির সদস্য থাকার সূত্রে তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বহুবার আলাপ হয়েছে। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিম ক্যাম্পবেল, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন, নরওয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্রোহারলেম ব্রান্ডল্যান্ড ও আইসল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিগদিস ফিনবোগাদতির কাছে বিষয়টি উত্থাপন করে তাঁদের মতামত জানতে চাই। তাঁরা সবাই অবশ্য সব ইস্যুতে একমত পোষণ করেননি, তবে মূল বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামতের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁরা সবাই পশ্চিমা দেশের বলে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা কিছুটা অভিন্ন।

উন্নত দেশের রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে থাকলেও এরা প্রত্যেকেই মনে করেন, তাঁদের সহকর্মীরা, বিশেষত জনগণ সবসময়ই প্রচ্ছন্নভাবে আশা করেছে যে তাদের

সাধারণ পুরুষ নেতাদের চাইতে অধিক দক্ষ ও জ্ঞানী হতে হবে। কারণ নারী হয়েও রাষ্ট্রের উচ্চতম নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের পূর্বতন সহকর্মীদের তুলনায় তারা অনেক উন্নতমানের—জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণে সাধারণ পুরুষ রাষ্ট্রপ্রধানের তুলনায় তাদের কর্মে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে মা হওয়ার কারণে কিছুটা সময় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, যা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এরা প্রত্যেকেই মতপ্রকাশ করেন যে, অসংখ্য পুরুষের তুলনায় যেহেতু মাত্র ৩০ জন নারী বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে এসেছেন, এজন্য তাদের শাসন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কোনো বিশেষ উপসংহারে পৌঁছান সম্ভব নয়। তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একটি প্রথাগত পুরুষ পরিমণ্ডলে হঠাৎ একজন নারীর উপস্থিতি বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, যা ইতিবাচক ও অধিক লিঙ্গ সংবেদনশীল। কিম ক্যাম্পবেল ও মেরি রবিনসন মনে করেন, নারী রাষ্ট্রপরিচালনায় একটি ভিন্ন স্টাইলের জন্ম দেয়। নারীর সহজাত সতর্কতা তাকে ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সহজাত সংবেদনশীলতার মিশ্রণের কারণে তারা পরিচালনার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পুরুষের আধিপত্যপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য বঞ্চিত গোষ্ঠী যথা নারী, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন, যা পরিচালনা পদ্ধতিতে একধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরার একটা প্রবণতা থাকে নারীনেত্রীদের মধ্যে। এতে প্রশাসনে অধিক ইনফরমালিটি বা অনানুষ্ঠানিকতা প্রচলিত হয়, যা পূর্বে উপেক্ষিত অনেক সমস্যাকে পুরোভাগে নিয়ে আসতে পারে।

পরিবার ও সমাজে নারীর বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ায় উন্নয়নের অগ্রাধিকার চয়নেও পুরুষের তুলনায় তারা অন্য অনেক বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে পশ্চিমের অধিকাংশ নারী রাষ্ট্রপরিচালকের উন্নয়ন এজেন্ডাতে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপরিচর্যা ও সোশ্যাল সিকিউরিটি ইত্যাদি বিষয়কে তাঁরা মনে করেন সমাজ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। গ্রো হারলেম বলেন, নারীরা এই ধরনের ইস্যুর ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় তাদের 'সফট ইস্যু' বা নারীর ইস্যু বলে উল্লেখ করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ এবং পরাজিত প্রার্থী আল গোর দুজনেই তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে এসব 'সফট ইস্যুর' ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে প্রমাণিত হয় নারীনেত্রীদের দূরদর্শিতা। যেকোনো রাষ্ট্র পরিচালকের জন্য 'পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট' বা রাজনৈতিক অঙ্গীকার বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যার মাধ্যমে একজন রাষ্ট্রপরিচালকের আন্তরিকতার ও সাফল্যের মূল্যায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে নারীর একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে মনে করেন কিম ক্যাম্পবেল। কারণ পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের বিষয় নয়, তাঁর সমগ্র মন্ত্রিসভা, আইনসভা ও রাজনৈতিক দলের সমর্থন এজন্য অপরিহার্য। কিন্তু

রাজনৈতিক দলে ও সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা অন্তত ৩০ শতাংশ না হলে তাদের পক্ষে ব্যক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। কারণ সংসদ ও দল হল রাষ্ট্রপরিচালকের 'সাপোর্ট বেস', সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকার চয়নের সমর্থন অত্যাবশ্যক। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অঙ্গীকার পূরণে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রপ্রধানরা এ ধরনের সমর্থন পেয়েছেন। সংসদে ৩০ শতাংশের অধিক নারী সদস্য থাকায়, সংসদে উচ্চহারে নারী সদস্যের উপস্থিতি থাকায় সামাজিক উন্নয়নের ইস্যু অগ্রাধিকার পেয়েছে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশে।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা সবাই মত প্রকাশ করেন যে, নারী নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংসদে তার সাপোর্ট বেস তৈরি করা। এর অভাবে আমেরিকার নারী আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিতে তাদের অনুপ্রবেশ ও অবস্থান নগণ্য। কারণ সেখানে কংগ্রেসে নারী সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ ও সিনেটে ২৩ শতাংশ।

মন্তব্য

পশ্চিমা দেশের এসব নারীনেত্রীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে তুলনীয় না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌলিক সামঞ্জস্য দেখা যায়। আমাদের সমস্যা আরো গুরুতর, সমাজ আরো রক্ষণশীল ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া সুদৃঢ় না হওয়ায় রাষ্ট্রপরিচালনা অধিক চ্যালেঞ্জপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে যেকোনো রাষ্ট্রপরিচালকের জন্য সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গসমন্বয়ের ব্যাপারটি অত্যাবশ্যকীয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক বলেছিলেন, তৃতীয় বিশ্বের শাসকদের জন্য উন্নয়নের সবচেয়ে স্বতঃসিদ্ধ ও স্পষ্টত প্রতীয়মান ইস্যুটি আবিষ্কার করাই হচ্ছে সবচেয়ে দুরূহ, আর তা হল নারীর ক্ষমতায়ন। নেতা হিসেবে নারীর সাফল্য অর্জনের জন্য এর গুরুত্ব আরো বেশি। রাজনীতিতে তাদের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তা হল, পুরুষপ্রধান সংসদে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান সুদৃঢ় করা। কিন্তু দৃশ্যত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ এক শঙ্কাকুল পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সংবিধানের ২৮(১) অনুচ্ছেদে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের ঘোষণা দেয়া হলেও নারীর অবস্থানগত পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে ২৮(৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুর অনুকূলে রাষ্ট্রকে বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষভাবে রাজনীতিতে নারীর অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফায় সর্বপ্রথম নারীদের জন্য জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন ১০ বছর মেয়াদে সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। ১৯৭৮ সনে সংবিধান সংশোধন করে এই সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করে এর মেয়াদ ১০ থেকে ১৫ বছর করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৭ সালে এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর চতুর্থ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য কোনো সংরক্ষিত আসন ছিল না। ১৯৮৭ সালে চতুর্থ সংসদেই সাংবিধানিক আইন দ্বারা সংসদে নারীদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা নতুন করে সংযোজন করা হয়। প্রথম ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আবার তা ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। সংবিধানের দশম সংশোধনের দ্বারা আনীত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের এই কার্যকারিতা ২০০১ সালের ৪ এপ্রিল শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিগত সপ্তম জাতীয় সংসদই ছিল নারীদের সংরক্ষিত আসন অনুযায়ী নির্বাচিত সাংসদ কর্তৃক নারী সাংসদ নির্বাচিত করার শেষ সংসদ।

স্বাধীনতা পরবর্তী কাল হতে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও বাংলাদেশের নারী আন্দোলন বিগত তিনদশকে যথেষ্ট গতিশীল হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী সংগঠনগুলো বিগত দেড়দশক ধরে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনজিও, নারী সংগঠনসমূহ, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, সুশীল সমাজ এবং সচেতন নাগরিকগণ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন, গবেষণা, সচেতনতা সৃষ্টি ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও লবিং চালিয়েছে এবং এর ফল হিসেবে বিগত অষ্টম সংসদ নির্বাচনের আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুটি একটি প্রায়োরিটি অবস্থানে এসে দাঁড়ায় এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যাপক ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও এ বিষয়ক অঙ্গীকার প্রতিফলনে তৎপর হয়। সবগুলো প্রধান রাজনৈতিক দলই সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন পুনঃপ্রবর্তন এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের সুস্পস্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, যা নারী আন্দোলনের দাবির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলা চলে।

সবগুলো প্রধান দলের নির্বাচনোত্তর অঙ্গীকারের মধ্যে রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্বের ইস্যুটি স্থান পাওয়ার মূল কারণ ছিল এই যে জনগণ তথা ভোটাররা প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক গভর্নেন্সে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কাম্য এবং যুক্তিযুক্ত। জনগণের সেই আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে যাঁরা নির্বাচনে ভোটারের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষে জনগণের এ দাবি পূরণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের ওপর দায়িত্ব বর্তায় জনগণের এই দাবি পূরণ ও তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার। বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এ জন্যে সংবিধানে যথাযথ সংশোধন আনতে হবে। সৌভাগ্যবশত বর্তমান সরকারের পক্ষে সংসদে চতুর্দশ সংশোধনী বিল উত্থাপনের মাধ্যমে নারীসমাজের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। যেহেতু তারা অনুকূল অবস্থানে আছেন—তাই নিজস্ব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ দায়বদ্ধতা রয়েছে বর্তমান সরকারের।

কিন্তু আমরা হতাশার সাথে লক্ষ করছি যে, নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও এবং আজ অবধি বেশ কটি সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও, একদিকে যেমন সংসদ নারী প্রতিনিধিত্ববিহীনভাবে চলছে, অন্যদিকে সরকারি দলসহ কোনো রাজনৈতিক দলই সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের পূর্ব অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

এ ব্যাপারে আমাদের দেশের দুই অত্যন্ত ক্ষমতাধর নারীনেত্রী খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাই বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্ব উত্তরাধিকারের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে এসে সমঅংশীদারিত্বের দাবিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

আবদুল মতিন খান

পৃথিবীতে জীবন্ত সত্তা যত আছে, স্ত্রী-পুরুষ ছাড়া প্রায় নেই। প্রাণের অনুন্নত অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য তত স্পষ্টগোচর নয়। তবু তার, বিদ্যমানতা একটু খোঁজ নিলেই মেলে। প্রাণের প্রবহমানতার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের আন্তঃক্রিয়া আবশ্যিক। সম্প্রতি ক্লোনিং করে কেবল স্ত্রী প্রজাতি দিয়ে সন্তান জন্মদান সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রজাতির অব্যাহত বংশধারার নিশ্চয়তা নেই বলে মনে হয়। ক্লোনিং করে কেবল বিশেষ ধরনের স্ত্রীপ্রাণী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়তো হবে। প্রজাতির বংশগতির স্বাভাবিক ধারা স্ত্রী-পুরুষের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে ও বজায় থাকবে। বজায় থাকবে আশা করা যায় তখনো, যখন ক্লোনিং পদ্ধতি ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নত হয়ে ওই পদ্ধতিতে জন্মদান স্বাভাবিক পদ্ধতিতে জন্মদানের সমকক্ষ হবে। স্বাভাবিক উপায়ে জন্মদানের প্রতি মানব-মানবীর অটল পক্ষপাত থাকবে এ কারণে যে, মানুষের কাছে জন্মদান ও বংশরক্ষা কেবল একটি জৈবিক প্রক্রম নয়—যেমনটা সাধারণত মানবেতর প্রাণীর বেলায় দেখা যায়। প্রাণ যত উন্নত ও জটিল হয়, স্ত্রী পুরুষ ভেদ তত প্রকট হয় এবং একের প্রতি অপরের দুর্নিবার আকর্ষণে তত সূক্ষ্মতা দেখা দেয়। স্ত্রী পুরুষ ভেদ যত প্রকট হয় প্রাণীর মধ্যে জৈবাতিরিক্ত উপাদানের সমারোহ তত বাড়তে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সমারোহ সর্বাধিক হওয়ায় নারী-পুরুষ সম্পর্কে শারীরিক স্তর অতিক্রম করে বিশেষ একটি মানসিক স্তরে পৌঁছে যায়—যা মূলত অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়, ব্যাখ্যার বিষয় নয়। এ জন্য মানুষের যৌনতা বিশুদ্ধ শরীরকেন্দ্রিক নয়। শরীর ভূমিকা পালন করে ঠিকই, তবে নির্ণায়ক নয়। নয় বলে শারীরিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ নারী সুপুরুষ পেয়েও এবং শারীরিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ পুরুষ সুদেহী সুন্দরী নারীর আহ্বান পেয়েও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগতে পারে। আবেগগত উপাদান নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে থাকে বলেই এই ব্যাপারটি ঘটে, যা অন্য প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। মানুষের যৌনতার এই বিশেষ দিকটির প্রতি লক্ষ রেখে অগ্রসর হলে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্ক ধরা সহজ হয়।

স্মরণাতীত কাল থেকে নারী-পুরুষের মনোদৈহিক বা প্রেমজ-কামজ বৈশিষ্ট্য মোটামুটি স্থির রয়ে গেলেও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থির থাকেনি। রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে গেলে নর-নারীর মধ্যেকার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-রীতিতে কালে কালে পরিবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ভর করে সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের ওপর। উৎপাদন সম্পর্ক বদলে গেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে বদলে যায়। এই বদলের প্রভাব নর-নারীর সম্পর্কের ওপরে না পড়ে পারে না।

আফগানিস্তানের কথা ধরা যাক। ওই দেশে এক সময়ে ছিল রাজতন্ত্র অর্থাৎ সামন্তবাদ। সামন্তবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনে নারীর তেমন ভূমিকা না থাকায় তারা তখন ছিল গৃহবন্দি। তাদের লেখাপড়া শিখতে দেয়া হত না উৎপাদন-পদ্ধতি তা দাবি করত না বলে। এই দেশের কমিউনিস্টরা রাজতন্ত্র উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। কমিউনিস্ট শাসকরা আবাদি জমি সামন্ত প্রভুদের কবলমুক্ত করে কৃষকদের দিয়ে দেয়। উৎপাদন সম্পর্কের এই পরিবর্তন একটি শিক্ষিত কৃষকসমাজ গড়ার প্রয়োজনকে যেমন আবশ্যিক করে তোলে, তেমনি তোলে পর্দামুক্ত নারীসমাজকে। কমিউনিস্ট সরকার ব্যাপক হারে নারী-পুরুষ ও আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে মুক্ত করে বিদ্যালয়ে পাঠাতে থাকে। শিক্ষিত নারীদের তারা সকল পেশায় নিয়োগ দিতে থাকে। সাধারণ মানুষের মুক্তি ও সুখ যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী বর্বর শাসকদের ঘোরতর অপছন্দ। তারা আফগানিস্তান থেকে কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে তাদের পদলেহী পাকিস্তানের মিলিটারি দিয়ে একদল ধর্মান্ধ মাদক চোরাচালানিকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সে দেশে পাঠায়। এদের বলা হত মুজাহেদিন। পাকিস্তানি ও মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসাররা এদের দিয়ে আফগানিস্তানের ভেতর অন্তর্ঘাত চালাতে থাকে। আফগানিস্তানের সরকারকে সমরাস্ত্র দিয়ে রক্ষা করত সোভিয়েত সরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়লে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত মুজাহেদিনরা সরকার দখল করে। তারা নারীকে পর্দায় ঢাকলেও তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে না এবং বাইরের কাজকর্ম থেকেও বিরত করে না। কমিউনিস্টদেরকেও তারা পাইকারিভাবে হত্যা করে না। এতে যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা তাদের ওপর খুব চোটে যায়। মুজাহেদিনদের উৎখাত করতে তারা এবার পাকিস্তানের মিলিটারি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্ররোচিত করে মাদ্রাসার ছাত্র অধিক কট্টর তালেবানদের। তালেবানরা মুজাহেদিনদের উৎখাত করে কমিউনিস্ট নিধনের বিসমিল্লা করে কাবুলে জাতিসংঘের আশ্রিত আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লাহ ও তাঁর ভাইকে খুনের পর তাঁদের লাশ প্রধান সড়কের মোড়ে প্রদর্শনার্থে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে লটকিয়ে রাখে। ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে তারা হুকুম জারি করে নারীদের লেখাপড়া ও বাইরের কাজ নিষিদ্ধ করে দেয়, তাদের করে গৃহবন্দি। তারা বালিকা ও তরুণীদের স্কুল-কলেজে পাঠাবার অপরাধে তাদের পিতা ও ভাইদের শাস্তি দেয় এবং শিক্ষালয়ে যাওয়ার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাদের ধর্মযোদ্ধাদের দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করায়! এইসব 'বীরোচিত' কাজের জন্য মার্কিন প্রশাসন ও পাকিস্তান সরকার

তালেবানদের উল্লাসের সঙ্গে অভিনন্দিত করে। তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তানে আবার সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উৎপাদন সম্পর্ক বদলে যাওয়ায় ওই দেশের নর-নারীর সম্পর্ক সামন্তবাদের কালে ফিরে যায়, নারীরা হয়ে গেছে পুরুষের গৃহপালিত প্রাণীতুল্য।

আফগানিস্তানের পরিস্থিতির উল্লেখ করা হল এই বিষয়টির ওপর আলো ফেলতে যে, আজকের বিশ্বের ধনী দেশের নারী-পুরুষ সম্পর্ক সে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা র্নিধারিত হলেও দরিদ্র দেশের নারী-পুরুষ সম্পর্ক কেবল ওই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা র্নিধারিত নয়, তার ওপর বাইরের একটি আধিপত্যবাদী প্রভাব-বলয়গত মাত্রা আছে। দরিদ্র দেশগুলো ধনী দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পীড়নের প্রত্যক্ষ লক্ষবস্তু হওয়ায় প্রাভুত্বিক অনেক লিখিত, লিখিতের চেয়ে বরং বহু সংখ্যায় অলিখিত, অনুশাসন এ সকল দেশের নর-নারীর সম্পর্ককে বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নারী-পুরুষ সম্পর্ক ওই দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পুঁজিবাদ নারী পুরুষ উভয়কেই মুক্ত রাখে তাদের শ্রমের ফসল যথেচ্ছ আত্মসাৎ করতে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী পুরুষ উভয়ের শ্রমই প্রতিযোগিতামূলক দরে ক্রয়যোগ্য। নারী পুরুষ উভয়েই পণ্য হলেও যুবতী নারীরা হল এক বিশেষ ধরনের ভোগ্যপণ্য, যাদের ভোগের জন্য প্রস্তুত করতে পুঁজিপতিরা সৌন্দর্যবর্ধক পোশাক ও প্রসাধনী তাদের ব্যবহারের জন্য বাজারজাত করে। পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রস্তুত এই নারীদের বিকিকিনির জন্য হাটে তোলা হয় ফ্যাশন শো এবং সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে—যার সর্বোচ্চটি হল বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা। বিশ্বের সেরা লম্পট ও বদমাশরা থাকে এই প্রতিযোগিতার বিচারক ও জুরি। যেসকল যুবতী তাদের দেহের সম্পদ উচ্চমূল্যে বিক্রি করতে লালায়িত হয় তারাই নানা ধরনের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। জঘন্যভাবে তারা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়। নিজেকে অর্থের লোভে বিক্রি করার আবহে গড়ে ওঠা নারী কি স্বাধীন? পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সমাজের নারী একান্তভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। পুরুষ তাদের ইচ্ছামতো ভোগ করে এবং তাতে অনিচ্ছুক হলে ধর্ষণ করে। পাশ্চাত্যের হাট-বাজার, অফিস-কাচারি, সর্বত্র নারীরা পুরুষের যৌন হয়রানির অসহায় শিকার। ঘরেও তারা নিরাপদ নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্যান্য শোষক দেশের ঋণজালে আবদ্ধ দরিদ্র দেশের নারী ঘরে বন্দি থাকলে একান্তরূপে হয়ে পড়ে পুরুষের করুণার পাত্রী, এবং যদি মুক্ত জীবন পায় তাহলে হয় যুক্তরাষ্ট্রের নারীর মতোই ঘরে বাইরে যৌন পীড়নের শিকার। বন্দিত্ব ও মুক্তি দুই অবস্থাই তার জন্য সমান অসহনীয়। বাংলাদেশের নারীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নারীর এখানেই একটু তফাত।

প্রাণীর মধ্যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ককোষ সর্বাধিক বিকশিত বলে মন বলতে যা বোঝানো হয় তা কেবল মানুষেরই আছে। প্রাণীর যৌনতা তার বংশ রক্ষার উপায় ছাড়া বিশেষ কিছু নয়। মানুষ প্রাণী বলে মানুষেরও তাই। তবে যেহেতু মানুষের আছে মন, সেহেতু মানুষের যৌনতা শুধু বংশ রক্ষার উপায় না থেকে ইন্দ্রিয় সুখলাভের ও ভোগেরও একটি মাধ্যম হয়ে গেছে। নারী-পুরুষ সম্পর্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে

যৌনসুখ মধুর সুখ। নারী-পুরুষ সম্পর্কে বিকার দেখা দিলে যৌনানুভূতি হয়ে যায় পীড়াদায়ক, অনেক ক্ষেত্রেই নারীর জন্য।

নারী-পুরুষ সম্পর্ক নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিয়ম-কানুন দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্র মানেই হল রাশ টেনে ধরা বিধি-নিষেধ। রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্বৈরাচারী শাসকও পারে না। রাষ্ট্র মানে স্বাধীনতা খর্ব। মানুষ যখন একা থাকে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অনেক মানুষ একত্রে থাকলে একজন আরেকজনের স্বাধীনতায় অনবরত বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এই বিঘ্ন নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার হয় সকলের সম্মতিতে একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার—যার নাম সরকার। একটি ভূখণ্ডের জনতা একটি সরকার পেলে একটি রাষ্ট্রও পায়। রাষ্ট্র তখন তার সকল নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সর্বসম্মত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে—যাকে বলা হয় আইনমালা। রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বাধীনতা রাষ্ট্রের তৈরি আইনমালার দ্বারা সীমাবদ্ধ। সীমা বেঁধে দিলে খর্বতার প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু সীমা যদি না রাখা যায়, তাহলে স্বাধীন হয়েও অরাজকতার জন্য কেউ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কাজেই, রাষ্ট্রের (আইন দিয়ে) বেঁধে দেয়া সীমা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার শর্ত খুলে দেয়াই। তবে স্বাধীনতার সুষম ভোগের জন্য দরকার সকল নাগরিকের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য আইনমালা ও তার পক্ষপাতহীন প্রয়োগ। অধিকাংশ সমাজের নারী-পুরুষ সম্পর্কতে যে টানাপোড়েন চলে, তা রাষ্ট্রের আইনমালার মধ্যে 'সমভাবে গ্রহণযোগ্য' ও তার 'পক্ষপাতহীন প্রয়োগ' থাকে না বলে। অধিকাংশ সমাজের রাষ্ট্রীয় আইনমালা অনেক সময়ে সকল নাগরিকের কাছে তো নয়ই, গরিষ্ঠ সংখ্যক নাগরিকের কাছেও গ্রহণযোগ্য থাকে না। তার নিরপেক্ষ প্রয়োগও দেখতে পাওয়া যায় না। এরূপ হলে নাগরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে অবস্থায় সংখ্যালঘু শ্রেণীর নারী-পুরুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর নারী-পুরুষের চেয়ে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। বিষম বা অসম এই পরিস্থিতির মধ্যেও সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর নারী সকল শ্রেণীর পুরুষের তুলনায় স্বাধীনতা অনেক কম ভোগ করে কিংবা করেই না।

নারীর এই হীন অবস্থার জন্য দায়ী হল সমাজে তার দুর্বল অবস্থান। নারী হল পুরুষের অধীন—বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের। নারীর অধঃস্তন অবস্থান তৈরি হয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দিলে। তার আগের যে সমাজ ছিল, তাতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় নারী-পুরুষ সম্পর্ক ছিল সমতা-ভিত্তিক, কেউ কারো ওপর খবরদারি নজরদারি করতে যেত না। সম্পত্তির ধারণা এসে যাবার পর উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারীর প্রশ্ন দেখা দিল। সম্পত্তির মালিকানা প্রজন্মানুক্রমে রক্ষা করার জন্য প্রবর্তন করা হল উত্তরাধিকারের নিয়মটি—পেশিশক্তি সম্পত্তি করায়ত্ত করার ও রক্ষার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন বলে প্রমাণিত হলে এক সময়ে সমাজে চালু হয়ে গেল পুরুষের কর্তৃত্ব। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুরুষের এই কর্তৃত্বের ভূমিকা নারী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তার নিরাপত্তাহীনতার পরস্পর

প্রতিযোগী একাধিক দুরবস্থার মধ্যে পুরুষের প্রভুত্ব বা আধিপত্য মেনে নেয়া হয়তো তার কাছে ছিল সবচেয়ে কম দুর্বিষহ। পুরুষ পুরুষের আক্রমণ থেকে, বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে নারীকে অনেক সময় রক্ষা করতে পারে না। সেটা হয় তার নিজের পরাজয় হয়ে গেলে। তখন নারীকে রক্ষা করবে কি, সে নিজেই হয়ে যায় বিজয়ীদের হাতের খেলনা! এ জন্য পুরুষের কাছে নারীর সম্ভ্রমরক্ষা হয়ে দাঁড়ায় সর্বোচ্চ মানরক্ষার বিষয়। নারীকে রক্ষার জন্য সে সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। ব্যক্তিগত মালিকানার কালে নারী এ জন্য পুরুষ-আরোপিত সকল বিধি-নিষেধ মেনে নেয় যার মধ্যে সন্তানের জন্ম দিয়ে তার স্বামীর বংশরক্ষা, সন্তানটি যে তার স্বামীর তা নিশ্চিত করতে বিবাহিত জীবনে ব্যাভিচারিনী না হওয়া এবং স্বামীর (বিয়ের আগে পিতার) সকল আদেশ মেনে চলা অন্তর্গত। স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলনের আগ পর্যন্ত একই কারণে তার অক্ষতযোনি থাকাও আবশ্যিক। পিতা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কিংবা তাদের মৃত্যু হলে সমাজানুমোদিত আরেকজন অভিভাবকের অধীনতা তার জন্য অপরিহার্য। ব্যক্তিমালিকানার সমাজে তাই নারী হল পুরুষ-শাসিত। ব্যক্তিমালিকানা হল রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি রূপ। এ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সম্পর্ক বাঁদি-প্রভু সম্পর্ক না হয়ে যায় না। ইউরোপ আমেরিকার আজকের সমাজও এর ব্যঁতিক্রম নয়। পুরুষের অবাধ্য হলে সে-সমাজের নারীও বেধড়ক পিটুনি খায়, পুরুষের হাতে হয় খুন। আদালতে এসব নির্যাতনের প্রমাণ দুঃসাধ্য হওয়ায়, বাংলাদেশের মতোই, ইউরোপ-আমেরিকার নারীও বিচার পায় না এবং বিচারের দ্বারস্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও অসম বণ্টন স্বীকৃত আদর্শ। ফলে, বাংলাদেশের সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের কাছে নারীর অধঃস্তনতা একটি স্বাভাবিক প্রপঞ্চ। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ও তাদের সমাজের গুণীদের জ্ঞানালোকবাদী নানা উদার ভাবনার দ্বারা আলোকিত ও দীক্ষিত এ দেশের বিদ্বৎসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিদ্যমান নারী-পুরুষ সম্পর্ককে অন্যায্য মনে করে। বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজের বৃহদংশ নারীদের আরো খানিকটা স্বাধীনতা দেয়ার কথা বললেও কার্যত নারীরা তা ভোগ করুক তা তারা চায় না; তারা নারীর দুর্বল অবস্থান ও দাস্যই পছন্দ করে। বাস্তব অবস্থার আলোকে অধিকাংশ নারীও তা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় দেখে না। শিক্ষার এবং নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটায় নারীরা হালে যথেষ্ট অধিকার-সচেতন হয়ে উঠেছে। আলোকিত ও উদার পুরুষসমাজের সহায়তা ও সমর্থনে বাংলাদেশের নারী তাদের পুরুষের সঙ্গে জেগে উঠেছে। প্রগতি-বিরোধী শক্তি এ দেশের সরকার দখল করে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এবং রেডিও-টিভি-সংবাদপত্রে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পশ্চাৎপদ চিন্তাচেতনার ভাবাদর্শ প্রচার করে আসা সত্ত্বেও নারীর পর্দা ছিঁড়ে ও অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসা ঠেকাতে পারেনি। নারী-মুক্তির প্রচার কিছুটা বেগবান হবার জন্য নয়, অর্থনৈতিক কারণে পুরুষেরা তাদের নারীকে পারিবারিক আয়বৃদ্ধিতে যোগ দিতে ঘরের বাইরে অর্থকরী কাজ নিতে আর আপত্তি না করায় নারী-মুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত নারী কেবল যে পুরুষের পাশাপাশি

পুরুষের দখলে-থাকা সকল পেশায় ঢুকে পড়েছে তা নয়, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত নারীও তাদের পুরুষের পাশাপাশি তাদের দখলে থাকা সকল পেশায় ও কাজে প্রবেশ করেছে। কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ আয়-রোজগারের মাঠে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি বাংলাদেশে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে অচিরে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। রাজনীতিতে নারী পরিচালকের ভূমিকা পালন (অবস্থা বৈগুণ্যে) নারীর অবিলম্বে তেমন কোনো সুবিধা এনে না দিলেও সম্মিলিতভাবে নারীসমাজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে যে সহায়ক হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে নারীদের এখনো বহু পথ পাড়ি দিতে হবে এ জন্য যে এদেশে পুরুষও খুব একটা এগোতে পারেনি। পুরুষ যথেষ্ট না এগুলে—পুরুষ পিছিয়ে থাকলে—নারীর এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। নারী-পুরুষ সম্পর্ক গাড়ির দুই চাকার মতো, একটা যদি অকেজো থাকে গাড়ি চলে না, একটা যদি ছোটো থাকে গাড়ি না এগিয়ে কেবল পাক খেতে থাকে। নারী একা তার মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, পুরুষের সক্রিয় সহায়তা তার জন্য একান্তই জরুরি। নারীকে পেছনে ফেলে পুরুষও বেশি দূর যেতে পারে না।

হালে নারী-নির্যাতন বেড়েছে বলে মনে হয়। তার জন্য সাধারণভাবে দায়ী করা হয় কেবল পুরুষকে। এভাবে যারা দায়ী করেন তাঁরা নারী-পুরুষ সম্পর্ককে খারাপ করার চেষ্টা করেন, তাতে নারীর ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এ-অবস্থায় নারী কর্তৃক পুরুষ-নির্যাতনও বেড়েছে। নারীকে দুর্বল ধরায় নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতন পুরুষেরা হিসেবে ধরে না। নারী নির্যাতনের খবর যেগুলো প্রকাশ পায় তাতে নারীর যে দায়িত্ব থাকে তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং নির্যাতিত নারীকে রক্ষা করায় পুরুষের যে ভূমিকা থাকে, তার উল্লেখ থাকে না। এসব একদেশদর্শিতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, নির্যাতন বেড়েছে, পুরুষের দ্বারাই হোক, নারীর দ্বারাই হোক; আর নারী নির্যাতনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক (স্বামীর ভরণপোষণ করতে না পারা) এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কামঘটিত (ব্যর্থপ্রেমিক কর্তৃক প্রেম-প্রত্যাখ্যানকারী তরুণীকে এসিড নিক্ষেপ করে তার মুখমণ্ডল ঝলসে দেয়া, কখনো তাকে বাগে পেয়ে ধর্ষণ কিংবা হত্যা করা)। অর্থনৈতিক কারণ নারী-পুরুষ সকলের দুরবস্থার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। পুরুষ এবং নারী উভয়েই অর্জনের দিক থেকে স্বাবলম্বী হলে যৌতুকঘটিত অত্যাচার ও হত্যা বন্ধ হবে। নারী এতকাল বাংলাদেশের সামন্তসমাজে ছিল গৃহবন্দি ও অবগুণ্ঠনাবৃত। সে ঘোমটা খুলে ঘরের বাইরে আসতে সবে শুরু করেছে। একজন ইউরোপীয় ও আমেরিকান আমাদের দেশে এলে রাস্তাঘাটে কেবল পুরুষ দেখে থ হয়ে যায়। এদেশের পুরুষ রাস্তা ঘাটে নারী দেখে অভ্যস্ত ছিল না, সম্প্রতি হতে শুরু করেছে। দেখে দেখে তার চোখ সয়ে গেলে কামজ অপরাধ কমবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্র নারী-পুরুষ সম্পর্ককে যথেষ্ট সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলে—এটা আর অনুমানের স্তরে না থেকে অনেকটা পরীক্ষিত সত্যের স্তরে পৌঁছে যাওয়ায় এ নিয়ে সন্দেহ কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের প্রকাশ অজ্ঞতারই নামান্তর। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং চীন বিপ্লবের (১৯৪৯) পরে গণচীনে প্রথা-

পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে নারীর অধঃস্তন অবস্থা রাতারাতি যায় বদলে। নারী ওই দুই রাষ্ট্রে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুধু নারী পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ পরিচয়ে পরিচিতি পায়। এর পর অন্য যেসব দেশে সমাজতন্ত্র অনুসরণের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেসব দেশেও নারীর মানুষ পরিচয়ে পরিচিত হবার লক্ষণ সূচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন এবং আরো কয়েকটি দেশ থেকে সমাজতন্ত্রের পথে চলা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থগিত হয়ে পুঁজিবাদের পথে এগিয়ে যাওয়া স্থির হয়ে গেলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক পুনরায় অসম বা বিষম হয়ে যায়। পুঁজিবাদী সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ে পুঁজিমালিকের মজুরিদাসে ফের প্রত্যাগত হলে দাস-সমাজের নিয়মানুযায়ী তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সুযোগমতো একে অপরকে বেকায়দায় ফেলে আর্থিক ফায়দা তোলার বাতাবরণের উদ্ভব ঘটে। দৈহিক কারণে এই পরিস্থিতিতে পুরুষ অপেক্ষা নারী ঢের বেশি বেকায়দায় পড়বে এটাই স্বাভাবিক। বাজার অর্থনীতিতে শ্রম একটি পণ্য বা মূলপণ্য। বেকায়দা অবস্থায় থাকায় নারীর শ্রম স্বভাবতই পুরুষের শ্রম অপেক্ষা কম অর্থমূল্য পায়। দ্বিতীয়ত, একই কারণে তাকে খাটতে হয় অনেক বেশি সময়। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির সমাজে শ্রমিককে বেঁচে থাকতে হয় তার শ্রম বিক্রি করে, যেহেতু শ্রম ছাড়া বিক্রি করার তার কিছু থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রম বিক্রি করতে না পারা বা বেকার থাকার অর্থ হল না খেয়ে থাকা। এ সমাজে কেউ কারো না। না খেয়ে একজন মরে গেলেও পাশের লোকও তাকে দেখে না—পারে না (আর্থিকভাবে) বলে। বাজার অর্থনীতিতে যে শ্রমিক কাজ পায়, নিয়ম অনুযায়ী তাকে ততটুকু মজুরি মাত্র দেয়া হয় যতটুকু তার নিজের বেঁচে থাকার জন্য নিয়োগকারীর বিবেচনায় মাত্র টায় টায়; তার বেশি দেয়া হয় না। কাজেই পাশের অভুক্তকে দেখার সাধ্য তার থাকে না, ইচ্ছা হলেও। নারী বেকার থাকলে বা বেকার হয়ে পড়লে তার অবস্থা ভিন্ন হতে পারে না। তার যদি অপরিণত বয়স্ক সন্তান থাকে তাহলে তার হয় আরো বিপদ। নিজের পেটে ও সন্তানের পেটে দানাপানি দিতে সে যে-কোনো জীবের মতোই কাজ করে। এভাবেই এ সমাজে দেহপসারিনীর আবির্ভাব ঘটে। দেহ বিক্রি করে যারা জীবিকা চালায়, আগের দিনে তাদের বলা হত বেশ্যা, ধার্মিকরা বলতেন পতিতা। বাজার অর্থনীতির স্বার্থে পুঁজিবাদীরা এই নিরুপায় নারীর বর্তমানে নামকরণ করেছে 'যৌনকর্মী'। যেন এটাও অন্যান্য পেশার মতোই একটি স্বাভাবিক পেশা। পুঁজিবাদী সমাজে সব শ্রমিকের সব সময় কাজ থাকে না। বেকারত্ব এ সমাজের বলা যায় কুলচিহ্ন। বেকারত্ব অর্থ না খেয়ে থাকা হওয়ায় বাজার অর্থনীতির সমাজে কাজ না পেয়ে সাধারণত পুরুষ যায় মারাত্মক সব ফৌজদারি অপরাধের দিকে এবং নারী দেহব্যবসায়ের দিকে। নারী-পুরুষ সম্পর্কও এই পরিস্থিতিতে হয়ে যায় যান্ত্রিক এবং শোষণমূলক। পরিস্থিতির শিকার বানিয়ে নারী কখনো পুরুষকে এবং নারী দুর্বল হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে শোষণ করে। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র ধর্ষণ এত বেড়েছে যে, শাসকরা এবং সমাজের শক্তিমান গোষ্ঠী এই মারাত্মক অপরাধটিকে আর অপরাধ বলে পাত্তা দিতে চাচ্ছে না—এমনকি সেসব দেশেও যেখানে দেশের প্রধান শাসক হিসেবে অবস্থান করছেন নারী। শ্রম ক্রয়-

বিক্রয়যোগ্য পণ্য বলেই এমনটি হয়। রাশিয়া, গণচীন ও আরো কয়েকটি দেশে যখন মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হত তখন নারী-পুরুষ সম্পর্ক মানবিক থাকায় অর্থাৎ উভয় লিঙ্গের সম-অধিকার মেনে চলায় ধর্ষণের মতো ঘটনা ছিল বিরল। সমাজতান্ত্রিক দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এমন খবর কখনো শোনা যায়নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তিম অবস্থায়, দীর্ঘকাল সুবিধাবাদীদের দ্বারা সমাজশাসিত হয়ে আসায়, মানুষ সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে সরে গেছে বহু দূর, তখন পশ্চিম জার্মানির একজন মহিলা সাংবাদিক মস্কো গিয়ে দেখতে পান, ওই শহরে রাত দুপুরে নারীরা নির্ভয়ে কোনো সঙ্গী ছাড়াই চলাফেরা করছে—যা তার নিজ শহর বন-এ কল্পনা করাও ছিল কঠিন। আজ সেই মস্কো হয়ে গেছে নারীর জন্য বন কিংবা নিউইয়র্কের মতোই ভয়ঙ্কর একটি জায়গা। রাশিয়ার একটি জায়গাও আর নারীর জন্য নেই নিরাপদ। আজ সমগ্র বিশ্বে নারী মর্যাদা সহকারে এবং পূর্ণ স্বাধীনতায় বাস করে কেবল উত্তর কোরিয়ায় আর কিউবায়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেকার এই যে পার্থক্য এ শুধু রাষ্ট্রব্যবস্থার পার্থক্যের কারণে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নর-নারী সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা পরীক্ষিত সত্য হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাইলেই পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে পাওয়া তো আরো দুরূহ, যেহেতু যে শ্রমিকশ্রেণী এ রাষ্ট্র ও সমাজ আকাঙ্ক্ষা করে, বর্তমান সময়ে তার আর কোথাও অস্তিত্ব নেই। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা হল শ্রম-শোষণভিত্তিক। শ্রমিককে বুঝতে হবে যে, তার উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে নিহিত উদ্বৃত্ত মূল্য কেউ একজন লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এ বোধ তার মধ্যে দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে সূচিত হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর শাসন লোপ পেয়ে পুঁজিপতিদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর বৃহদংশের শ্রমশোষণ সম্বন্ধে ধারণা না থাকাই তাদের ক্ষমতা পেয়েও রাখতে না পারার কারণ। শ্রমের ফসল আত্মসাত সম্বন্ধে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত ধারণা পাওয়া যায় মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিনের লেখা আত্মগত করতে পারলে, অন্য কোনো উপায়ে নয়। শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান খুব নিচু হওয়ায় দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয়ে নির্মিত মার্কস-এঙ্গেলসের তত্ত্ব ও লেনিনের উপস্থিত বাস্তবতায় তার প্রয়োগ-কৌশল রপ্তকরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনে একদা যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং নেতৃত্বগুণে দুই দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমিকরাজ, তাঁদের মধ্যে একমাত্র জোসেফ স্তালিন ছাড়া একজনও শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন না। মানবপ্রেমিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে কমিউনিজমে দীক্ষা নেয়া মহৎহৃদয় ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব দিয়ে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রমিক শ্রেণীকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধারণা অব্যাহতভাবে পেয়ে যাবার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করে যাবার আগেই শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠাতাদের মৃত্যু হয়ে গেলে

প্রশাসন ও উপরকাঠামোর সর্বস্তরে টিকে-থাকা শিক্ষিত ও ধুরন্ধর কমিউনিজম বিরোধীরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের মতবাদ প্রচার বন্ধ করে দেয় এবং তাদের পুঁজিবাদী শ্রম-শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনরুদ্ধারকল্পে মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিন যা বলেননি সেইসব কথা তাঁদের বলে চালিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত করতে থাকে। মার্কসীয় তত্ত্বকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনকে বলে সংশোধনবাদ। মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর থেকে সংশোধনবাদী তৎপরতা জোরেসোরে শুরু হয়ে যায়। এদের বৌদ্ধিক নেতৃত্বে থাকেন বার্নস্টাইন, কাউতস্কি ও তাঁদের অনুসারীরা। লেনিন এই অপতৎপরতাকে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে যান। লেনিন-রচনাবলির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সংশোধনবাদ মোকাবেলা। শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, মার্কসবাদে দীক্ষিত ও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের মতবাদ ঠিকভাবে বুঝে নেয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অনুশীলন ছাড়া কার্যকররূপে সম্ভব নয়। একজন শোষিত মানুষের শোষণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তা কখনোই শোষণ বিষয়ে বই-পড়া একজন বুদ্ধিজীবীর মতো নয়; যেহেতু প্রথম ব্যক্তির জ্ঞান তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং শেষোক্ত ব্যক্তির কেবল অনুভবসঞ্জাত ও অনুমাননির্ভর। অতএব দ্বিতীয়ের চেয়ে প্রথম ব্যক্তি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামে হবেন আদর্শ নেতা, যদি তিনি মার্কসবাদ ঠিকভাবে রপ্ত করতে পারেন। স্তালিন এ ক্ষেত্রে একমাত্র দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব স্তালিনের মতো প্রলেতারিয়েত পৃষ্ঠপটের স্বশিক্ষিত দার্শনিক বা চিন্তকের কাছ থেকেই আসবে। অনুন্নত অর্থনীতির অন্তর্গত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মাও সেতুঙ প্রণীত ও তাঁর নিজের সংগ্রাম দ্বারা মাঠে পরীক্ষিত ও নির্ভুল প্রমাণিত রণনীতি ও রণকৌশল, বিশেষত তাঁর মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রাঞ্জলিকরণ মাঠ পর্যায়ের সংগ্রামের জন্য হল একটি মোক্ষম অস্ত্র। এজন্য মাও সেতুঙ পাঠও সংগ্রামীদের জন্য একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, মাও সেতুঙের রচনা পাঠ বর্তমান সময়ে শ্রমিকশ্রেণী দূরে থাক, ভাবুক-চিন্তকদের মধ্যে যারা বিপ্লবে আস্থাবান, তাদের মধ্যেও বিশেষ দেখা যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার পরে এবং গণচীনে বাজার অর্থনীতির দ্বারা 'প্রবৃদ্ধি' অর্জন নীতি হিসেবে গৃহীত হলে, সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ শ্রমিক শ্রেণীসহ সকল মহলেই কমে গেছে। বিপ্লবী চিন্তাবিদ বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন, তাঁরাও মানুষের সার্বিক কল্যাণে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে মুখ খোলা থেকে বিরত থাকছেন, চারদিকে আজ ব্যাপক নারী ধর্ষণ, খুন-জখম ও ছিনতাই-ডাকাতির ধুম পড়ে যাওয়া দেখেও। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কল্যাণের যে সম্পর্ক নেই এটা প্রমাণিত সত্য হলেও সকলেই এখন প্রবৃদ্ধির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। সমাজতন্ত্র ছেড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি ধরার পর চীনের প্রবৃদ্ধি ও বিদেশী মুদ্রা জমা পড়ার গতি যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে বেড়েছে বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা, কৃষক ও শ্রমিক সমাজের দারিদ্র্য ও দুর্গতি। কমেছে মানুষের গড় আয়—বেড়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। প্রবৃদ্ধি ও বিদেশী মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধির দ্বারা লাভবান হয়েছে সে দেশের ক্ষমতাধর নব্য পুঁজিপতি

শ্রেণী। পুঁজিপতি শ্রেণী জনসংখ্যার এক শতাংশের মধ্যেও পড়ে না নর-নারীর সুষম সম্পর্ক ও কল্যাণ নিহিত তারা যা উৎপাদন করে তার ভোগে। তাদের উৎপাদিত সামগ্রী তারা যদি ভোগ না করতে পারে তাহলে 'প্রবৃদ্ধি'র কথা শুনে তাদের দুঃখ বাড়বে বই তো কমবে না। আমি যা তৈরি বা উৎপাদন করব, আমি তা ভোগ করব—রাষ্ট্র যদি তা নিশ্চিত না করতে পারে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থা রেখে কি লাভ?

এখানেই আসে বিপ্লবী ভাবুকদের ভূমিকা। শিক্ষাদীক্ষাহীন শ্রমিক শ্রেণীকে তার শ্রমশোষণ দ্বারা কতিপয় দুর্বৃত্তের বিপুল লাভবান হবার বিষয়টি এঁরাই পারেন তাদের কাছে তুলে ধরতে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে মার্কসবাদী বিপ্লবী তৈরি করতে। বিপ্লবী মতবাদ রপ্ত করা শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী ভাবুকদের ছাড়া কেউ গড়ে তুলতে পারে না। স্তালিনের মতো স্বশিক্ষিত শ্রমিক নেতা সুষ্ঠু রাজনৈতিক বাতাবরণ ছাড়া আপনা আপনি গজিয়ে ওঠা অসম্ভব। বিপ্লবী ভাবুকরাই পারেন প্রকৃত সংগ্রামী শ্রমিক নেতৃত্ব গড়ে দিতে। তাঁদের এই ভূমিকাকে কিছুতেই খাটো করে দেখা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে দেখলে, বিপ্লবী ভাবুকদের এর বেশি অগ্রসর না হওয়াই ভাল। তাদের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নির্ভরতা থাকলে ক্ষমতা পেয়েও তাঁরা ব্যর্থ হবেন। তিনিই ভালো শিক্ষক যিনি তাঁর ছাত্রকে জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা শেষ করে দিতে পারেন। বিপ্লবী ভাবুকদের ভালো শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া হবে ঠিক, ছাত্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন তাঁর জন্য ঠিক হবে না। প্রকৃত প্রলেতারিয়েত দ্বারাই প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া দরকার।

বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান দুরবস্থার হেতু কী? হেতু হল ঘুষ। দরিদ্র দেশে ঘুষ গেলে অধিপতি শ্রেণী। প্রতিটি কাজে তাদের ঘুষ দিতে হয়, বাংলাদেশের মানুষকে তা বলার অর্থ হয় না। পৃথিবীতে বর্তমানে মোট ১৮১টি রাষ্ট্র আছে। এর মধ্যে দুটি মাত্র রাষ্ট্র বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধীন নয় : উত্তর কোরিয়া ও কিউবা। অপর সকল দেশ বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে। বাজার অর্থনীতির ধর্ম হল প্রবল কর্তৃক, দুর্বলকে শোষণ। পৃথিবীতে বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রবল দেশ আছে সাতটি। এরা একটি সঙ্ঘ তৈরি করে নিয়েছে যার নামকরণ তারা করেছে জি-সেভেন। এই সাতটি দেশ পৃথিবীর অপর প্রায় সকল দেশকে শোষণ করে চলছে। দেশ সাতটি শোষণ করছে বললে ভুল হয়, শোষণ করছে এই সাতটি দেশের সিন্ডিকেট বা পুঁজিপতি গোষ্ঠী। পৃথিবীতে যত পণ্য উৎপাদিত হয় তার ছিয়াশি শতাংশ এই সাতটি দেশের অধিকাংশ মানুষ ভোগ করে। এই সাতটি দেশের শিশু পৃথিবীর অপর সকল দেশের শিশুর পঞ্চান্ন গুণ বেশি খাদ্য পায়। বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ছাড়া সকলেই শ্রমিক, শ্রম বিক্রি ছাড়া বেঁচে থাকার তার অন্য কোনো উপায় নেই, যত বেশি বেতনের চাকুরেই সে হোক। চাকরি গেলে তার দুরবস্থার সীমা থাকে না। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিপতিরা, তাদের শ্রমিকশ্রেণী যাতে বিদ্রোহী হয়ে না উঠতে পারে তার জন্য, তাদের সব সময় কাজ দিয়ে রাখার চেষ্টা করে। পূর্ণ কর্মসংস্থান দেশের মধ্যে না করতে পারলে তাদের তারা দরিদ্র দেশগুলোতে পাঠায় 'বিশেষজ্ঞে'র কাজ দিয়ে। এই সাতটি দেশ

পৃথিবীর অপর প্রায় সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে তাদের লগ্নি প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাংক ও তার সকল অঙ্গ লগ্নিসংস্থাগুলোকে দিয়ে। বর্তমানে তারা সমৃদ্ধ আছে সুদের টাকা ও ভাড়ার টাকা গুণে। তাদের বিবেচনায় সুদ ও ভাড়া খেয়ে উচ্চ জীবনযাপনের মতো সুখ আর কিছুতেই নেই। এ জন্য জি-সেভেনের নিরন্তর চেষ্টা এ ব্যবস্থা যাতে টিকে থাকে। এর জন্য তারা জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাহায্যে, কিংবা তাদের বিভিন্ন সামরিক জোটের মাধ্যমে এবং কখনো এককভাবে তাদের অবাধ্যদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। তাদের শোষণের এ সকল কাজে তারা সহায়তা পায় তাদের শ্রমিকশ্রেণীর, যাদের তারা হাতে রাখে এই কথা বলে যে, দরিদ্র দেশগুলোকে শোষণ করে জি-সেভেনের পুঁজিপতিরা যে বিপুল মুনাফা লোটে, তার একটা অংশ তারা তাদের শ্রমিক শ্রেণীকে উচ্চ মজুরি আকারে ঘুষ দিয়ে তাদের বশে রাখে। এ জন্য এসব দেশে শ্রমিক আন্দোলন নেই। কেউ বেকার হয়ে পড়লে স্যুপ কিচেন থেকে তাদের খাওয়ানো হয় এবং যথাসম্ভব শীঘ্র একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। জি-সেভেনের দেশগুলোতে ঘুষ হল নিম্নগামী, অধিপতিরা বেশি মজুরি দিয়ে অধঃস্তনদের ঘুষ দেয়। বেশি মজুরির ঘুষ দিয়ে তাদের দ্বারা ক্ষমতা দখল রাখে ঠেকিয়ে। শ্রমিক শ্রেণীকে চরিত্রহীন করেই জি-সেভেনের পুঁজিপতিরা বিশ্বময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জি-সেভেনের শ্রমিকশ্রেণীর অধঃপতনের মাশুল দিচ্ছে দরিদ্র দেশের শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করে। বাংলাদেশের একজন শ্রমিক, উদাহরণ স্বরূপ, বারো থেকে ষোল ঘণ্টা খেটে জি-সেভেনের একজন শ্রমিকের মজুরির একশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এই পার্থক্য কেবল শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নয়, নর-নারী সম্পর্কের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। জি-সেভেনের দেশগুলোতে শ্রমিকসমাজ উচ্চ বেতন পাওয়ায় সেখানে ভোগবাদী একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, যার মধ্যে যৌন স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠেছে মুখ্য। নর-নারীর প্রীতিময় সম্পর্কের পরিবর্তে ওই দেশগুলোতে যা দেখা যায় তা হল দৈহিক ভোগের সম্পর্ক, যার নিয়ামক হল অর্থ ও ক্ষমতা। নর-নারীর সম্পর্ক ওই দেশগুলোতে ততক্ষণ স্বাভাবিক থাকে যতক্ষণ তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন উভয়ের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত থাকে। একজন যদি মনে করে লেনদেনের ব্যাপারে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনী তার সঙ্গে ঠিক আচরণ করছে না, সম্পর্ক তৎক্ষণাৎ তিক্ত হয়ে যায় এবং সম্পর্ক যায় চুকে। বিয়েতে তালাকের ঝামেলা পোহাতে হয় বিস্তর। সম্পর্ক টুটে গেলেও তালাক না হওয়া পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি আইনত সিদ্ধ নয় বলে উভয় পক্ষকেই আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যা একই সঙ্গে ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ ও বিরক্তিকর। এজন্য জি-সেভেনের দেশগুলোতে বিয়ের পাট কমে যাচ্ছে এবং বিয়ের জায়গায় নতুন জীবনধারা হিসেবে দেখা দিয়েছে নর-নারীর একত্রবাস। এ সম্পর্ক অনেক সময় টিকে যায় এবং বিয়ে না করা যুগল, সন্তানাদির জন্ম দিয়ে, স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপন করে। ইচ্ছা হলে তারা তখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের মিলনকে রীতিসম্মত করে নেয়। একত্র বাসের সময় মতের গরমিল দেখা দিলে তারা কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অমিত-লাবণ্যের মতো 'হে বন্ধু বিদায়' বলে অথবা না-বলে। এতে কেউ কিছু মনে করে না। এক পক্ষ মনে করলেও অন্য পক্ষের কিছু করার থাকে না। এ ধরনের ছাড়াছাড়ির ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী তার পুরুষ সঙ্গীর চেয়ে অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়—তার থাকা এবং খাওয়া উভয় সমস্যাই হঠাৎ করে দেখা দেয়। তার আর একজন সঙ্গী জুটিয়ে নেয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কঠিন হয়।

দরিদ্র দেশগুলোতে শোষণের কারণে মানুষের আয় কম। কেবল পুরুষের পক্ষে তার আয় দিয়ে সংসার চালানো ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। দরিদ্র বাংলাদেশে অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের প্রভাব বেশি থাকায় নারীর বাইরে কাজ করে উপার্জনকে ভালো দৃষ্টিতে দেখা হয় না। মেয়ে সংসারের বোঝা বলে বিবেচিত হওয়ায় পিতার চিন্তা হল যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে দিয়ে তাকে ভরণ-পোষণের আওতা থেকে বের করে দেয়া। আন্তর্জাতিক কনভেনশনের চাপে অধিকাংশ দরিদ্র দেশে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হলেও নাবালিকার বিয়ে এ সকল দেশে একটি সাধারণ ঘটনা। সংসার পাতা বেশ খরচের ব্যাপার হয়ে ওঠায় বিয়ের সময় ছেলেরা যৌতুক হিসেবে মোটা টাকা দাবি করে বসে, যাতে ওই টাকা লগ্নি করে সে তার স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে পারে। যৌতুক কবুল করে বিয়ে হয়ে যাবার পর যৌতুকের সব টাকা একসঙ্গে না পেলে স্বামী ও তার পরিবারের সকলে নব-পরিণীতার ওপর বাকি যৌতুক উসুলের জন্য চাপ দিতে থাকে। বৌকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয় টাকা নিয়ে ফিরতে। টাকা না নিয়ে ফিরলে তাকে পিটিয়ে অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা পর্যন্ত হয়। অনেক সময় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নববধূ বিষপানে অথবা গলায় ফাঁস নিয়ে নিজেই তার বিড়ম্বিত জীবনের ইতি টানে। যৌতুকের কারণে বিয়ে ঠেকে যাওয়ায় মেয়েরা প্রলোভনে পড়ে কোনো প্রতারকের হাত ধরে পালিয়ে যায়। এদের শেষ গন্তব্য হয় দেশের—দেশের চেয়ে বিদেশের—কোনো বেশ্যালয়ে।

জমি হারিয়ে গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে আসা কৃষক পরিবারের নারীদের দুরবস্থার সীমা থাকে না। তারা শহরের বাসায় ঠিকে ঝির কাজ নিলে সেখানে মারধোর এবং অনেক সময় যৌন হয়রানির শিকার হয়। বস্তিগুলোর দখলদার শহরে চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও বড় সব ফৌজদারি মামলার আসামি হওয়ায় তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বস্তির কিশোরী ও যুবতীদের পক্ষে হয়ে পড়ে অসম্ভব। বিয়ে না হলে আমাদের সমাজে নর-নারীর একত্রবাস সমাজস্বীকৃত নয়। তাই বস্তিতে বিয়ে আছে, তবে প্রায়ই অনিবন্ধনকৃত। ফলে, এখানে ঘর বাঁধা ও ভাঙা মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। এসব বিয়ে পাশ্চাত্যের লিভিং টুগেদারের সমতুল্য। এসব বিয়ের ছাড়াছাড়িতেও, পাশ্চাত্যের নারীর মতোই, এ দেশের বস্তির নারী হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে। তবে দরিদ্র দেশের মধ্যে ভারতের নারী অনেকটা বেশি কঠিন জীবন যাপন করে। দক্ষিণ ভারতের দরিদ্ররা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মেয়ে-শিশু মেরে ফেলে। অধুনা সোনোগ্রাফির সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ জানা সম্ভব হওয়ায় ভারতে অনেক ডাক্তার ও প্রাইভেট হাসপাতাল নিরাপদে মেয়ে-ভ্রূণের গর্ভপাত করে দেয়ার বিজ্ঞাপন দেয়। ভারতে বিধবা বিবাহ ও তালাক

বর্তমানে আইনসিদ্ধ হলেও সমাজের বিরাট অংশ তা গ্রহণ না করায় নারীদের অন্য পথে তাদের দেহশান্তির ব্যবস্থা করতে হয়। এ ব্যাপারে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই বলে ভারতের সমাজবিদদের ধারণা। এসব ছাড়াও বাজার অর্থনীতির সমাজে, কী পাশ্চাত্যে কী প্রাচ্যে, কী ধনী কী দরিদ্র সকল শ্রেণীর নারীকে পুরুষ দ্বারা দুভাবে নির্যাতিত হতে হয়। এক ধর্ষণ, দুই নপুংসকতা। জীবনযাপনের উপায় অনিশ্চিত থাকাই এর মূল কারণ। পুরুষ ও মহিলা 'নারীবাদীরা' বিষয়টি বুঝতে না পেরে কিংবা অন্য কোনো মতলবে এর জন্য এককভাবে কেবল পুরুষকে দায়ী করে। নারীর পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য দরকার পুরুষের নিশ্চিত ও অবিঘ্নিত মনোযোগ। একটি ঘরে অনেক সদস্যের শোবার দরুন দরিদ্র পুরুষ তার নারীকে এই মনোযোগ দিতে না পারায় নারী থাকে দিনের পর দিন রাতের পর রাত অতৃপ্ত। এ রকম হলে, মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, নারীর হিস্টিরিয়া বা স্নায়ুবিকার দেখা দিতে পারে। এ রোগ হলে তাকে ভূতে ধরেছে বলে গ্রামদেশে মনে করা হয় এবং ওঝা ডেকে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তার ওপর থেকে ভূতের প্রভাব হটিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। এতে রোগিনীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তখন জিন বা ভূতের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে রটানো হয়। বাংলাদেশে প্রেম নিষিদ্ধ। কোনো যুগল সে পথে পা বাড়ালে অধুনা পড়তে হয় ধর্মব্যবসায়ীদের শাস্তির কবলে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে নারী-পুরুষ সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রেম-ভালোবাসা, অনুরাগ-আকর্ষণ, বিচ্ছেদ ও বিরহকাতরতা অথবা এসবের বিপরীতে ঘৃণা ও বীতরাগ, বিদ্বেষ ও বিকর্ষণ এবং ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং এসবের পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণ ক্রিয়াশীল থাকে, তার নিয়ামক হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের নিয়মকানুন তাকে মেনে চলতে হয়। একটি সমাজ গড়ে ওঠে তার অন্তর্গত মানুষের উৎপাদন কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। উৎপাদন মানুষে মানুষে একটি সম্পর্কের সৃষ্টি করে। এই সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টন অধিকাংশ মানুষের মেনে নেয়ার ভিত্তিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের গরিষ্ঠ মানুষ বণ্টনের ন্যায্যতা স্বীকার করে চলে, বা ন্যায্যতার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে বিরত থাকে, বা ন্যায্যতার বিষয়টি মেনে চলতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক শ্রেণীও উৎপাদনের বেশি অংশটি আত্মসাৎকারী গোষ্ঠীটির দ্বারা স্থিরীকৃত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক টিকে থাকে। উৎপাদিত সামগ্রীর বণ্টনের উপস্থিত ন্যায্যতা সম্বন্ধে গরিষ্ঠ মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠা শুরু হলে এবং মানুষ বিদ্যমান বণ্টন পদ্ধতি (বলপ্রয়োগ ছাড়া হয় না বলে বলপ্রয়োগ দ্বারা) বদলে ফেললে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং নরের সঙ্গে নারীর সম্পর্কও যায় বদলে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ-দুর্নীতিবাজ, নির্যাতনকারী-নির্যাতিত, সংযমী-লম্পট, সাধ্বী-বহুগামিনী, স্বার্থপর-পরার্থপর ইত্যাকার যত প্রকারের জোড় মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, তার সবই বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার

কারণে। সমাজ সংগঠনের সর্বোচ্চ ধাপটি হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নাগরিকের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী একটি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সত্তা। এর প্রণীত বিধান সকল নাগরিকের মেনে চলা বাধ্যতামূলক। অতএব রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি যেমনটি হয়, রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল মানুষের সম্পর্কটিও হয় তদনুরূপ। নর-নারী সম্পর্ক অসম, বিষম, বা অন্যায্য বলে যদি কারো মনে হয়, তার জন্য পুরুষ অথবা নারী কাউকে এককভাবে দোষী করা ঠিক নয়। দোষী বলে যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয়, করতে হবে বিদ্যমান সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মতো বাংলাদেশের নারীরা পুরুষ দ্বারা নির্যাতিত বলে অনেকের ধারণা। এদের বিশ্বাস, পুরুষ নারীকে তাদের অধীন ও খেলার পুতুল করে রেখেছে; পুরুষকে শায়েস্তা করতে পারলেই নারীর অবস্থার উন্নতি হবে। এ কথা ঠিক যে, বাংলাদেশের নারী পুরুষের অধীন এবং পান থেকে চুন খসলে, বিশেষত যৌন নৈতিকতার ব্যাপারে, সব দোষ গিয়ে পড়ে নারীর ঘাড়ে। কিন্তু এ দেখাটা হল অবস্থার কেবল বহিরঙ্গ দেখা। ঘটনা যদি তাই হত তাহলে বাংলাদেশের নারী সকল গুরুত্বপূর্ণ পদসহ সরকারপ্রধানের পদটি কখনোই পেত না। নারীর সর্বোচ্চ পদ পাওয়াও যে পুরুষ কর্তৃক নারীর সর্বোচ্চ অমর্যাদা ধর্ষণ বন্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর বেড়ে চলা এবং শাসকদলের পান্ডাবাহিনী কর্তৃক তাকে বিদ্যার সর্বোচ্চ পিঠ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ধাওয়া ঠেকাতে পারে না, উল্টো তাকে তা ধামাচাপা দিতে অথবা হজম করে নিতে অথবা চাপে পড়ে একটি দায়সারা ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বাধ্য হতে হয়, তার জন্য তাঁকে দায়ী করা চলে না। তিনি যেহেতু বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থাটি ধরে রাখতে তাঁর শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থে শপথ দ্বারা অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এই ব্যবস্থাটির মধ্যে বিরাজমান নারীর অধঃস্তনতা এবং ওই অধঃস্তনতা ধরে রাখার মধ্যে তাঁর শ্রেণীর স্বার্থ নিহিত, অতএব নারী হয়েও তাঁকে নারীবিরোধী হয়ে চলতে হয়। ইচ্ছা থাকলেও নারীর কল্যাণ সাধন তাঁর দ্বারা সম্ভব হয় না। এই বিষয়টি বুঝলে দেশের বর্তমান নারী-পুরুষ সম্পর্কের স্বরূপ বোঝা সহজ হয়।

নারী-পুরুষ সম্পর্ককে সমতাভিত্তিক করতে হলে রাষ্ট্রব্যবস্থাটিকে নতুন রূপ দেওয়া অপরিহার্য। অন্য কোনো উপায়ে অবস্থার ফলপ্রসূ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে নারী-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : মীথ এবং বাস্তবতা

সুলতানা মোসতাফা খানম

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের ধারায় 'নারীর উন্নয়ন' বা 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ' এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। উন্নত বিশ্বে যখন পরিকল্পনা স্তরটি অতিক্রমণের পর 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ'; দ্বারা 'নারীর উন্নয়ন' নিশ্চিত হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তখনও এই দুই স্তরের ধারাবাহিকতার অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। এমনকি 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' যে বিশ্বস্বীকৃত অ্যাপ্রোচ রয়েছে, তার যথাযথ প্রয়োগও এখানে ঘটছে না। এই আচ্ছন্নতা বা ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্নতার মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে দুটি বিষয় : (১) নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে অবলোকনের দৃষ্টিভঙ্গি, (২) নারীকে মূলধন করে মুনাফা অর্জনের প্রবণতা। এই মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই একটি বড় ভূমিকা পালন করে। যেহেতু আজ বিশ্ববিবেক তৎপর হয়ে উঠেছে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে বা নারীর উন্নয়নে, দাতা গোষ্ঠী প্রদত্ত আর্থিক অনুদান বা আর্থিক সহায়তার একটি বড় অংশ তাই নির্ধারিত থাকে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে। এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দ্বারা যে প্রকল্পগুলো বাংলাদেশে পরিচালিত হয়, সেখানে শর্ত জুড়ে দেয়া হয় নারীর সংশ্লিষ্টতার। 'কাজেই বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির' শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতা থাকে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের। এসব ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠীর লক্ষ্য থাকে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বা তাদেরকে আয় সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে স্বাবলম্বী করে তোলা। এই প্রকল্পগুলোতে নারীদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি এই উন্নয়নকে টেকসই করে রাখার প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। একইভাবে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য থাকে অধিক মাত্রায় আর্থিক সহায়তা লাভ। দাতাগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করার জন্য সে বেছে নেয় 'নারী উন্নয়ন' বা 'নারীর ক্ষমতায়ন' নামক বিষয়টি।

এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে দাতাগোষ্ঠী প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। এর ফলে দুটি বিষয় দৃশ্যত আমাদের গোচরে আসে—(১) উন্নয়নের নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিংবা নারীদের সঠিকতর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ঘটছে কি-না; অন্যদিকে (২) নারীর ক্ষমতায়ন কতটা অগ্রসর হয়েছে। এই দুটি বিষয়ের সহজ সমীকরণ করলে দাঁড়ায়, এই প্রকল্পগুলো নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সমীকরণ আসলে একটি মীথ। বাস্তবে দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে এইসব প্রকল্পে কর্মরত বা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীরা যেন Below Subsistence Level Poverty Trap বা দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন এই চক্রের বাইরে আসতে পেরেছে, তারা কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির দক্ষতা অর্জন ব্যতীত আর কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। ঘটেনি তাদের কোনো উত্তরণ বা উন্নয়ন। বর্তমান নিবন্ধে নারীদের এই উন্নয়নবিমুখ চক্রে আবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে 'নারীর উন্নয়ন' ও 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ'—এই দুই ধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের কিছু পদক্ষেপ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীদের উপলব্ধি, অবলোকন ও অভিমতও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণা এলাকা

বর্তমান নিবন্ধটি মূলত মূল্যায়নধর্মী ও বিশ্লেষণাত্মক। এ কারণে এতে নারী আন্দোলন, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপূরক রূপে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্যের উৎসসমূহ হচ্ছে CARE, Bangladesh-এর একটি প্রকল্প Rural Maintenance Programme (RMP)-এ কর্মরত মহিলারা, Bangladesh Water Development Board-এর অনুপ্রকল্প Water Sector Scheme-এ কর্মরত মহিলারা এবং European Commission (EC)-এর অর্থায়নপুষ্ট একটি এনজিও, Institute of Integrated Rural Development (IIRD)-এর দুটি সংস্থার আওতাভুক্ত মহিলা সদস্যরা।

প্রথম পর্যায়ের তথ্য সংগৃহীত হয় ১৯৯৮ সনের জুন-আগস্টে। CARE-এর ৩টি বিভাগের ৭টি ইউনিয়নে পরিচালিত এই প্রকল্পগুলির অবস্থান হচ্ছে কিশোরগঞ্জের সাচাইল, গাইবান্ধার বাদিয়াখালি, নাটোরের চৌগ্রাম, মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর, শেরপুরের শ্রীবর্দী, বরগুনার পাথরঘাটা, পঞ্চগড়ের ময়দান দীঘি এবং চট্টগ্রামের হাটহাজারী। প্রতিটি ইউনিয়ন হতে ১২ জন করে এবং মুন্সীগঞ্জ হতে ১০ জন মোট ৮২ জন RMPতে অংশগ্রহণকারী মহিলাকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগৃহীত হয় ১৯৯৯ সনের জুন-আগস্ট মাসে। এখানে ভোলা, শরণখোলা ও নওগাঁ, এই ৩টি থানার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন হচ্ছে দক্ষিণ দীঘলদি, উত্তর দীঘলদি, পূর্ব ইলিশ্যা, পশ্চিম ইলিশ্যা (ভোলা); ধান সাগর, রায়েন্দা, নীল বুনিয়া (শরণখোলা) এবং মীরাট, কসব, বলিহার, উত্তরগ্রাম, নওগাঁ সদর (নওগাঁ)। এখানে প্রতিটি ইউনিয়ন হতে ১৫ জন করে ১৮০ জন মহিলাকে বেছে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে IIRD পরিচালিত প্রকল্প ধুনট থানার অন্তর্গত ৯টি ইউনিয়ন, যথা—নিমগাছি, মধুরাপুর, এলাঙ্গী, চিকাশী, কালের পাড়া, চৌকিবাড়ী, গোপালনগর, ধুনট হতে ৩১৫ জন এবং নেত্রকোনা থানার ৭টি ইউনিয়ন যথা—রৌহা, দক্ষিণ বিশিউড়া, উত্তর বিশিউড়া, লক্ষ্মীগঞ্জ, চাতলকোনা, সিংহের বাংলা হতে ২২৫ জন মহিলাকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়। এই তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ১০-২৬ এপ্রিল ২০০২।

জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হলেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে Focus Group Discussion (FGD) কৌশলের ওপর। এছাড়া সাক্ষাৎকার এবং কিছু কেসস্টাডিও গৃহীত হয়। RRA (Rapid Rural Appraisal)-এর কিছু কৌশলও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

> 'মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর ওপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বলপ্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা' এলিজাবেথ কেডি স্ট্যান্টন : ১৮৪৮[১]

সম্ভবত মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয়, বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হয় নারীর ওপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরি করে রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভুত নয় ঃ

> "সতত আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদাই পুরুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি-বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে" (পলাঁ দ্যা লা বার)[২]

'পুরুষতন্ত্র' এবং 'লিঙ্গবৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণা'কে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণার' উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গবৈষম্যভিত্তিক শ্রম-বিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই 'লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাই' হয়তোবা সৃষ্টি করেছে 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের' আওতাধীন 'বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা'। যেভাবেই দেখা হোক, এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হলো নারীর ক্ষমতাচ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস্ এ প্রসঙ্গে (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেন : 'মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়।'

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রের উত্তরণের প্রথম ধাপটি হলো নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিষ্কৃত করে তাকে গৃহস্থালী কাজে আবদ্ধ করে ফেলা। এঙ্গেলস্ একে 'ঘরোয়া ঝি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই 'ঘরোয়া ঝি'রা ক্ষেত্রবিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালা ছিল বৈষম্যমূলক,

নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ; যে-দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে পালিত হয়। ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সমঅধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নেমে আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকার দাবির আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা—'নারীবাদ'—তার উদ্ভব ঘটে মূলত ১৭৯২ সনে ম্যারি উলস্টোন ক্রাফট রচিত গ্রন্থ 'ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্যদিয়ে। যাই হোক, এমিলির আত্মাহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগস্ট 'মার্কিন কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল' পাশ হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। এই ভোটাধিকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণেও সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গণ্ডির বাইরে যখন নারীর পদচারণা শুরু হলো, তখনই উদ্ভব ঘটলো 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ'-এর প্রত্যয়টি, যা Women in development বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে। পাঁচটি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায়, যেমন :

১. **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach) :** ১৯৫০-৬০-এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভালো 'স্ত্রী' বা ভালো 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে মা উৎকৃষ্ট নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২. **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach) :** ১৯৭৫-৮৫ সময়কালে, অর্থাৎ জাতিসংঘ ঘোষিত নারীদশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অবিবেশনে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়নের সনদ 'সিডও' (CEDAW)। CEDAW শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women', অর্থাৎ 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ'। ইতিমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. **দক্ষতাবৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency approach) :** ১৯৮০-৯০-এর দশকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলত নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach) : এটিও গত শতাব্দীর আশির দশক হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র্য দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫. ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach) : বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সারকথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা। একেই এককথায় বলা হয় ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ। এবার দেখা যাক ক্ষমতায়ন বলতে আমরা কি বুঝি।

ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে (Mondol, 1990)। এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও জন্মশাসনে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা, বিচরণের গণ্ডির প্রসারতা (Khanum, 1999 : 6-15) ইত্যাদি। এর পাশাপশি আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা অর্জনের ক্ষমতাও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগণিত হয় (Khanum, 2000 87-90)। চেন (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা (Dimension) চিহ্নিত করেছেন— সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন (Perception)। এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১. সম্পদ : সম্পদ বলতে বোঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ, সেইসব অর্জনের সুযোগ বা সে সবের মালিকানা লাভ। এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কারণ তা সম্পদ সৃষ্টির বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

২. শক্তি : শক্তি বলতে এক্ষেত্রে বোঝায় নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৩. সম্পর্ক : ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার বা প্রতিবেশী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪. আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন : এই উপলব্ধিকে দুটো প্রেক্ষাপট হতে দেখা যেতে পারে :

১. নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি;
২. নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : বাস্তব পদক্ষেপ

এখন দেখা যাক নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো কী কী। বর্তমান নিবন্ধটির প্রকৃতি ও পরিসর বিবেচনায় রেখে এখানে আমি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ বা আলোচনায় যাব না।[৩] রাষ্ট্রের সহযোগিতায় বা রাষ্ট্রসমর্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিও-র কিছু প্রকল্পের কর্মসূচির আলোকে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়নে আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। কারণ এই কর্মসূচিগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর সমান্তরাল ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে আমি তিনটি প্রকল্প—যেগুলোর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলাম, সেগুলোর কর্মসূচি 'নারী উন্নয়ন' বা 'ক্ষমতায়নে' কী ভূমিকা রাখছে, তার ব্যাখ্যায় আমার বক্তব্য সীমিত রাখবো। এই তিনটি প্রকল্প হচ্ছে CARE, Bangladesh-এর Rural Maintenance Programme (RMP), World Food Programme (WFP)-এর অর্থায়নপুষ্ট Water Sector Scheme এবং European Commission (EC) বা বর্তমানে European Union (EU)-এর অর্থায়নপুষ্ট Institute of Integrated Rural Development (IIRD) নামক এনজিও। নিম্নে নারী উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত এদের কর্মসূচি বর্ণিত হলো :

১. CARE, Bangladesh : ১৯৮২ সালে কানাডিয়ান গমের সহায়তায় CARE বাংলাদেশের গ্রামীণ রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচির মধ্যদিয়ে Rural Maintenance Programme (RMP) বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হাতে নেয়। রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের পাশাপাশি এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের মধ্যদিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা। এই লক্ষ্যের দুটো দিক লক্ষণীয় : (১) দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; (২) অবকাঠামো নির্মাণ দ্বারা উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ। এই প্রকল্পে বর্তমানে প্রায় ৩৬ হাজার দুঃস্থ মহিলা কর্মরত আছেন যারা প্রায় ৭২ হাজার কিলোমিটার রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। এই প্রকল্প পরিচালিত হয় CARE এবং LGED (Local Government and Engineering Department)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায়। বর্তমানে ৪৪৫০টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৬০০টি ইউনিয়নকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এতে মহিলাদেরকে ৪ বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ৩৬ টাকা করে মুজরি প্রদান করা হতো, যার মধ্য

হতে ৬ টাকা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে কেটে নিয়ে জমা রাখা হয়। কর্মকালের তৃতীয় বছরে এই সদস্যদেরকে আয়সৃষ্টিমূলক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চার বছর তারা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ফান্ড হতে প্রায় ১০ হাজার টাকা করে পায়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে এই টাকা তারা যেন আয়সৃষ্টিমূলক খাতে বিনিয়োগ করে পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে বসবাস করতে পারে।

২. Water Sector Scheme : এই প্রকল্পটি হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন বা Rural Development Board (RDB)-এর একটি অনুপ্রকল্প, যা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা Bangladesh Water Development Board (BWDB)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা বা WFP 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি'র মাধ্যমে এই প্রকল্পকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বন্যার কবল হতে খাদ্যশস্য রক্ষা করা এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে কর্মসংস্থানের যোগান ঘটিয়ে তাদেরকে খাদ্যক্রয়ে সক্ষম করে তাদের মধ্যে খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা। এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কর্ম নিয়োগদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০% মহিলা নিয়োগ। 'এখানে প্রশিক্ষণ বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের কর্মসূচি নেই।

৩. Institute of Integrated Rural Development : এটি European Commission-এর অর্থায়নপুষ্ট একটি বেসরকারি সংস্থা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আয়সৃষ্টিমূলক খাতে বিনিয়োগের জন্য দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, তাদের মধ্যে টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ, বনায়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণ, রেশম পালন ও বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনে সহায়তাদান, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান, আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। টার্গেটভুক্ত দুঃস্থ মহিলারা নিজ উদ্যোগে তিনবেলার খাবার নিশ্চিতকরণে সক্ষম হলে তাদেরকে সরাসরি সহায়তা দান (ঋণ, কর্মসংস্থান) বন্ধ করে নতুন দুস্থ গ্রুপকে এই সব কর্মসূচির আওতায় আনা হয়।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : বাস্তবতা

এবার দেখা যাক এই তিনটি প্রকল্পের কর্মসূচিগুলো প্রকল্পে কর্মরত বা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীদের উন্নয়ন বা ক্ষমতায়নে কত ভূমিকা রাখছে। এই আলোচনায় উত্তরদাত্রীর একই ক্যাটাগরিতে এনে উত্তর প্রদান; অভিমত বা মনোভাবের গড় উপস্থাপনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নারীদের অভিমত কখনো আলাদাভাবে, কখনো একত্রিতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রথমে দেখা যাক 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ'-এর যে অ্যাপ্রোচগুলো আছে, একুশ শতকের সূচনালগ্নে এই কর্মসূচিগুলো কোন স্তরের অ্যাপ্রোচে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আমরা যদি IIRD-এর

কর্মসূচি লক্ষ করি তবে দেখা যাবে, এখানে 'লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন' বা 'ভিন্ন পরিমণ্ডলের ধারণা' তীব্রভাবে বিরাজমান। একমাত্র তুঁত গাছে-এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত নারীদের সকল কর্মকাণ্ড গৃহস্থালীর, অর্থাৎ চিরায়ত গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ। অন্যদিকে পুরুষদের জন্য গৃহীত কর্মসূচি তাদের জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (যেমন পুকুর খনন ও মাছের চাষ)। একইভাবে Water Sector Scheme-এ কর্মরত নারী পুরুষদের মজুরি ও নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মঘণ্টার হিসাবে দেখা যায়, এই প্রকল্পে ১৯৯৬-৯৭ সনে পুরুষদের গড় আয় ছিল (মজুরি) দৈনিক ৪৪ টাকা। নারীদের ক্ষেত্র এটা ছিল ৩৪ টাকা। অন্য হিসেবে পুরুষদের গড় মাসিক আয় ছিল ৯২৫ টাকা, নারীদের ক্ষেত্রে ছিল ৪৫১ টাকা। পুরুষদের মোট কর্মদিবস ছিল ৪১ দিন; যা নারীদের ক্ষেত্রে ছিল ৩৭ দিন। একইভাবে CARE-এর EMPতে কর্মরত নারীরা অভিযোগ এনেছেন ইউনিয়ন পরিষদের সদ্যদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও অর্থপ্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগের। এই তিনটি প্রকল্পের প্রতিটিতেই সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় দক্ষতা অর্জন অ্যাপ্রোচের পরই দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ। কিন্তু এই প্রকল্প তিনটির কোনটিতেই একমাত্র আয়সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড (Income Generation Activities) বাদে অন্য কোনো বিষয়ে নারীদের দক্ষ করে তোলার প্রয়াস বা পদক্ষেপ নেই। আর এই আয় সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডও প্রকৃতপক্ষে নারীর দক্ষতা অর্জনের জন্য নয়, বরং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রকল্পগুলো প্রথম তিনটি স্তর বাদ দিয়ে সরাসরি Anti-Poverty Approach বা দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ হতেই তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।

এরপর ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচটির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, CARE নারীদের বিচরণক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে, সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, অর্থনৈতিক লেনদেনে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও এনে দিয়েছে (CARE 1994-1995, Ahmed et.ah 1996, Smillie et. al 1921, Khanum 2002, NACOB, 1999)। একই ধরনের মতামত দেয়া যায় CARE-এর পরিচালিত প্রকল্পের ক্ষেত্রেও। কারণ তাদের এই কর্মসূচিগুলো CARE-এরই অনুরূপ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে এই দুই প্রকল্পের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এমনকি Water Sector Schemeও নারীর ক্ষমতায়নের একটি সূচক—'অর্থ উপার্জন' বা 'অর্থনৈতিক লেনদেনে' সহায়তাদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে। নারীর উন্নয়নে বা তার ক্ষমতায়নে এয় অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এ হলো মুদ্রার এক পিঠ। অন্য পিঠে এবার দেখা যাক ক্ষমতায়নে নারীর অবস্থান ও নিজস্ব উপলব্ধির দিকগুলো। এক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের নির্ধারিত কিছু সূচক বেছে নিয়ে সেগুলোতে নারীদের অবস্থান ও তাদের উপলব্ধি উন্মোচনের প্রয়াস নেয়া হবে। এই সূচকগুলো হলো :

১. সম্পদ;
২. পারিবারিক অর্থনৈতিক লেনদেনে সম্পৃক্ততা;
৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা;
৪. প্রজনন ও জন্মশাসনে নিজস্ব মতামতসহ সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতা;
৫. সম্পর্ক;
৬. আইনি সহায়তা নেযার ক্ষমতা;
৭. নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে উপলব্ধি ও অবলোকন।

সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা

Water Sector Scheme-এ কর্মরত মহিলারা ব্যতীত WFPA-এ কর্মরত নারী এবং IIRD-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পদের উপর মালিকানা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশ মহিলা বসতভিটা ক্রয়, ১৮ শতাংশ মহিলা চাষযোগ্য জমি এবং ৩৩ শতাংশ মহিলা পশুসম্পদ ক্রয়ে সক্ষম হয়েছেন। তবে এখানে লক্ষণীয়, WFPA-এর মাত্র ৩ জন এবং IIRD-এর মাত্র ৪ জন নারী নিজ নামে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। বাকি সকলে তাদের স্বামী বা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে এই জমি ক্রয় করেছেন। আরো লক্ষণীয়, এ বিষয়ে তাদের স্বামী পুত্রদের কোনো চাপ ছিল না। নারীদের সহজ যুক্তি হচ্ছে, "পুরুষ হলো সংসারের মালিক ও শোভা, হোক না সে অকর্মণ্য বা রোজগারে অক্ষম।" একজন মহিলা তার মৃত স্বামীর নামে জমি ক্রয় করেন, কারণ তার নামে জমি কেনা হলে উত্তরাধিকার সূত্রে মেয়েরা মায়ের সম্পত্তির বৃহৎ অংশটি পাবে। অথচ মেয়েরা হলো পরের মেয়ে। উপরোক্ত বক্তব্যটি এবং এই ঘটনাটি উভয়ই পিতৃতন্ত্রের ভিত্‌কে আরো দৃঢ়তর করে। এক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রত্যক্ষভাবে পুরুষ কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, করেছে নারীর আবহমানকালের কাল ধরে লালিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ। আমাদের আলোচিত প্রকল্পগুলো এই মূল্যবোধ পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ

উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর আওতাধীন নারীদের অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা সবাই দুঃস্থ পরিবারের সদস্য। তাদের অর্জিত অর্থের প্রায় সম্পূর্ণটাই ব্যয় হয় পরিবারের সদস্যদের খাদ্য যোগানের সংগ্রামে। সেই ক্ষেত্রে স্বামী-সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেয়ার আনন্দটুকু ছাড়া অন্য বোধ তাদের মাঝে কাজ করে না—'টাকা আমি খরচ করি বা স্বামী করুক একই কথা, কথা হল খাবারটা কেনা।"

CARE-এর কিছু মহিলা নিজের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং নিজস্ব দোকান ক্রয় ও পরিচালনায় সক্ষম হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বেশিরভাগ নারীর আয়ের একটা বড় অংশ তারা ব্যয় করে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের আয়সৃষ্টিমূলক খাতে। এর

ন্যূনতম মুনাফার কিছুই তার হাতে আসে না। একইভাবে IIRD হতে যে ঋণ মহিলারা গ্রহণ করে , তার পুরোটাই কিংবা সিংহভাগ পুরুষ সদস্যদের আয় সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করা হয়। এর লাভে নারীদের কোনো অংশ নেই। এই নারীদের প্রত্যেকের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে ন্যূনতম সঞ্চয়ের। এই সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য দুটি :

১. জমি ক্রয়,
২. কন্যার বিয়েতে যৌতুক প্রদান।

অথচ IIRD-এর প্রতিমাসের ইস্যু মিটিংয়ের অন্যতম দিক হচ্ছে নারীদের যৌতুকবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা, যা পুরাপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি অনেক মহিলা স্বামীর তীব্র আপত্তির মুখেও কন্যা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখনও কন্যার বিবাহ, জমি ক্রয়, ব্যবসায় মূলধন নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মতামতকে প্রাধ্যান্য দেন। এমনকি পরিবারে কোনো পুরুষ সদস্য না থাকলে প্রতিবেশী পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেন না।

প্রজনন ও জন্মশাসনের নিজস্ব মতামত বাস্তবায়ন

বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পদচারণা এবং তথ্যের আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মশাসন সম্পর্কে মহিলাদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে। খুবই নগণ্য সংখ্যক নারী ছাড়া প্রত্যেকেই জন্ম শাসনের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবে লক্ষণীয় এই যে, এই নারীদের প্রত্যেকেই এই সরঞ্জাম ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত হলেও তারা 'একটির পরিবর্তে অন্যটির ব্যবহারের চক্রে' আবদ্ধ থাকছেন। কিন্তু স্বামীদের কোনো সরঞ্জাম ব্যবহার করা বা ভেসেকটমি গ্রহণে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ তো দূরের কথা, অনুরোধও করেন না; পাছে স্বামী তাদের ত্যাগ করে বা দ্বিতীয় বিবাহ করে এই আশঙ্কায়। সাত সন্তানের জননী সখিনা লাইগেশন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেও তার শারীরিক দুর্বল অবস্থা ও উচ্চ-রক্তচাপের জন্য বারবার তাকে লাইগেশন না করে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। যখন তাকে পরামর্শ দেয়া হলো যে তার পরিবর্তে তার স্বামী ভেসেকটমি করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়, তখন সে আঁতকে উঠলো—"বউ মরলে বউ পাওয়া যায়, বউ অসুস্থ হলে তাকে ত্যাগ করা যায়, তাতে সংসারের কিছু উনিশ-বিশ হয় না। কিন্তু স্বামী মরলে স্বামী পাওয়া যায় না। অসুস্থ স্বামীকে ত্যাগও করা যায় না। স্বামী মরলে বা অসুস্থ হলে সংসার হয়ে যায় বিরান"। নারীদের এই মনোভাব থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীরা পুরুষের বেড়াজাল

হতে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। এই প্রকল্পগুলির প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এমন কোনো প্রশিক্ষণের উপস্থিতি নেই, যা নারীদের মধ্যে এই বোধের উন্মেষ ঘটাতে পারে যে, জন্মশাসনের সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। নোমানের (1983) গবেষণায়ও এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পুরুষের ভেসেকটমির হার অত্যন্ত কম।

সম্পর্ক

প্রকল্পে কর্মরত নারীরা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছেন। বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের বিষয়টির প্রচলন ঘটছে। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সমঝোতামূলক হয়ে উঠেছে। স্বামীরা স্ত্রীদেরকে কিছুটা মর্যাদা দিতে শুরু করেছেন। দাম্পত্য কলহের মাত্রা কমেছে। তবে এক্ষেত্রেও নারীদের মতামত হচ্ছে, "পেট ঠাণ্ডা তো সব ঠাণ্ডা, পেট শান্তি তো সবখানেই শান্তি।" সংসারে নারীদের অর্থের যোগান দান তাদের জন্য স্থায়ী মর্যাদার কোনো আসন তৈরি করতে পারেনি। কারণ এই উক্তিটির সঙ্গে প্রায় সকলেই একমত যে, "যেদিন ঋণ আনা বা টাকা দেয়া বন্ধ করে দেব, সেদিনই মিঠা মুখের চেহারা বদলে যাবে, তৈরি থাকতে হবে চড়-লাথি বা মুখঝামটা খাওয়ার জন্য।"

আইনি আশ্রয় গ্রহণের ক্ষমতা

IIRD-এর কর্ম প্রশিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য ইস্যু হচ্ছে 'সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি'। এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ঢাকার আইন ও নারী উদ্যোগ কেন্দ্রে। অথচ এই প্রশিক্ষণের কোনো প্রতিফলন দেয়া যায় না প্রকল্পে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে। কেবলমাত্র নেত্রকোনার বাওয়ারী বিল এলাকার মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছিলেন, যা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের চাপে আর অগ্রসর হতে পারেনি। CARE-এও এ ধরনের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু এই বিষয়ে এই প্রকল্পগুলো নারীদেরকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও আইনি সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নিজস্ব অবস্থান উত্তরণ সম্পর্কে উপলব্ধি ও অবলোকন

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে বা সংসারের খাদ্য যোগানোর দায়ভার কাঁধে তুলে নেয়ার ফলে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে—এ বিষয়ে প্রকল্পগুলোতে কর্মরত নারীরা সচেতন। এই নারীদের একটি অংশের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস জন্মেছে যে, তারা যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম, তাদেরকে আর কখনোই অনাহার স্পর্শ করতে পারবে না। অন্যদিকে নারীদের একটা বড় অংশ জানালেন, পুঁজি থাকলেও প্রকল্পের সহায়তা ব্যতীত তারা কোনোপ্রকার আয়সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্ষম ও সাহসী হন না।

উপসংহার

নারী আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ফল হচ্ছে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন। নারী আন্দোলন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু এই আন্দোলনের প্রাপ্য ফলভোগ হতে নারীরা আজও বঞ্চিত। এখনও নারীর উন্নয়ন বা উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের জন্য যে কর্মসূচিগুলো গৃহীত হচ্ছে, তার অধিকাংশের ব্যবস্থাপনায় ও নীতি নির্ধারণে রয়েছেন পুরুষতন্ত্রের ধারক পুরুষরাই। এ কারণে 'নারী উন্নয়ন' ও 'ক্ষমতায়ন' শব্দ দুটি প্রকল্পের অন্যান্য কর্মসূচির (যেমন ঋণদান বা বৃক্ষায়ন) মতো একটি বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি বা কর্মসূচির অংশ হিসেবে থেকে গেছে। অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত না হলেও যেন খুব ক্ষতি নেই, কেবল দাতাগোষ্ঠীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বা আর্থিক আনুকূল্য বজায় রাখার জন্য সূচিতে এই কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ' (Women in Development)-এর যে অ্যাপ্রোচগুলো রয়েছে, একমাত্র দারিদ্র্য বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-poverty Approach) বাদে অন্য কোনো অ্যাপ্রোচই গৃহীত হয়নি। ফলে ঘটেনি নারীর কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন। 'ক্ষমতায়নের' তিলকচিহ্ন কপালে ধারণ করে নারী থেকে গেছে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে— বাস্তবেও যেমন, মননেও তেমনি। নারী কেবল জানে 'ক্ষমতায়ন' মানে হচ্ছে স্বামী-পুত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির ক্ষমতা অর্জন, যা তাকে অতিরিক্ত ভার বহনে বাধ্য করে। সে শিকার হয় দ্বৈত শোষণের। ম্যাকনিনের (১৯৮২) 'প্রলেতারিয়েত নারী হচ্ছে ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী'— উক্তিটি এই সব নারীর ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। এই সব নারী চিরকালই থেকে যাচ্ছে প্রলেতারিয়েত। যেহেতু এখানে Efficiency Approach-এর উপস্থিতি নেই, নারী কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় ব্যতীত আর কোনো কাজেই দক্ষ হয়ে উঠছে না। ঘটছে না তার কোনো উত্তরণ বা উন্নয়ন। সে যেন বাধা পড়ে আছে Below Subsistence Level Poverty Trap-এর চক্রে। সে ক্ষমতায়নের সূচকগুলোকে আত্মস্থ করতে ভয় পায়, পাছে পুরুষতন্ত্র তার প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে। সে এই পুরুষতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙার কথা স্বপ্নেও ভাবে না, কারণ যে-প্রকল্পে সে কর্মরত, তার প্রতিনিধিরা, পুরুষতন্ত্রের বাহকরা তাদেরকে এইসব বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেনি। এই বিষয়গুলো থেকে গেছে অগ্রগণ্যতার সর্বনিম্নে। অগ্রগণ্যতার ক্ষেত্রে উর্ধ্বে থেকেছে ঋণদান, রেশন পালন—এই ধরনের লাভজনক খাতগুলো। কারণ এই 'দৃশ্যমান উন্নয়ন' দাতাগোষ্ঠীর আরও অর্থানুকূল্যের দ্বার খুলে দেবে। অথচ একজন নারীর পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি বা তার মধ্যে 'বোধের উন্নয়ন' তো একটি বিমূর্ত বিষয়—যা প্রচারযোগ্য নয়, নয় একটি বিনিয়োগযোগ্য পণ্য। উপরন্তু তা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে হুমকিও বটে। পুরুষতন্ত্র এই বুমেরাং তৈরিতে সংগত কারণেই উদ্যোগী নয়।

একথা ভুলে গেলে চলবে না 'উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের' পূর্বে প্রয়োজন 'নারীর উন্নয়ন' বা 'ক্ষমতায়নের'। নারী উন্নয়নের বিষয়টিকে এখন অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। যে-প্রকল্পগুলো নারী উন্নয়ন

কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, মনিটরিংয়ের অন্যতম বিষয় হওয়া উচিত এগুলোর বাস্তবায়ন কতটুকু হচ্ছে, তার জবাবদিহিতা থাকা। উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলোর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এই বিষয়গুলোর সঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকা প্রয়োজন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইউনিয়ন পরিষদগুলো অধিকাংশ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও নারীদের আইনি সহায়তা গ্রহণের কোনো কোনো ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো ইউনিয়ন পরিষদের এই ধরনের কার্যাবলির ওপর নজর রাখতে পারে এবং কোনো অরাজকতা দেখা দিলে তারা তাদের প্রকল্প হতে ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতা বাদ দিয়ে দিতে পারে। প্রকল্প এবং ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ মনিটরিং আর যৌথ সদিচ্ছার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব নারীর উন্নয়ন, যে-নারী দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে সৃষ্টি করতে পারে দারিদ্র্যমুক্ত সমতাভিত্তিক এক বাসভূমি।

১. নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফলস্-এ প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি স্ট্যানটন এর উক্তি।
২. নারী : ধরিত্রীয় আদলে, সুলতানা মোসতাফা খানম, লোকপত্র, সংখ্যা-৯, পৃষ্ঠা-১২-১৮, ২০০০ হতে উদ্ধৃত।
৩. এজন্য দেখুন Hamida A. Begum, Najma Chowdhury, Jahanara Huq, Salma Khan & Rasheda K. Chodhury (eds.) **Women and National Planning in Bangladesh**, Women for Women, 1990, Dhaka.

তথ্যসূত্র

Ahmed, S. Karim, Das, N. A. and Jasimuddin, S.M. (1996), *Income Diversification Component Qualitative Study*, Independent Research Team: Dhaka.

Begum. H., Chowdhury, N., Huq, J., and Khan, S. (1990) (eds), *Women and National Planning in Bangladesh*, Women for Women: Dhaka.

CARE (1994), *Income Diversification Pilot Program Evaluation Report*, CARE, Bangladesh: Dhaka.

Chen, M. (1990), Conceptual Model for Women's Empowerment, Seminar Paper, organized by the Save the Children: USA.

Engels, F. (1977), *The Origin of the Family, Private Property and the State*, Progress Publisher: Moscow.

Khanum, S. M. (1999), Gateway to Hell: The Impact of Migration on Bangladeshi Women's Territory, Position and Power in England, *Empowerment*, Vol. 6 1-16.

Khanum, S. M. (2000), Knocking at the Doors: The Impact of RMP on the Womenfolk in the Project Adjacent Areas, *Journal of Institute of Bangladesh Studies,* Vol. 23: 77-98.

Mondal, S. R. (1999), Status of Himalayan Women, *Empowerment,* Vol. 6 : 40-56.

NACOB (1999), Rural Maintenance Programme: Impact Assessment Study: Village Profile, NACOB Consultancy Services.

Noman, A. (1983), *Status of Women and Fertility in Bangladesh.* WPS: Dhaka.

Smille, I, Cupper, B, Hossain A, Peter, N and Schwatz, A (1992), *The Long and Widening Road: An Evaluation of the Bangladesh Rural Maintenance Programme,* CARE: Dhaka.

World Food Programme (1999) Impact Evaluation of Water Sector Schemes Implemented in 1991/1997, *Impact Evaluation Series* IES-WAT-96/97/I/99, World Food Programme.

জেন্ডার-রাজনীতি ও রাষ্ট্র : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

মাসুদুজ্জামান

প্রথমেই আমার এই লেখার শিরোনামাটি পাঠকদের কাছে সুস্পষ্ট করে নিতে চাই। জেন্ডার সমসময়ের একটি বহুল আলোচিত ও চর্চিত প্রত্যয় বা ধারণা। রাষ্ট্রের ধারণাটিও বেশ পুরনো হয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষ রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে থেকেই জীবনযাপন করে। রাষ্ট্রের পরিচয়ই তার বড়ো পরিচয়, রাষ্ট্রের দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তার বিকাশ, উত্থান, পতন যা-ই বলি না কেন—ঘটে থাকে। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর প্রত্যেক নাগরিকের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। নারীর সঙ্গেও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুগভীর।

কিন্তু এই সম্পর্কটি কেমন দাঁড়াবে, রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী নারী-পুরুষের ওপর তা যতটা নির্ভর করে, তার চেয়েও বেশি নির্ভর করে স্বয়ং রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্র নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কী চোখে দেখে, কিভাবে বিবেচনা করে, তার ওপরই জেন্ডারের মাত্রা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্র আবার, আমরা জানি, বিমূর্ত কোনো বিষয় নয়। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা, শাসক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের জেন্ডার-সম্পর্কটি তাই কেমন দাঁড়াবে তা নির্ভর করে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর; তাদের দ্বারা গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ওপর। এই নীতিমালা গ্রহণের অবশ্য পটভূমি থাকে। ব্যক্তিমানুষ, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি যে-সমস্ত নীতি বা গৃহীত পদক্ষেপ অনুমোদন করে, শাসকগোষ্ঠী সেইসব নীতিকেই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এর সঙ্গে অবশ্য আধুনিক কালে আর একটি ব্যাপার যুক্ত হয়েছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে রাষ্ট্রসংঘের এমন কিছু ফোরাম গড়ে উঠেছে, যারা রাষ্ট্র কোন কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে, সেইসব নীতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। কখনো কখনো ওই সব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলো সহায়তা করে, বাধ্য করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। জেন্ডার-সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বেশ বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করে, যা এখনও ক্রিয়াশীল।

আসলে আধুনিক কালের নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের প্রভাব এত বেশি যে, জেন্ডার-সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিচে বাংলাদেশে এই জেন্ডার-সম্পর্কটি কিভাবে তৈরি হয়েছে, তার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য কী—সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

এখানে বলাবাহুল্য, অন্যান্য অনেক কিছুর মতো জেন্ডার-সম্পর্ক সামাজিকভাবে ক্রমাগত গঠিত-পুনর্গঠিত হয়। প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যই এমনটা ঘটে থাকে। তবে সমাজ ও সময় ভেদে জেন্ডার-সম্পর্ক গঠনের মধ্যে আমরা অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করি। শুধু একটি ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। নারীর সামাজিক অস্তিত্ব, যা কিনা ক্ষমতা ও সম্পদের সঙ্গে যুক্ত, সেই ক্ষমতা ও সম্পদ থেকে নারীকে সবসময় দূরে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সংগঠন তাদের মতাদর্শ এবং কাজের দ্বারা জেন্ডার-সম্পর্কটি হয় স্থির রাখে, কিংবা ওই সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। বর্তমান প্রবন্ধে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ গত তিন দশকে কোন ধরনের জেন্ডার-সম্পর্ক তৈরি করেছে বা করতে সাহায্য করেছে, সে সম্পর্কে একটা সমীক্ষণ তুলে ধরা হবে। এখানে রাষ্ট্র বলতে তাকেই বোঝানো হবে যার রয়েছে নিজস্ব সরকার এবং নানা প্রতিষ্ঠান—আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ ও আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গত তিন দশকে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে, তার ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে জেন্ডার-সম্পর্ক। তবে এই জেন্ডার-সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। আমরা প্রথমে সে-সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই।

উনিশ শতকের শুরু ও মধ্য পর্যায়ে বাংলাদেশে 'নারীর প্রশ্নটি' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। সমাজ সংস্কার নিয়ে সেই সময় যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক দেখা দেয়, নারীর প্রসঙ্গটি তখনি সেই তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করলে তারা সনাতনপন্থীদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। বিরোধিতার মাত্রাটি এত প্রবল ছিল যে ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাতে জড়িয়ে পড়ে। বাঙালি নারীদের আধুনিক করে তুলতে গিয়েই তাদের এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়। সমাজ সংস্কার নিয়ে ভারতীয়রা তখন 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য'—এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রাচ্যপন্থী বা জাতীয়তাবাদীদের বহির্বিশ্ব বা বস্তুজগতের সঙ্গে ভাবতীয় নারীর সম্পর্ক কেমন হবে, 'ঘর' ও 'বাইরে'র মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যাবে, সেই মীমাংসায় আসতে হয়েছে। তারা মনে করেছেন যে 'অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতি' হচ্ছে ভারতীয়তার মূল কথা; আর 'অধ্যাত্মবাদ' ব্যাপারটাই 'নারীত্বসূচক'। সুতরাং ভারতীয় নারীকে কিছুতেই পশ্চিমের অনুসরণে আধুনিক করা যাবে না। তাকে আধুনিক করতে হলে করতে হবে ভারতের 'ধ্রুপদী' ঐতিহ্য অনুসারে। 'সাধারণ' নারী—যারা ছিল ঝগড়াটে স্বভাবের কিংবা অপরিশীলিত, তাদের তুলনায় নতুন কালের এই নারী হবে শিক্ষিত, পরিশীলিত;

'ঘর' ও 'বাইরে'র মধ্যে তাকে সমন্বয় করে চলতে হবে। তবে 'নারীত্ব'কে বাদ দিয়ে তার কোনো রূপান্তর ঘটতে পারে না (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪ : ৩০)। জাতীয়তাবাদীরা নারীকে এভাবেই দেখতো বলে নারীপ্রসঙ্গ নিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা কোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা নারীজীবনের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের সংস্কার যে মূলত রাজনৈতিক, সেকথা ভুলে যায়নি।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভিঘাতে এভাবেই ভারতে সৃষ্টি হয় নতুন কালের নারী— প্রথমে হিন্দু সমাজে, পরে মুসলমানদের মধ্যে। পর্দাপ্রথা, পারিবারিক অবরোধ ভেঙে মুসলমান নারীরাও গত শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে (মুরশিদ ১৯৮৫, আমিন ২০০২, চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪), সূচিত হয় নারী জাগরণের :

> বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বে নারী-সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে নারীজাগরণ সূচিত হয়। এর প্রকাশ ঘটে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, নারীশিক্ষার আহ্বান, অবরোধপ্রথা বিলোপে এবং সাধারণভাবে সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টার মাধ্যমে। ব্রাহ্ম সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে যেমন এর অনেক ক্ষেত্রে মিল ছিল, ভিন্নতাও তেমন ছিল। একথা সত্য, নগরকেন্দ্রিক এ আন্দোলন সারাদেশের ব্যাপক নারীসমাজকে (বাংলার জনসংখ্যার মাত্র পাঁচ ভাগ ছিলেন ভদ্রলোক) স্পর্শ না করলেও এ আন্দোলনের গুরুত্ব এর প্রভাবের তীব্রতার ক্ষেত্রে, সংখ্যাগত দিক থেকে নয়। হিন্দু বা মুসলিম ভদ্রমহিলাগণ সংখ্যায় নগণ্য হলেও তাঁরা বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য একটি মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছেন। (আমিন ২০০২ : ২৪-২৫)

বাঙালি নারীর এই জেন্ডার পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াটি দুভাবে সম্পন্ন হয়েছে ; একদিকে নতুন কালের নারীকে ঐতিহ্যবাদীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে আধুনিকতার পথে এগিয়ে আসতে হয়েছে; অন্যদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হয়েছে :

> ... নারীর মূল্য ও রাষ্ট্রের সহিত নারীর সম্বন্ধ প্রভৃতি যদি আলোচনা করা যায়, তাতে নারীর মঙ্গল হবে, আপন অধিকার সম্বন্ধে সে জাগ্রত হবে এবং প্রাপ্ত অধিকারের সদ্ব্যবহার শিখবে। (নিজাম ১৯৩৩ : ৫৬০)

সুমিত সরকার বা পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই ঠিকই লক্ষ করেছেন যে, উপনিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের প্রথম পর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকেরা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীকে ঐতিহ্যের আধারে আবদ্ধ রেখে রাজশক্তির সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দেয়নি (সরকার ১৯৭৩ : ৩৪, চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৪ : ১৩২)। এই পটভূমিতে দেখলে একে অবশ্যই নতুন একধরনের পিতৃতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা যায়, যে-পিতৃতন্ত্র ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে পৌরুষত্বের (masculinity) ধ্বজা তুলে ধরেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ইসমাইল হোসেন সিরাজীর রচনা পড়লেই তা বোঝা যায়। নারীর স্থান তাই সেখানে গৌণ হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তাল সেই সময়টাই ছিল ঝড়ো হাওয়ার রূপান্তরের কাল। পশ্চিমের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথমে স্বামীদের সহায়তায় এবং পরে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে বাঙালি নারী পারিবারিক অচলায়তন ভেঙে অধস্তন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে

আসছিল। পিতৃতন্ত্রের শুরু পরিবারে, কিন্তু রাষ্ট্রও পিতৃতন্ত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (মিলেট ১৯৯০ : ১৫৮)। বিশেষ করে আধুনিক কালে জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর জেন্ডার-সম্পর্ক গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি সমান প্রযোজ্য। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক পর্বে পাকিস্তানের আধিপত্যবাদী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের নারীদের অবস্থার উন্নয়নে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বিশেষ করে পুরো রাষ্ট্রকাঠামোটি যেহেতু মতাদর্শিকভাবে ছিল সনাতন বা সামন্ত মূল্যবোধের অধীন, ফলে নারী-উন্নয়নে তারা কোনো অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর উল্লিখিত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তবে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে এই পরিবর্তন একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। এ প্রসঙ্গে আবদুর রাজ্জাকের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> বাংলাদেশের জনগণের অবস্থাই হচ্ছে জাতির অবস্থা। ... বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, অর্ধেক পুরুষ। সন্দেহ নেই যে, তাদের মধ্যে অপরিবর্তনীয় জৈবিক পার্থক্য রয়েছে। একটা সমাজ এই পার্থক্যকে কিভাবে ব্যবহার করছে, তা দিয়েই মূলত বোঝা যায়, সমাজটা কেমন। এখন পর্যন্ত এমন সমাজ খুব একটা নেই যেখানে পুরুষ আর নারীর মধ্যে পক্ষপাত নেই, আর এমন পক্ষপাত অবশ্যই নারীর বিপক্ষে কাজ করে। অবশ্যই বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। (রাজ্জাক ২০০১ : ৫৩)

জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একথাগুলো বলেছেন অধ্যাপক রাজ্জাক। বাংলাদেশের নারীরা কোন অবস্থায় রয়েছেন, এই পর্যবেক্ষণ থেকেই তা বোঝা যায়। জেন্ডার-সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্র অবশ্য কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে তা আরও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ঔপনিবেশিক কালের প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এই সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, এখন তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

২

বাংলাদেশ যে-কোনো জাতিরাষ্ট্রের মতোই জেন্ডার-সম্পর্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, গত তিন দশকে এই দেশটির আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ঘটে গেছে ব্যাপক পরিবর্তন। তবে এরই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান—যেমন পরিবার এবং ধর্ম পুরনো জেন্ডার-সম্পর্কের খোলস ছেড়ে যে নতুন ধরনের জেন্ডার-সম্পর্ক গ্রহণ করেছে, সেকথা বলা যাবে না। বরং নারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঐতিহ্যবাহী সনাতন মতাদর্শ এবং অধঃস্তনতার ধারাবাহিক সূত্রই অনুসরণ করছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসেবে নিজস্ব অন্তর্গত দুর্বলতা এবং নির্ভরশীলতার কারণে নারীর জন্য ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে জেন্ডার-সম্পর্ক পরিবর্তনের অনুকূল পরিস্থিতি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য, মতাদর্শিক ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ,

সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে জেন্ডার-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা হবে। কিন্তু তার আগে রাষ্ট্র এবং জেন্ডারের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিকটি কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নেওয়া জরুরি বলে মনে করি।

মাত্র কিছুদিন, অর্থাৎ গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে জেন্ডারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণের রীতিপদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে (আফশের ১৯৮৭, চার্লটন ও অন্যান্য ১৯৮৯, ওয়াটসন ১৯৯০)। মানব উন্নয়নের সঙ্গে জেন্ডারকে মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটিও খুব বেশি পুরনো নয় (ইউএনডিপি ১৯৯৫)। এসব প্রসঙ্গ সাম্প্রতিককালের নারীবাদী আলোচনার একটা বড় ক্ষেত্র জুড়ে আছে এইজন্য যে, রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ জেন্ডার-সম্পর্ক গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত জীবন, শ্রমবাজার, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, নাগরিকদের মানবাধিকার, আইনের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার বৈধতা রাষ্ট্র পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি উপভোগ করছে। তবে এসব আলোচনার বেশিরভাগই হয়েছে উন্নত দেশকে সামনে রেখে। কিন্তু দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং পুঁজির অনুন্নত বিকাশের কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটেছে অন্যভাবে, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মতো নয়। জেন্ডার-সম্পর্কের ধরনটিও তাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বিকশিত হয়েছে ভিন্ন পথে। জেন্ডার-সম্পর্কের এই ধরনটি বুঝতে হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র কী তা বুঝে নিতে হবে।

লক্ষণীয়, অনেকেই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন (আলাভি ১৯৭৩, জাইমান ও ল্যাজেনডরফার ১৯৭৭, ওয়েস্টারগার্ড ১৮৮৫, হ্যালিডে ও আলাভি ১৯৮৮)। তারা দেখিয়েছেন যে, শক্তিশালী পুঁজির গঠনই বুর্জোয়া বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং তা থেকেই আবির্ভাব ঘটেছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর। কিন্তু অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। গঠনপ্রক্রিয়ার এই সময়টাতেই দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে নিজেদের অধীনে রাখার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী জন্ম দেয় এক শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের। ফলে বুর্জোয়া বিকাশ ছাড়াই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যখন তারা পশ্চিমের আধুনিক রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে শাসনকার্য শুরু করে, তখনই দেখা দেয় নানা অসংগতি ও বিপর্যয়। আলাভি এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোর ওপর সামরিক-আমলাতান্ত্রিক ক্ষুদ্র কোনো গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা চেপে বসেছে বলে মনে করেছেন। এরকম ক্ষেত্রে এই দেশগুলোর শাসনকর্তৃত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকে না, বরং তারা এ ব্যাপারে একধরনের পরিপূরক ভূমিকা পালন করে মাত্র (আলাভি ১৯৭৩)। ফলে স্বাধীনতা অর্জনের পর একক কোনো শ্রেণী এইসব রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পায়নি, বরং বিভিন্ন শ্রেণীকে রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান করে দিতে হয়েছে। পেশাজীবী ও বেতনভোগীরাই (সামরিক ও আমলা) রাষ্ট্রশাসন প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে। তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যকামী স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছে। এসব করতে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বও অর্জন করেছে এইসব রাষ্ট্র।

প্রান্তিক রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, চূড়ান্ত পরিণাম হিসেবে একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন এসব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে পুরোপুরি কেন্দ্রিভূত হয়েছে; রাষ্ট্র শাসনক্ষমতার সবকিছু কুক্ষিগত করেছে, তেমনি ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নিজস্ব স্বাধীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ওপর এই রাষ্ট্রগুলোকে নির্ভরশীল হতে বাধ্য করেছে। গবেষকদের মতে দুর্বল, বিকৃত, নির্ভরশীল অর্থনীতির কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কোনো শক্তিশালী শ্রেণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়নি, রাষ্ট্রযন্ত্রই সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থরক্ষা করেছে। প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোকে সেইভাবে আধিপত্যবাদী কোনো গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়তে হয়নি।

তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এইসব রাষ্ট্র মতাদর্শ গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করেছে। নিজেদের তৈরি মতাদর্শ বা নীতির ভিত্তিতে এভাবেই উত্তর-আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তাদের নতুন শাসনব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে যতটা সম্ভব বৈধ করে নিয়েছে, সুসংহত রেখেছে (হ্যালিডে ও আলাভি ১৯৮৪ : ৪, সাউল ১৯৭৪ : ১৫০-১৫১)। এসব সত্ত্বেও দেখা গেছে, অন্তগর্তভাবে এই রাষ্ট্রগুলো বেশ দুর্বল আর রাজনৈতিকভাবে খুব অস্থিতিশীল। অল্প কিছুদিন পর পর কোনো না কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটা এইসব রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকগোষ্ঠী যে বৈধভাবে দেশ শাসন করবে, তার কর্তৃত্বও তারা হারিয়ে ফেলে। ফলে নিজেদের মতো করে দেশ শাসন করবার জন্য হাতিয়ার হিসেবে তাদের স্বউদ্ভাবিত বা প্রচলিত সনাতন মতাদর্শকে ব্যবহার করতে হয়। অনেক কিছু তারা জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়, পরিণামে জন্ম হয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের। এইসব রাষ্ট্র যে নির্ভাবনায় কাজ করতে পারে তা নয়, বরং নানা সমস্যা মোকাবেলা করে তাদের টিকে থাকতে হয়। সাধারণ মানুষের জীবনের গুণগত পরিবর্তন সাধনে এসব রাষ্ট্র তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না।

বিভিন্ন গবেষক উল্লিখিত ব্যাখ্যারীতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন (ওয়েস্টারগার্ড ১৯৮৫)। তাদের মতে প্রথম দু-দশকের বাংলাদেশে কোনো আধিপত্যবাদী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই সম্প্রসারণ ঘটেছে মাত্র। এর ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে, বাংলাদেশে কোনো দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর বিকাশ ঘটেনি। অর্থনৈতিক অব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে শিল্পভিত্তিক শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। শক্তিশালী এই বুর্জোয়া শ্রেণীর অভাবে বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, যারা ছিলেন মূলত বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানির দেশীয় কমিশন এজেন্ট, তাদের দ্বারাই

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহোরনে বাংলাদেশ আরও অসমর্থ হয়ে পড়ে। আর এটাই বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ ব্যয়বরাদ্দের উৎস ছিল বৈদেশিক ঋণ—গড়ে ৮৫ শতাংশ। এই সময় পর্যন্ত রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ আসতো আবার বিদেশী ঋণের মাধ্যমে আমদানি করা কাস্টম শুল্ক থেকে।

বিদেশী ঋণের প্রতি এই নির্ভরশীলতা এবং শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণীর অভাবই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। প্রাথমিকভাবে এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমরা দেখেছি, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে দাতা দেশগুলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিনির্ধারণে বড়ো ধরনের ভূমিকা রেখেছে (সোবহান ১৯৮২ : ৩)। শুধু আর্থ-সামাজিক নয়, সময়ের পরিক্রমায় রাষ্ট্র হিসেবে আমরা অন্যান্য নীতিনির্ধারণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের নীতিনির্ধারণের কর্তৃত্ব চলে গেছে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা—যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কিংবা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হাতে। একদিকে যেমন ঘটেছে এই পরনির্ভরতা, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার, বেসামরিক-সামরিক কর্তৃপক্ষ করায়ত্ত করেছে বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। এই একই সময়ে ঘটেছে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দেশীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তরিত হবার ফলে তারাও অর্থনৈতিকভাবে সুসংহত হয়েছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, স্বাধীনতার প্রথম দুদশকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল দাতা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে বেশ দুর্বল এবং আধিপত্যবাদী শ্রেণীর কবল থেকে মুক্ত।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এসময় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর তা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্র ছিল অনেক সুসংহত। রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে তারা দেশীয় সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সামনে রেখে বা শিখণ্ডি হিসেবে ব্যবহার করে তারা দেশ শাসন করেছে (আলাভি ১৯৭৩)। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যখন তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়, তখন তারা পূর্বতন স্থিতাবস্থা, অর্থাৎ তাদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। কিন্তু এই বেসামরিক-সামরিক গোষ্ঠীর দেশ শাসন করবার কোনো বৈধতা ছিল না। দেশ শাসনের বৈধতা অর্জনের জন্য এরপর তারা এমন একধরনের মতাদর্শ বা নীতির কথা বলতে থাকে, যাতে তারা দেশ শাসনের বৈধতা পায়। একই সঙ্গে তারা দেশ শাসনের নামে দমন-পীড়নও চালাতে থাকে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই নড়বড়ে অবস্থা বা অস্থিতিশীলতার দিকটি বার বার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বিধান রাখা হয় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ওই একই সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

করে এবং প্রতিষ্ঠা করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। ১৯৭৫ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন আর সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার বাংলাদেশে বহুদলীয় রাজনীতি পুনঃপ্রবর্তন করেন; কিন্তু ১৯৮১ সালে জিয়া স্বয়ং আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার হয়ে মৃতুবরণ করেন। এই ঘটনার পরপর জিয়া সরকারের উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৮২ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাত্র তিন মাস পর সামরিক বাহিনী জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে আবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। ১৯৯০ সালে প্রবল এক গণআন্দোলনের মুখে ওই সামরিক সরকার উৎখাত হয়। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় আসে এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বেসামরিক-সামরিক ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্থিরতা এবং আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনের মুখে সেই সরকারের পতন ঘটে। এরপর ১৯৯৬ সালের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে চারদলীয় জোট সরকার।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রথম তিন দশকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই ছিল এই রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা। উপরন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্ব মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এমন সব নীতি গ্রহণ করে, যা ছিল স্ববিরোধী। জেন্ডার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যাবলি গ্রহণের সময়ও এই স্ববিরোধী নীতির প্রয়োগ ঘটানো হয়। দাতা দেশগুলোর কাছে বৈধতা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র জেন্ডারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এটা করতে গিয়ে জেন্ডার-সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য সে অবশ্য কখনও কখনও বেশকিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল স্বার্থান্বেষী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর চাপে সনাতন জেন্ডার-সম্পর্কের ধারাকেই অনুসরণ করেছে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৩

বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত রাখার জন্য কিংবা তাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য নানা মতবাদ বা নীতিকে সাড়ম্বড়ে ব্যবহার করেছে। গত তিন দশকে আমরা এই রাষ্ট্রকে মোটামুটি তিন ধরনের মতাদর্শ ব্যবহার করতে দেখেছি : জাতীয়তাবাদ, ধর্ম এবং আধুনিকায়ন। বলাবাহুল্য, এসব মতাদর্শ জেন্ডার-সম্পর্ক গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েক বছর পর ওই রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যখন বৈষম্যের ব্যাপারটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, তখনই জাতীয়তাবাদের

ধারণাটি বাঙালিদের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা জেন্ডারকেন্দ্রিক মাত্রা আছে। এ দেশের সংগ্রামী নারীরা বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলনসহ প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যেমন ১৯৬৪ সালের শিক্ষা-আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণআন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নানা সময়ে বাঙালি নারীদের এই বলে নিন্দিত করেছে যে, তারা শাড়ি পরে আর কপালে টিপ লাগায়। কিন্তু এই শাড়ি আর টিপই ছিল বাঙালিদের আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রধান প্রতীক।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণও ছিল সক্রিয় আর স্বতঃস্ফূর্ত। তথ্য সংগ্রহ ও আদানপ্রদান থেকে শুরু করে গেরিলা যুদ্ধে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণহীন চাষী নারীরা নিজস্ব ব্যবস্থায় এই সময় হাজার হাজার গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাকে দিনের পর দিন খাবার খাইয়েছেন, তাদের আশ্রয় দিয়ে, সাহস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সরবরাহ করবার জন্য গড়ে তুলেছেন নিজস্ব সংবাদ আদানপ্রদানের শক্তিশালী অথচ গোপন নেটওয়ার্ক। তাদের জানিয়েছেন পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান। এই নারীদের কেউ কেউ শত্রুনিয়ন্ত্রিত স্থাপনাসমূহে বোমা পেতেছেন, কেউ আবার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে সারিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের কয়েক লাখ নারী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার যে শিকার হয়েছেন, পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

স্বাধীনতাত্তোর কালের বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাই চার মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম নীতি হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অভূতপূর্ব অবদান রাখার জন্য নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কিংবা নির্যাতিত নারীদের স্বীকৃতি পাওয়াই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই স্বীকৃতিদানে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। শুধু রাষ্ট্র নয়, সমাজও তাদের অবদান যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি। কাগজে-কলমে বা মৌখিকভাবে নয়, নির্যাতিত নারীদের স্বাভাবিক পুনর্বাসন হয়নি বাংলাদেশে; নারী যোদ্ধাদের যথাযথ স্বীকৃতি পেতেও লেগে গেছে অনেক দিন। এমনকি সরকারি দলিলপত্রেও গেরিলা যুদ্ধে বাংলাদেশের নারীরা যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন, তার স্বীকৃতি ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি নারীসংগঠন যখন বেশ কয়েকজন নারীযোদ্ধার সন্ধান পেলেন এবং তারা যখন এই যোদ্ধাদের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এলেন, তখনই সবার দৃষ্টি পড়লো নারীযোদ্ধাদের ওপর। আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যেসব নারী পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধর্ষিত হয়েছিলেন, নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সাধারণভাবে সেইসব নারীর পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রেখেছিল। এক হিসেবে বলা হয়েছে যে, প্রায় ৩০ হাজার নারী এই সময় ধর্ষণের শিকার হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ধর্ষণের একটা ধর্মীয় মাত্রা রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধর্মের নারী যদিও ওই সময় পাকিস্তানি বর্বর সেনাদের হাতে ধর্ষিত হয়েছিল (কিছু

কিছু রাজাকারদের হাতে), তবু হিন্দু নারীরাই তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নির্যাতিত এই নারীদের দুঃখ-কষ্ট আর অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার সেই সময় তাদের *বীরঙ্গনা* বলে আখ্যায়িত করে আর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু এই আখ্যা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। বীরাঙ্গনা বলে চিহ্নিত করায় সমাজ থেকে তারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের নারীরা যে ভূমিকা রেখেছিলেন, সন্দেহ নেই সনাতন পারিবারিক ভূমিকার তুলনায় তা ছিল একেবারেই আলাদা। সেই প্রথম আমাদের সাধারণ গ্রামীণ নারীরা সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে ব্যক্তিক স্তর থেকে সীমিত পরিসরে হলেও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের স্তরে উঠে এসেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে তাদের ওই অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়নের সঙ্গে যুক্ত। কোনো কিছু পাওয়ার আশায় নয়, মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখনই স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষে নতুন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি হলো, তখনই প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা তাদের আবার আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হলো, ঢেলে দেয়া হলো যুগযুগ ধরে নির্দিষ্ট ব্যক্তিক-পারিবারিক বলয়ে।

কিন্তু ১৯৭০ সালের পরে বাংলাদেশের গ্রামীণসমাজে একধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। বেশকিছু সংখ্যক গ্রামীণ নারী সনাতন মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়ায়। দুটি ঘটনা এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে : প্রথমত, ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলবর্তী বহু নারী তাদের স্বামী বা পুরুষ অভিভাবকদের হারান; দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক নারীর পিতা, স্বামী বা ভাই অকালে মৃত্যুবরণ করেন। এইসব মৃত্যু গ্রামীণ নারীদের অনেককেই অভিভাবকহীন করে ফেলে আর তারা জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে আসেন। অন্য একটি কারণেও গ্রামীণ নারী শহরমুখি হন; এই সময় থেকেই ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালে গ্রামে গ্রামে আবার খাদ্যাভাব দেখা দিলে দারিদ্র্যক্লিষ্ট অভিভাবকহীন গ্রামীণ নারীর একটা বড়ো অংশ কাজ পাওয়ার আশায় শহরে চলে আসতে বাধ্য হন। গত শতাব্দীর সত্তর দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের এভাবেই ব্যাপক অভিবাসন ঘটে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার কারণেই যুগ যুগ ধরে প্রচলিত মূল্যবোধে চিড় ধরে এবং নারীর নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র এই প্রবণতা রোধের ব্যাপারে তখন কোনো উল্লেখযোগ্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

ক্ষমতাসীন কিংবা ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সবচেয়ে খোলাখুলিভাবে যার ব্যবহার ঘটিয়েছে, সেটা হচ্ছে ধর্ম। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সামরিক ও বেসামরিক আমলারা রাজনৈতিক দলগুলোকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর নিজেদের হিস্যা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু যখন তা সম্ভব হয়নি কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো যখন দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছে

অথবা দেশ শাসনের বৈধতা হারিয়েছে, তখনই সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণভার সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই—তারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল, তা অব্যাহত রাখা (আলাভি ১৯৭৩ : ১৫৩)। সেজন্যই দেখা যায়, ১৯৭৫ সালের পরে একটার পর একটা সামরিক অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের অবস্থানকে শুধু সুসংহত করেনি, বৈধ করে নিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু তার শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অনুসরণ করেননি, যে-চেতনা মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে তিনি বরং ধর্মকেই বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন (ওয়েস্টারগার্ড ১৯৮৫ : ৯১)। ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূল চার নীতির একটি। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়া সংবিধানের ৮/১ ধারা সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সেখানে 'আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস' কথাটি প্রতিস্থাপিত করেন। ইসলামি মূল্যবোধকে উস্কে দেওয়ার জন্য তিনি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ইসলামি ফাউন্ডেশনের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন এবং গণমাধ্যমে ইসলামি অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটান। এসব তিনি করেছেন মূলত দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে : প্রথমত, ক্রমবর্ধমান ভারতবিরোধী জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করতে চেয়েছেন; দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে পেট্রোডলারের সাহায্য পেতে চেয়েছেন।

কোনো সন্দেহ নেই, জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের প্রথম শাসক যিনি সচেতনভাবে তার শাসনব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি পূর্ববর্তী সরকারের অনুরাগ তেমন ছিল না। আসলে শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম ১৯৭৩ সালে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সেতুবন্ধন স্থাপনে উদ্যোগী হন। তার সময়েই বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে। ১৯৭৪ সালেই তিনি ইসলামি ফাউন্ডেশন স্থাপনের অনুমোদন দান করেন এবং বাংলাদেশে মাদ্রাসার মাধ্যমে সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। নিজের সমর্থনবলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ধর্মকে আরও চাতুর্য এবং সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন (আহমেদ ১৯৮৯ : ১৩৮)। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা সংস্কারের নামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পাঠ্য করেন। তিনি অনেকবার বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন ইসলামি মূল্যবোধের দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। ১৯৮৮ সালে তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল পাশ করান। এই বিলে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করলে রাজনীতিতে তার একটা ব্যাপক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। শুধু রাজনীতি নয়, নারীর অবস্থাকেও ধর্ম মৌলিকভাবে অনেকটাই বদলে দেয়। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার প্রথমত যা করে তা হলো, জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করে ফেলে এবং সামাজিক অনৈক্যের জন্ম দেয়। অন্যদিকে পিতৃতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্র ধর্মের নামে নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বণ্টনকে আরও সুসংহত করতে সাহায্য করে। এই অসম সম্পর্ক, বলাবাহুল্য, নারী-পুরুষের মধ্যেকার ব্যবধানকেই প্রকট করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যখন তার শাসন ব্যবস্থাকে বৈধ করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তখন ধর্ম ও জেন্ডার-সম্পর্কটি একে অন্যের সঙ্গে সরাসরি গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। বাইরের জীবনে নারী কিভাবে চলছে, তার প্রতিমূর্তিটি কী রকম দাঁড়াচ্ছে তা অনেকের, বিশেষ করে পুরুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নারীর বাইরের জীবন বলতে টেলিভিশন, গণমাধ্যম এবং সরকারের মধ্যে সে কিভাবে চলাচল করছে, সেইসব ক্ষেত্রকেই বোঝানো হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নারী কোন ভাবমূর্তি, অর্থাৎ চেহারা বা রূপে উপস্থিত হচ্ছেন, সেই দিকটি প্রধান্য পেয়ে যায়। প্রথমেই এ প্রসঙ্গে আমরা নারীর পরিধেয় পোশাক-আশাকের কথা উল্লেখ করতে পারি। জনজীবনে বিচরণশীল নারী কোন ধরনের পোশাক পড়ছে বাংলাদেশে তা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যখন হজ পালন করে দেশে ফেরেন তখন তিনি মাথায় একটা স্কার্ফ বা ওড়না পড়তেন। এই ওড়নাটি তার চুল ঢেকে দিত। কিন্তু এই পোশাকে চলাচলের এক সপ্তাহের মধ্যে পুরুষ সহকর্মীদের চাপে তিনি একটি শাল পড়তে থাকেন (সিদ্দিকী ১৯৯৮ : ১৫৩)। এখানে পোশাক পরিধানের এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, পুরুষ অফিস-আদালতে কী পোশাক পরে গেল তা কারো মনোযোগের বিষয় হয় না, কিন্তু নারী কী চেহারায় উপস্থিত হলেন তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কর্মক্ষেত্রে বা জনসমক্ষে পুরুষ যে চেহারায় উপস্থিত হোন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, নারীকে অবশ্যই সমাজ অনুমোদিত 'পরিশীলিত' পোশাকে (যা আবার পুরুষের দ্বারাই নির্ধারিত) জনসমক্ষে উপস্থিত হতে হয়। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটা চলবে না। গণমাধ্যমেও আমরা আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। রোজার সময় হলেই সরকারনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনের ঘোষিকারা কিংবা খবর পাঠিকারা মাথায় ঘোমটা দিয়ে পর্দায় উপস্থিত হন, পুরুষ ঘোষক বা সংবাদ পাঠকদের এরকম কোনো রীতি মেনে চলতে হয় না, মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নেই।

আসলে স্বাধীনতার পর গত তিন দশকে গণমাধ্যমে নারীর শরীর বা রূপ কিভাবে উপস্থিত হবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার মতাদর্শিক সাংস্কৃতিক একটা রীতি বা পদ্ধতি চালু করে দিয়েছে। আর এভাবেই রাষ্ট্র নারীর শরীর বা চেহারাকে গণমাধ্যমে উপস্থাপন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের সমাজে নারীর জন্য করণীয় যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, রাষ্ট্র গণমাধ্যমে তারই প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে।

এই ভূমিকা অনুসারে নারী কখনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারবে না, পারবে না নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী কিংবা আত্মনিবেদিত; বরং তাকে হতে হবে পুরুষের ইচ্ছার অধীন, সবকিছু মেনে নেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতেও এমন কিছু কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, যেসব প্রসঙ্গ নারী-পুরুষের অধিকার—যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, বিচ্ছেদ কিংবা সন্তান প্রতিপালনের দাবির প্রশ্নে পুরুষকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে ধর্মের এই ব্যবহারের প্রভাব যে কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে, পরবর্তীকালের রাজনীতিতে আমরা তার প্রতিফলন লক্ষ করেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হলো, জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করার যে সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছেছিল, সেই চেতনা আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার বা শাসকগোষ্ঠী ডানপন্থী ইসলামি দলগুলোকে ছাড় দিতে দিতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে, ওই দলগুলো শুধু যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বা সরকারগঠনে সাহায্য করেছে তাই নয়, নিজেরাও এখন সরকারে ঢুকে পড়েছে। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে নিয়ন্ত্রণও করছে। জামায়াতে ইসলামী—যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সহায়তা করার বা যুদ্ধাপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, সরকারের বাইরে বা ভেতরে তাদের অবস্থান এখন বেশ পাকাপোক্তই বলা যায়।

বাংলাদেশের নারীদের বারবার এই ডানপন্থী রাজনৈতিক অপশক্তির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। দেশের বহু জায়গায় নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার কাজে নিযুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে তারা প্রচারণা চালিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কার্যালয় আক্রমণ ও ভাঙচুর করেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে তারা সেইসব প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে, যারা গ্রামে নারীশিক্ষা বিস্তারে কাজ করে, নারীদের আয়বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয় কিংবা তাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলে। অনেক জায়গায় দেখা গেছে তথাকথিত ধর্মীয় মোল্লাদের হাতে ব্যক্তিগতভাবে অনেক নারী মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমনকি অনেককে মৃত্যুবরণও করতে হয়েছে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক ডানপন্থী দলগুলোর একটা জোট নারী উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতাল পালন করেছে।

শাসকগণ, বোঝা যায়, তাৎক্ষণিকভাবে ফায়দা লোটার জন্য ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করলে এই ব্যাপারটি জাতীয় ঐকমত্যের মূলে এমনভাবে কুঠারাঘাত করে যে, এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আর সম্ভব হয় না। জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারটিও এভাবে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটে তা হলো, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকেও তা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক কে হবে? সরকার না

তথাকথিত মোল্লারা? সরকার বা সংবিধানের কর্তৃত্বকে খর্ব করার হুমকিও এসেছে এইসব ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে। এ জন্যই দেখা যায়, কোনো কোনো তথাকথিত পীর বা ধর্মীয় নেতা বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের পদে কোনো নারীনেতৃত্ব অধিষ্ঠিত হতে পারবে না বলে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা বা ফতোয়া দেয় এবং রাষ্ট্র সেই অসাংবিধানিক ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারে না। নারীপ্রসঙ্গের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, এইসব ধর্মীয় নেতা রাষ্ট্রকে বেশ সংকটপূর্ণ বা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়। কেননা ঐতিহাসিকভাবে আধুনিক একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে তালমিলিয়ে তাকে চলতে হয়, অথচ ধর্মীয় নেতারা একে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চায়। এরই অংশ হিসেবে তারা নারীকে অন্তঃপুরে বন্দি হওয়ার কথা বলে, এ জন্য কখনও কখনও ফতোয়া জারি করে। ধর্মীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার যে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, তা না বললেও চলে। কেননা সমকালের অন্যান্য আধুনিক রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ হচ্ছে নারীকে গৃহে বন্দি করে রাখা নয়, সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। নারী যাতে এই উন্নয়নে যথাযথ অবদান রাখতে পারে, প্রত্যেকটি আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ হচ্ছে সেটাই। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নারীকে রাষ্ট্রীয় সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে দেয়নি। অথচ একথা আজ আর কারো অজানা নেই যে বাংলাদেশের নারীরা, যারা আবার দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম, কৃষিখাতে এবং গার্মেন্টিস খাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখে চলেছেন। তাদের শ্রমেঘামে বাংলাদেশ অর্জন করছে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা, জিডিপিতে (মোট জাতীয় আয়) তাদের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাইরের বিশ্বের সঙ্গে তালমিলিয়ে চলতে হলে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাকে পা মিলিয়ে চলতে হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, আধুনিকায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরস্পর হাত ধরাধরি করে না চললে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সেইভাবে তরান্বিত হয় না। স্বাধীনতার পরে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক জীবনে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র আড়াই বছরের মাথায় ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এর আগেই অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে আসছিল। পাকিস্তানিদের দেশত্যাগের সময় সেই স্থবিরতা আরও জেঁকে বসে। ফলে আধুনিকায়নের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুভ হয়নি। জেনারেল জিয়া ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে যখন ক্ষমতা আসেন, নিজের ক্ষমতাকে সুসংসহত করার জন্য তিনি ধর্মকে ব্যবহার করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং আধুনিকায়ন পদ্ধতিকেও ব্যবহার করতে থাকেন। বিশ্লেষকদের মতে জিয়া এজন্য যে তত্ত্বটির সূত্রপাত ও ব্যবহার ঘটান সেটি হচ্ছে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। এই

জাতীয়তাবাদের ধারণাকে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে প্রচার করে তিনি বাংলাদেশকে আধুনিকায়নের পথে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন (মনিরুজ্জামান ১৯৯৭ : ২০০)। কিন্তু ধর্মকে উস্কে দিয়ে এই আধুনিকতার সঙ্গে তার সমন্বয় কিভাবে ঘটানো যায়, সেই সমস্যার সমাধান তিনি দিতে পারেননি।

মতাদর্শিক এই ত্রুটির কথা মনে রেখেও বলা যায়, জিয়া যখন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কথা বলছিলেন, তখনই জাতিসংঘের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য বিশ্বজুড়ে শুরু হয় নানা কর্মযজ্ঞের। ১৯৭৫ সালকে ঘোষণা করা হয় নারীবর্ষ হিসেবে, আর ১৯৭৫-৮৫ সময়পর্বকে ঘোষণা করা হয় নারী উন্নয়ন দশক হিসেবে। বিশ্বজনীন কর্মতৎপরতার সুযোগকে গ্রহণ করে জিয়া নারী উন্নয়ন সাধনের জন্য গ্রহণ করেন বিভিন্ন কর্মসূচি। তিনি নারী উন্নয়নের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি চাকরি ক্ষেত্রেও নারীর জন্য সংরক্ষিত কোটার হার বাড়িয়ে দেন।

আগেই অবশ্য শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের এই পর্বে দরিদ্র নারীর মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য রাষ্ট্র 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচির পরিসর আরও বিস্তৃত করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কারণে পুরুষ অভিভাবকহীন বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র নারীর জীবনে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে, তারই প্রতিক্রিয়ায় তারা যখন জীবিকার তাগিদে কাজ খুঁজতে থাকে, তখনই উল্লিখিত কর্মসূচি তাদের ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য হলেও কিছুটা সাহায্য করেছে। এখানে লক্ষণীয় যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলেই এই ধরনের কাজে শারীরিকভাবে তাদের নিযুক্ত হতে হয়েছে। নারীরা এই সময় রাষ্ট্র পরিচালিত খালকাটা কর্মসূচি, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি কাজে শ্রমিক হিসেবে কায়িক শ্রম দিয়েছেন। ঘরের সনাতন কাজ ছেড়ে নারীরা যখন এইভাবে বাইরের কাজে এসে যুক্ত হয়, তখন বাংলাদেশে এতদিন ধরে যে নারীভাবমূর্তি প্রচলিত ছিল, তারও অবসান সূচিত হয়। গৃহে অন্তরীণ 'অদৃশ্য নারী' চলে আসেন পৃথিবীর বৃহৎ আঙিনায়। আসলে সেই শুরু, এরপর প্রতিটি সরকার তার শাসন ব্যবস্থাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য উন্নয়ন ধারণাকে ব্যবহার করেছেন, আর এই উন্নয়ন সংক্রান্ত রাজনৈতিক ডিসকোর্সে সম্পৃক্ত করেছেন নারীকে।

অধিকাংশ দাতা দেশ যখনই কোনো প্রকল্পের বিপরীতে সাহায্য দেয়, তখনই তারা সেই সাহায্যের সঙ্গে এই শর্ত জুড়ে দেয় যে, ওই প্রকল্পের কারণে নারী যেন কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হন। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এর পর থেকে যত ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেই প্রকল্পের প্রভাব নারীর ওপর কতটা পড়তে পারে তা বিবেচনায় আনতে হয়েছে। লক্ষণীয়, ওইসব প্রকল্প-অর্থের একটা বড়ো অংশ তাই ব্যয় করা হয়েছে নারী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অথবা নারীকে যাতে পুনর্বাসিত করা যায়, সেই লক্ষ্যে। এ প্রসঙ্গে আমরা যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, নানা ধরনের সেচ প্রকল্প ইত্যাদির কথা উল্লেখ করতে পারি। একজন গবেষক বলেছেন যে

জাতীয় বাজেটের ০.৩ শতাংশ বিশেষভাবে নারী উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় (হোয়াইট ১৯৯২)। অন্য আরেক গবেষকের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন প্রকল্পের অধিকাংশই গ্রহণ করা হয়েছে গ্রামের দরিদ্র নারীদের উন্নয়নের জন্য (গোয়েৎজ ১৯৯৩)। তারা যাতে খাদ্যাভাবে না পড়ে কিংবা অভুক্ত না থাকে প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য থাকে সেই সংকট মোচনের।

দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়া কিংবা নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ফলে বেঁচে থাকার জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে ক্রমশ বাইরের জনজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে ঘরের কাজ ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৪৩ শতাংশ নারী কৃষিকাজকে প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছেন; ১৫ শতাংশ গ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় কর্মক্ষেত্র হিসেবে। পণ্য উৎপাদন খাতের ৩৮ শতাংশ শ্রমিক আবার নারী। শিল্পখাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৮ শতাংশ; তবে গ্রামীণ বস্ত্রখাতে মোট শ্রমশক্তির ৪৪ শতাংশ নারী। এত বিপুল অবদান সত্ত্বেও দুঃখজনক হচ্ছে রাষ্ট্র এখনও নারীর এসব কাজকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেয়নি; রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সঙ্গে এসব নারীকে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান বা দক্ষতা উন্নয়নের কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি (বিশ্বব্যাংক ১৯৯০)। নারীর কাজকে এখনো অবসর সময়ের কাজ বলেই আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবারের প্রধান অভিভাবক হচ্ছেন নারী; তাদের আয়েই সেইসব সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয় (ইউএনডিপি ১৯৯৪)। গবেষকগণ তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্র বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান পাওয়ার জন্য নারী ইস্যুকে ব্যবহার করে ঠিকই, কিন্তু তাদের জন্য বাজেট বা উন্নয়ন বরাদ্দ থাকে নামমাত্র। এর মূল কারণ হলো সেই পিতৃতন্ত্র; পুরুষই বাংলাদেশে পেশাগত, রাজনৈতিক বা জনজীবনের সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। অন্যদিকে নারী রয়ে গেছে কিছুটা নেপথ্যে, নিস্পৃহ ভূমিকায়। সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে তার উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে (গোয়েৎজ ১৯৯৩ : ৫, সিদ্দিকী ১৫৬)।

উন্নয়নের সঙ্গে জেন্ডার-রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অবশ্য আরও গতি পায় ১৯৯৫ সালের জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর। এই রিপোর্টের মুখবন্ধে সুস্পষ্ট করে বলা হয়, মানবের অংশ হিসেবে নারী হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা অপরিহার্য পক্ষ। কিন্তু নারীকে উন্নয়নের ধারায় আনতে হলে প্রয়োজন নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে জেন্ডারের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করে এই লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই তা অর্জন করতে হবে। এজন্যে যা করতে হবে তা হলো নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে। এই ক্ষমতায়ন ঘটাতে হলে আবার প্রয়োজন পড়বে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন অধিকার—যেমন আইনগত, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বাধাগুলো কাটিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে সমতার আদর্শ স্থাপন করা (ইউএনডিপি ১৯৯৫)।

পশ্চিমের উন্নত দেশগুলো, এখানে বলাবাহুল্য, জেন্ডার-সম্পর্কে মাঝে মাঝে স্ববিরোধী ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। উদারনৈতিক শিল্পোন্নত দেশগুলো আমাদের ঋণ দেওয়ার সময় জেন্ডারকে সম্পৃক্ত করার শর্ত জুড়ে দেয়। আবার দেখা যায় বিদেশী পুঁজি খাটিয়ে এদেশে যেসব শিল্প, বিশেষ করে যে গার্মেন্টিস শিল্প গড়ে উঠেছে, আমাদের নারীদের সেখানে স্বল্প মজুরিতে নিয়োগ করে শুষে নেয়া হচ্ছে উদ্বৃত্ত মুনাফা। কোনো কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় তৎপরতা। আবার গার্মেন্টিস শিল্পে কাজের পরিবেশ ভালো কিনা সে ব্যাপারেও তারা আগ্রহ প্রকাশ করছে। শিশুশ্রম যাতে এতে ব্যবহৃত না হয়, সে ব্যাপারেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে তাদের। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গার্মেন্টিস শিল্পকারখানায় নারীদেব জন্য কাজের যথাযথ পরিবেশ রক্ষার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু মজুরির পরিমাণ বেড়ে যাবে বলে বাংলাদেশ সরকার নারী গার্মেন্টিস শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থার এক গবেষণা থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উল্লিখিত দাবির কারণে একসময় পণ্য উৎপাদন করে এরকম শিল্পকারখানাগুলোর নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৯০ শতাংশ থেকে ৮২ শতাংশ কমে গেছে (পাল ১৯৯১)।

সরকারের অভিমত অনুসারে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা। এই সমস্যার কারণে জাতীয় উন্নয়ন মারত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তাই এই রাষ্ট্রের একটা প্রধান কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকার জনসংখ্যা রোধের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে নারী। নারীকেই রাষ্ট্র জন্মনিয়ন্ত্রণের যত রকম উপকরণ বা পদ্ধতি রয়েছে, সে সবের প্রায় সবকিছুই নারীর ব্যবহারের জন্য তৈরি বা প্রবর্তন করা হয়েছে। পুরুষকে রাখা হচ্ছে এসবের ব্যবহারের বাইরে। যেমন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে খাবার বড়ি ব্যবহারকারীর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল মোট ব্যবহারকারীর প্রায় অর্ধেক; আর নারীই ছিল এই পদ্ধতির একমাত্র ব্যবহারকারী। খাবার বড়ি ব্যবহারের তুলনায় কনডম ব্যবহারকারী পুরুষের সংখ্যা ধরা হয়েছিল অনেক কম—মাত্র ৪ শতাংশ (বেগম ১৯৯৮ : ৮৬); সরকারের পরিকল্পনাতেই জেন্ডার বৈষম্য তাই সুস্পষ্ট।

এখানেও লক্ষণীয়, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে টাকা ঢালে প্রধানত দাতা দেশগুলো। কিন্তু এর ফলে নারীর স্বাস্থ্য বা প্রজনন ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা হয়, সে ব্যাপারে তারা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করে না একেবারেই। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি (হক ১৯৯৩)। কিন্তু রাষ্ট্র পুরুষকে নয়, নারীকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাধ্য করছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে। নারীর আবার নিজের সন্তান উৎপাদনের ওপর কোনো অধিকার নেই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশে নারীর গর্ভপাতের অধিকার এখনও স্বীকার করে

নেওয়া হয়নি। অনেকে তাই যথার্থই লক্ষ করেছেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ বা সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্পষ্টতই পুরুষের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে চলেছে। ফলে এটা একটা নারী ইস্যু হয়ে উঠেছে (জাহান ১৯৮৯)। রাষ্ট্র নারীর জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার প্রায় অর্ধেকই ছিল পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচি (সিদ্দিকী ১৯৯৮ : ১৫৮); আর এসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানত রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অধীনে।

রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কিংবা নীতিনির্ধারণের দিকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ১৯৭৫ সাল থেকে জেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এর মূল কারণ হলো, এই সময় থেকে বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নারীর ওপর গুরুত্বারোপ করার কথা বলা হচ্ছিল, গ্রহণ করা হচ্ছিল নানা পদক্ষেপ। দাতা দেশগুলো অনুদান দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসে। এই সময় থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে নারী উন্নয়নের প্রসঙ্গটি তাই বিশেষভাবে স্থান করে নিতে থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানে (আর্টিকেল ২৮, ২৯, ৬৬ ও ১২২) অবশ্য আগেই নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৩০। প্রাথমিকভাবে এই সংরক্ষণের মেয়াদ ছিল ১০ বছরের জন্য, পরে তা করা হয় ১৫ বছর। ১৯৭৭ সালে নারীকে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা/থানা পরিষদ, পৌরসভা) ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়। ওই একই সময়ে সরকারি চাকরির কর্মকর্তা পদের ২০ শতাংশ এবং কর্মচারি পদের ১৫ শতাংশ নারীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পদ নারীর দ্বারা পূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

শুধু এসব পদক্ষেপ নয়, নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র গত তিন দশকে গ্রহণ করেছে নানা পদক্ষেপ ও কর্মসূচি। ১৯৭৪ সালে প্রবর্তন করা হয় মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রিকরণ) আইন, ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন। নারী সহিংসতা রোধের জন্য ১৯৮৩ সালে জারি করা হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তন শাস্তি) অধ্যাদেশ। নারীর তালাক পাওয়ার পথ সহজতর করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে জারি করা হয় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধের লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। নারী ও শিশুর ওপর অত্যাচার চালানো হলে এই আইনে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

এইসব আইন প্রণয়ন থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানগুলোতে নারীকে স্থান করে দেয়ার মধ্যদিয়ে জেন্ডার-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সূচনা করতে চেয়েছে ইতিবাচক পরিবর্তনের। প্রত্যাশা করা হয়েছে যে সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এভাবেই নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আসবে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসন কিংবা নারী উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, সে-সবের বেশিরভাগই করা হয়েছে দাতা দেশগুলোর

নির্দেশে বা পরামর্শে বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া যাবে সেই প্রত্যাশায়। এর পরিণাম হিসেবে আসলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়তো কিছুটা হলেও তরান্বিত হয়েছে, নারী তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হলো, রাষ্ট্রশাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা আরও ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছেন (সিদ্দিকী ১৯৯৮ : ১৫৯)। যেমন নারীর জন্য সংসদে যেসব আসন সংরক্ষিত রাখা হয়, তার দ্বারা সংসদে যারা বেশিরভাগ আসন পেয়েছিল তারাই সেগুলো দখল করে আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। এখন তো এই আসনগুলো একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সংসদে এখন নারীর তেমন কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, যদিও প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী দুজনেই নারী। নারী সংগঠনগুলো ওই আসনগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে থেকেই নারী প্রতিনিধিত্বের জন্য সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে, তবু বর্তমান সরকারের আইনমন্ত্রী সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। অবশ্য আইন প্রণয়ন করলেও যে এই সংসদের মেয়াদকালে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যাবে, তাও নয়। আসলে অষ্টম সংসদে বর্তমান সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলেই তারা এখন (২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা ভাবছে না, তাদের ভাবতে হচ্ছে না। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে কতজন নারী জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন সেই পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণি : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ

বছর	জাতীয় সংসদে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী নারী প্রার্থীর হার	সাধারণ নির্বাচনে জয়ী নারীর সংখ্যা	উপনির্বাচনে জয়ী নারীর সংখ্যা	নির্বাচিত মোট নারীর সংখ্যা	সংসদে নারী সদস্যের হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	০.০
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	০.৭
১৯৮৬	১.৩	৩	২	৫	১.৭
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	১.৩
১৯৯১	১.৩	৮*	১	৫	১.৭
১৯৯৬	১.৩	১১*	২	৭	৩.৭

উৎস : সুলতানা, আবেদা (২০০২)
উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সংখ্যা ২৪, ২০০১

*খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন, পরে একটি করে আসন রেখে অন্যগুলো ছেড়ে দেন।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, সংরক্ষিত আসনগুলোর কথা বাদ দিলে বাংলাদেশের সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব কোনো সময়েই উল্লেখ করার মতো ছিল না।

সংসদে সবচেয়ে বেশি নারী নির্বাচিত হয়েছেন ১৯৮৬ এবং ১৯৯১ সালে। তাও মোট আসন সংখ্যার বিচারে নারী সাংসদদের হার ছিল মাত্র ১.৭ শতাংশ। উপনির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারাও নির্বাচিত হয়েছে আত্মীয়তার সূত্রে ছেড়ে দেওয়া আসনে কিংবা কম ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপদ আসনে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছে। ১৯৭৯ ও ১৯৯২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেশ কজন নারী চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই ছিল স্বামী বা কোনো পুরুষ আত্মীয়ের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও পটভূমি। পৌর নির্বাচনে অবশ্য একটিমাত্র ব্যতিক্রম (ব্যতিক্রমটি নারায়ণগঞ্জের সদ্য পৌর নির্বাচনের) ছাড়া কোনো মহিলাই পৌরপ্রধান, অর্থাৎ চেয়ারপারসন নির্বাচিত হতে পারেননি। যে ব্যতিক্রমটির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো তাতেও দেখা যায়, পিতার সুনাম ও প্রতিপত্তির সূত্র ধরেই তিনি নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারপারসন নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন, তিনি নিজেও একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা চিকিৎসক। জনসেবার ব্রত নিয়েই রাজনীতিতে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই অবতীর্ণ হয়েছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। তার নিজের যোগ্যতাকেও তাই খাটো করে দেখা যাবে না।

সারণি : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত চেয়ারপারসন

সাল	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	নারী প্রার্থীরা সংখ্যা	নির্বাচিত নারী চেয়ারপারসনের সংখ্যা
১৯৭৩	৪৩৫২	তথ্য পাওয়া যায়নি	০১
১৯৭৭	৪৩৫২	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৪
১৯৮৪	৪৪০০	তথ্য পাওয়া যায়নি	০৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	০১
১৯৯২	৪৪৫০	১১৫	১২

সূত্র : ইউএনডিপি, পৃষ্ঠা ৩১

সিটি করপোরেশন নির্বাচনের অবস্থাটি আরও হতাশাজনক। এখনও পর্যন্ত কেউ কোনো সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তবে ঢাকা সিটি করপোরেশনের গত নির্বাচনে বেশ কয়েকজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাও আবার সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত স্বামীর আসনেই নির্বাচিত হয়েছেন। এসব আসনের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায়, আত্মীয় পুরুষের উত্তরাধিকার হিসেবেই মহিলা ওয়ার্ড কমিশনাররা নির্বাচিত হয়েছেন। তবে এসব নারী যে পুরুষের তুলনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী, সেকথা বলা যাবে না। আসলে নারীও যে রাজনৈতিক দায়িত্ব পেলে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন, জাতীয় রাজনীতির দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।

১৯৯১ এবং ২০০১ সালের দুই সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যদিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রীর আসন দুটি তাদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের জন্যই ঘুরেফিরে অর্জন করেছেন দুজন নারী—খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা। দুজনই আবার একটা অবৈধ সামরিক শাসককে উৎখাত করার সুবাদে দেশে-বিদেশে নন্দিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতা অর্জন এটা নির্দেশ করে না যে বাংলাদেশ সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব কিংবা ক্ষমতায়ন উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। আসলে তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনীতিতে এসেছেন। এই আসাটাও আবার ঘটেছে অনেকটা আকস্মিকভাবে, দলীয় সংকটের মুহূর্তে দলকে উদ্ধার করার জন্যই জাতীয় রাজনীতিতে তাদের পদার্পণ ঘটে। শেখ হাসিনা তার পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বরিত হন; আর খালেদা জিয়া রাজনীতিতে এসেছেন স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ধারকর্ত্রী হিসেবে। দুজনেই একসময় ছিলেন গৃহবধূ, কিন্তু দুজনেই এখন তাদের দলের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠেছেন, যাদের বিকল্প আছে বলে সাধারণ মানুষ এখনও ভাবতে পারছে না। এই তথ্য থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুরুষ নেতৃত্বের উত্তরাধিকার হিসেবেই শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে। ফলে এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে বলা যাবে না। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন, এই দুই নেত্রী রাজনীতিতে যে অদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা নয়। বরং নানা মতাদর্শের বিপুল কর্মীবাহিনী ও পুরুষ নেতাদের তারা একটি স্রোতধারায় অবিচ্ছিন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের দলকে বড়ো ধরনের কোনো ভাঙনের মুখে পড়তে দেননি। বরং একথা বললে ভুল হবে না যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের নেতৃত্বেই দ্বিদলীয় এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় পাকাপোক্ত হতে চলেছে।

তবে এও সত্যি যে, সরকারপ্রধান বা বিরোধীদলীয় প্রধান হওয়া সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ন বা সার্বিক উন্নয়নের জন্য তারা খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। এরও মূলে রয়েছে সেই পিতৃতন্ত্র, অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের কারণেই বাংলাদেশের নারীদের অধস্তনতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের সনাতন বা বিরাজমান অবস্থার কোনো গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। তাদের ব্যর্থতা এখানেই। অথচ প্রতিটি রজনৈতিক দলের রয়েছে নিজস্ব মহিলা অঙ্গসংগঠন। তবে সাধারণভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই সংগঠনগুলো মূলধারার রাজনীতিকে তেমন একটা প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং তারা মূল রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মসূচি সফল করার ব্যাপারেই কাজ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদিও তাদের নির্বাচনী ইশতেহার কিংবা নানা সময়ে দেওয়া বক্তব্যে নারী পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কোনো দলই আজ অব্দি গ্রহণ করেনি। জেন্ডার সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সংযোজনের ক্ষেত্রে এই অঙ্গসংগঠনগুলোর অবদান তাই প্রায় শূন্য বলা যায়। বাম রাজনৈতিক দলগুলো নারীর অধস্তন অবস্থাকে শ্রেণীসংগ্রামের অংশ

হিসেবে বিবেচনা করেছে, আর জামায়াতে ইসলামী প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী।

রাজনৈতিক মহিলা সংগঠনগুলোকে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হয় নির্বাচনের সময়। জনসভায় অংশগ্রহণ, মিছিল, র‍্যালি ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এর সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ প্রদানের জন্য তাদের সেইভাবে বিবেচনায় আনা হয় না। পুরুষের পাশাপাশি পার্টির পরিচালনা পরিষদে তাদের স্থান সংকুলান হয় না। আসলে নারী ভোটারদের ভোট নিশ্চিত করার জন্যই মহিলা অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করে। অর্থ আর পেশীশক্তির দিক থেকে আমাদের নারীরা পিছিয়ে আছে, ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় সদস্যপদ দিতে চায় না। একই কারণে নির্বাচনে তাদের আবার প্রার্থীও করা হয় না। সরকারি কর্মকাণ্ডে তাই পুরুষেরই প্রাধান্য। নারীর অংশগ্রহণ তাতে একবারেই অনুল্লেখযোগ্য বলা যায়। দলীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ যে খুবই সীমিত, সারণিতে উল্লিখিত নারী মন্ত্রীদের সংখ্যা ও হার দেখলেই তা বোঝা যাবে।

সারণি : মন্ত্রিপরিষদে নারী

বছর	মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা	মন্ত্রিপরিষদে মহিলা
১৯৯১	৩৯	প্রধানমন্ত্রী ১ প্রতিমন্ত্রী ১ মন্ত্রী ০
১৯৯৬	৩৮	প্রধানমন্ত্রী ১ মন্ত্রী ১ প্রতিমন্ত্রী

সূত্র : হোসেন, শওকত আরা (১৯৯৮)
উন্নয়ন পদক্ষেপ. স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সংখ্যা ২৪, ২০০১

শুধু দলীয় সরকারে নয়, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ করে সরকারি উচ্চপদে, যে-পদে অধিষ্ঠিত হলে একজন কর্মকর্তা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, তাতে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারি সকল পদে নারীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সংক্ষরণ সত্ত্বেও সরকারি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীর সংখ্যা প্রভাব সৃষ্টির স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। এখানে সংযোজিত সারণি থেকেই তা বোঝা যাবে।

সারণি : প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী

পদ	মোট	পুরুষ	মহিলা	শতকরা হার
সচিব	৪৯	৪৮	০১	২.১
অতিরিক্ত সচিব	৫৫	৫৪	০১	২.০
যুগ্ম সচিব	২৭৫	২৭১	০৫	১.৫
উপসচিব	৬৫৯	৫৫২	০৭	১.১
সিনিয়র সহকারী সচিব	২২১৪	২০১৪	২০০	৯.০
সহকারী সচিব	১১১৭	৯৫৭	১৬০	১৪.৩
মোট	৪৩৬৯	৩৯৯৬	৩৭৩	৮.৫

সূত্র : সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ২০০০

এই সারণি থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক নিয়োগের স্তরে অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা যত বেশি, উঁচু পদে তাদের সংখ্যা তত বেশি নয়। আসলে রাষ্ট্র তার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নারীকে প্রবেশের সুযোগ করে দিলেও পদোন্নতি দেওয়ার সময় নারীকে সেইভাবে বিচেনায় আনেনি। ফলে তারা উঁচু নীতিনির্ধারণী পদ লাভ করতে পারেনি। এই তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে যারা কাজ করেন বা গবেষণা করেন তারা দেখিয়েছেন, কোনো ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্বশীলতার হার যদি ৩০-এর বেশি হয়, তাহলে তারা সেই ক্ষেত্রে নিজেদের মতামতের অনুকূলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রশাসনিক পদের যে ছবি এখানে পাচ্ছি তাতে দেখা যায়, নারীর সার্বিক প্রতিনিধিত্বশীলতার হার মাত্র ৮.৫ শতাংশ। অন্যান্য কিছু পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৯০ সাল পর্যন্ত নারীর জন্য সংরক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারি পদের পূরণ হয়েছিল যথাক্রমে ১১ এবং ৪ শতাংশ (বিশ্বব্যাংক ১৯৯০)। আর প্রাথমিক শিক্ষক পদের অর্ধেক মহিলাদের দ্বারা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ১৯৯০ সালে এই পদে মহিলাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ শতাংশ (বিবিএস ১৯৯৩, ইউনিসেফ ১৯৯২)।

ফলে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, কোনো স্তরেই নারীর প্রতিনিধিত্বশীলতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কখনই উল্লেখ করার মতো স্তরে উন্নীত হয়নি। নিচের দিকের সংরক্ষিত পদগুলো মহিলাদের দ্বারা পূরণ হয়ে গেলেও, উঁচু পদে তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে তারা কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। রাষ্ট্র এই অবস্থা পরিবর্তনের যে পদক্ষেপ নেবে, তাও দৃশ্যমান নয়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবেই পুরুষের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থেকে যাচ্ছে। নারীরা এসব পদের প্রাথমিক স্তরে নিয়োগ পেলেও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে তাদের সংখ্যা খুবই কম—একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য বলা যায়।

আসলে পারিবারিক-সামাজিক জীবনের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করবার ফলে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে, নারীর অগ্রগতি যতটা হওয়ার কথা ততটা হচ্ছে না। নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে—বৈবাহিক আইন, তালাক, সন্তান সংরক্ষণের অধিকার, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের ওপর অধিকার ইত্যাদি। রাষ্ট্র যদি সত্যিকার অর্থেই জেন্ডারসমতা আনতে চায় তাহলে উল্লিখিত ক্ষেত্রে যে ধরনের আইন প্রচলিত রয়েছে সেই আইনগুলোর সংশোধনী আনা আবশ্যক। কিন্তু এটা না করে ধর্মীয় আইনের ওপর প্রায় সবকিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এ প্রসঙ্গে হিন্দু আইন এবং শরিয়া আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দু নারীদের পিতামাতার সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার নেই। ইসলামি আইন অনুযায়ী মুসলমান নারীদেরও ভাইদের মতো পিতামাতার সম্পত্তির ওপর সমান অধিকার থাকে না। নারীর বহুবিবাহ আইনসিদ্ধ নয়, অথচ পুরুষের বহুবিবাহ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হলেও নিষিদ্ধ নয়। তালাক বা বিচ্ছেদের পর সন্তানকে কাছে রাখার অধিকার একটা নির্দিষ্ট বয়স (ছেলের ক্ষেত্রে ৭ বছর, মেয়ের ক্ষেত্রে ১২ বছর) পর্যন্ত স্ত্রীর থাকলেও স্বামী পরবর্তী বছরগুলোর জন্য সন্তানকে কাছে রাখার সম্পূর্ণ অধিকার পেয়ে গেছে। শরিয়তি আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের (CEDAW) সবগুলো ধারা অনুসরণ না করার শর্তে স্বাক্ষর দান করেছে। এই সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, ধর্মের কারণেই নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সনদ পুরোপুরি অনুসরণের অঙ্গীকার বাংলাদেশ করেনি। বলা হয়, স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিধান হওয়ার জন্যই নাকি ওই শরিয়তি আইন অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় অবস্থান নেয় তাহলে এই বিধান অনুসরণ না করলেও চলে। আইয়ুবি আমলে এভাবেই বহুবিবাহের প্রবণতাকে সীমিত করে দিয়ে ১৯৬১ সালে বিবাহ আইন সংস্কার করা হয়েছিল। ভারতের হিন্দু নারীরা এখন সে দেশের সাধারণ আইন অনুসারে ছেলে সন্তানের মতোই বাবা-মায়ের সম্পত্তির সমান অংশীদার। এখানে যে কথাটি বলবার তা হলো, দুর্বল রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে জেন্ডার-সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা বাংলাদেশ কখনও প্রকাশ করেনি; সেই চেষ্টাও তাদের নেই। নারীর জন্য যেসব নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো করা হয়েছে মূলত শাসকশ্রেণীর শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত বা নিরঙ্কুশ বা নিষ্কণ্টক করবার জন্য। এমনকি নারীর নিরাপত্তা বা সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের যেসব আইন রয়েছে বা করা হয়েছে, সেগুলোও নারীর স্বাভাবিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাকে সংকুচিত করে দিয়েছে।

আসলে জেন্ডার-সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে আছে। তারা যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই জেন্ডার-সম্পর্ক গঠিত হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্র নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার জন্য যেসব নীতি গ্রহণ করেছে বা পদক্ষেপ নিয়েছে, সে সবের সার্থক বাস্তবায়নও নির্ভর করতো রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছা এবং কর্মতৎপরতার ওপর। গবেষকগণ দেখেছেন,

রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো নারীর জন্য গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার বা আইন প্রয়োগ করার খুব কম আগ্রহ দেখিয়েছে। যেমন দেশে যৌতুকবিরোধী বা নারী নির্যাতন বিরোধী আইন রয়েছে, কিন্তু সেই আইনের কোনো কার্যকর প্রয়োগ দেখা যায় না (সিদ্দিকী ১৯৯৮ : ১৬৪)। সরকারের এক পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যায়, প্রতি ১০০০ নারীর ৬৭ জনই অস্বাভাবিক ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ : ২৮)। আসলে রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ে যেসব সরকারি কর্মকর্তা কাজ করেন, তাদের হয় নারীর মানবাধিকার সম্পর্কে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই, অথবা তারা আইন প্রয়োগের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান নন। পুলিশও নারী নির্যাতনকে একটা পারিবারিক (স্বামী-স্ত্রী) কলহ মনে করে ওই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে উৎসাহী হয় না। নারীর যৌনবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এবং নারী পাচার রোধ করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করেছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, আইনরক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় যৌনকর্মীরা তাদের বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পুলিশ এবং সীমান্তরক্ষীরা নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত। এসব দৃষ্টান্ত অনুসারে তাই বলা যায়, রাষ্ট্র বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, আইন প্রণয়ন করেছে; কিন্তু যারা সেসব বাস্তবায়িত করবে তাদের ওপর সরকারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা যাচ্ছে না। আজকাল তো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যারা আইনের রক্ষক, তারাই তার ভক্ষক হয়ে উঠছে; আইন রক্ষার নামে পুলিশই আইন ভাঙছে।

উল্লিখিত অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে দৃষ্টি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ওপর নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রই মূলত জেন্ডার-সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক বা মতাদর্শিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এখনও সে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কিন্তু রাষ্ট্র যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই কাজটি করছে তা নয়। বরং এই জেন্ডার-সম্পর্ক পরিবর্তনের ব্যাপারে দেশের নারী সংগঠনগুলোর অবদান আরও বেশি। তারাই বিভিন্ন সময়ে সরকার বা নীতিনির্ধাকরদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বৈষম্যবিরোধী বা নারী নির্যাতনবিরোধী আইন এবং কর্মসূচি গ্রহণে রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে। ১৯৯০ সালের এক হিসেব অনুসারে বাংলাদেশে ছশোর মতো নারী সংগঠন ছিল, যাদের সদস্য সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি (জাহান ১৯৯০ : ২৩১)। একদশক পর এই শতাব্দীর শুরুতে এই সংখ্যা উভয় দিক থেকে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা যায়। জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ (১৯৭৫) এবং আন্তর্জাতিক নারী দশক (১৯৭৬-৮৫) ঘোষণা করা এবং নারী উন্নয়নের জন্য দাতা দেশগুলো কর্তৃক অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বাংলাদেশে নারী সংগঠনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হয়।

বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলোকে দায়বদ্ধতা এবং কাজের প্রকৃতি অনুসারে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় : রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, রাজনৈতিক দলের মহিলা অঙ্গসংগঠন এবং নারীস্বার্থ রক্ষাকারী সক্রিয় সংগঠন (সিদ্দিকী

১৯৯৮ : ১৬৫)। রাষ্ট্র পরিচালিত সংগঠনের অন্যতম হচ্ছে জাতীয় মহিলা সংস্থা। সরকারি ও বেসরকারি নারী সংগঠনগুলোর নানা ধরনের কাজকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে যে ধরনের জেন্ডারবৈষম্য বিরাজ করছে, সেই বৈষম্যকে সনাক্ত করা এবং তা দূর করার জন্য কী কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করা। আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যাপারেও এই সংস্থাটি সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। যেহেতু এর পরিচালনা পর্ষদটি সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত, ফলে এই সংস্থাটি জেন্ডার উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরং রাষ্ট্রের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচিকেই তারা সমর্থন করে গেছে। বিভিন্ন সরকার একে নিজেদের নীতি বাস্তবায়নের স্বার্থেই ব্যবহার করেছে। সরকার পরিচালিত আরও দুটি সংস্থা বাংলাদেশ গ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং স্বনির্ভর বাংলাদেশ গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করে। এ দুটি সংস্থার কাজ হচ্ছে গ্রামীণ নারীদের তাদের সংস্থার ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং ঋণ সুবিধা দেওয়া। তবে সরকারি মহিলা সংস্থাগুলোর তুলনায় বেসরকারি নারী সংগঠনগুলোই জেন্ডার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার কর্মতৎপরতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশে এক নতুন ধরনের সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। এখনকার পরিভাষায় যাকে বাংলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, ইংরেজিতে নন-গভর্নমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন বা এনজিও বলা হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের কাজ দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও এই সংগঠনগুলো বর্তমানে উন্নয়ন কাজে নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে। শহরের ও গ্রামের, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের কিংবা পিছিয়ে পড়া নারী ও শিশুদের উন্নয়নে তারা কাজ করে। এরকমই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, প্রশিকা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, নিজেরা করি, বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক), অ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (আশা), সপ্তগ্রাম মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনোটি শুধু জেন্ডারের ওপর কাজ করে, কোনোটি আবার দরিদ্র বা প্রান্তিক নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই কাজ করে। নব্বই দশকের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ১ কোটি নারী-পুরুষকে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অধীনে নিয়ে এসেছিল বলে দাবি করেছে। গ্রামীণ নারীর জীবনে কিছুটা হলেও তারা গুণগত পরিবর্তন আনতে পেরেছে বলে গবেষকদের ধারণা। তারা যেসব বিষয়ে সাফল্য পেয়েছে বলে মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে গণবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি, পর্দাপ্রথার কঠোরতা কমিয়ে আনা, অনাকাঙ্ক্ষিত তালাক প্রবণতা রোধ, বহুবিবাহ নিবারণ, ঘরোয়া নারীনির্যাতন, বৈষম্যমূলক মজুরি প্রদান, নারীর আয়বৃদ্ধি, নারীর কাজের স্বীকৃতি, নারীর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ইত্যাদি। কখনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়, কখনো স্থানীয় শক্তিশালী গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়ে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করে

তারা জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করে গেছে। এসব কাজ করতে গিয়ে কোনো কোনো সময় তাদের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর আক্রমণেরও শিকার হতে হয়েছে। রাষ্ট্র এরকম ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত এনজিওদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। আমাদের ধারণা মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো এই কাজ করেছে বলেই রাষ্ট্র শক্ত হাতে আক্রমণকারীদের দমন করেনি। আসলে রাষ্ট্র সবসময় ধর্মীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডকে স্পর্শকাতর বিষয় বলে মনে করে, আর সেজন্যই তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। এসব কারণেই অনেক সময় দেখা যায়, ধর্মীয় নেতারা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য যেমন রাষ্ট্রপ্রধানকে ছাপিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে উঠেছেন, তেমনি তাদের ধর্মীয় দলগুলোও রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে রাষ্ট্রের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে জেন্ডার-সম্পর্ক যে উন্নত হওয়ার কথা নয়, তা বলাই বাহুল্য।

নারীস্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় সংগঠনগুলো অবশ্য এতে হতোদ্যম হয়ে পড়েনি। বরং তারা নারীর জন্য গঠনমূলক সুপারিশ প্রণয়ন করে, আন্দোলন করে জেন্ডারবৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করাকেই একমাত্র কাজ বলে তারা মনে করে না; নিজেরাও জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নারীকেও সহায়তা দেয়। এই সংগঠনগুলো যেসব বিষয়ে সহায়তা দেয় সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য, আইন, মানবাধিকার ইত্যাদি। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, নারীপক্ষ, উবিনিগ, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সংস্থা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নারীদের এভাবে নিরন্তর সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সংস্থাগুলোর প্রধান কাজ হচ্ছে চাপপ্রয়োগকারী (প্রেসারগ্রুপ) সংস্থা হিসেবে জেন্ডার উন্নয়নের জন্য রষ্ট্রের উপর চাপ করে যাওয়া। নারীর সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য তারা যেমন গবেষণা করে, তেমনি সেই সব সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করা যায়, তারও পথও খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। তবে নারী সংগঠনগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে তা হলো জনমত সৃষ্টি। সাধারণত প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্যদিয়েই তারা এই কাজটি করে। এজন্য জনসমাজ (সিভিল সোসাইটি) ও গণমাধ্যমের সহায়তাও তারা নেয়।

নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলন করতে গিয়ে কখনও কখনও তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। শুধু নারী ইস্যু নয়, দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরকমই একটা ঘটনা হচ্ছে ১৯৮৮ সালে নারীপক্ষের এরশাদ প্রণীত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিল-এর বিরুদ্ধে রিট আবেদন জানানো। বাম রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া ভোট হারানোর ভয়ে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল যখন এই বিলের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল, ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো ভেতরে ভেতরে উল্লসিত, ঠিক তখনই নারীপক্ষ এই রিট আবেদন জানায়। জানায় এই আশঙ্কায় যে, বিলটিকে তারা মনে করেছে নারীবিরোধী, সংখ্যালঘুবিরোধী। রিটের পক্ষে নারীপক্ষের যুক্তি ছিল এই যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলে এদেশে যারা কোরানকে

সকল আইনের ভিত্তি বলে মনে করেন, তাদের হাতই শক্তিশালী হবে। নারীর মানবাধিকার রক্ষিত হবে না, আইনি সমানাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিলটি অবশ্য পরে আইনে পরিণত হয়েছে, কিন্তু নারীপক্ষ যে রিট করেছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে।

উবিনিগও নারী স্বার্থরক্ষার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিবার পরিকল্পনা কিংবা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার। তাদের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা নীতি নারীর স্বাস্থ্যকে অগ্রাহ্য করে আসছে, নারীকেই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করছে।

বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো অবশ্য শুধু এককভাবে নয়, সম্মিলিতভাবে নানা আন্দোলন করেছে। এই লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন নারী সংগঠনকে নিয়ে ১৯৯০ সালে গঠন করে একটি জোট—ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ। এই জোট দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমবারের মতো জেন্ডারভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ১৭ দফা দাবি জানায়। পরে প্রবল গণআন্দোলনে মুখে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ নারী সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্যের কারণে জেন্ডারকেন্দ্রিক ১৭ দফার আন্দোলনকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তবে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেই ব্যাপারটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে।

কোনো দেশের জেন্ডার-সম্পর্ক কী দাঁড়াবে তা মূলত নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের চরিত্র, গৃহীত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা এবং সেইসব নীতি বাস্তবায়নের ওপর। এসব দিক থেকে বিবেচনা করলে মতাদর্শিক স্তর এবং কর্মস্তর উভয় দিক থেকেই রাষ্ট্রকে জেন্ডার প্রসঙ্গের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হয় (ইউএনডিপি ১৯৯৫)। এই প্রবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এর রাষ্ট্রীয় চরিত্র কী দাঁড়িয়েছে, মতাদর্শিকভাবে দেশ কোন দিকে ঝুঁকেছে, মতাদর্শিক সংকটই-বা কী, সেসব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন শাসক বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নানা ধরনের মতবাদ গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো শাসক নতুন মতাদর্শের জন্ম দিয়েছেন; কেউ আবার পুরনো মতবাদকে গ্রহণ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন। ফলে যে চার মূলনীতির ওপর বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তা থেকে তারা অনেক সরে এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মই ছিল এই সময়ের প্রধান দুই মতাদর্শ যে মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র শাসিত হয়েছে।

পুনরুল্লেখ হলেও বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীনতার সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক তাদের অবদান স্বীকৃত হয়নি। তবু স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যদিয়েই এদেশের নারীরা অন্তঃপুর ছেড়ে প্রথম বাইরের জগতে পা রাখে। নারী যে পুরুষের সমতুল্য, তাদের ভেতর জন্ম নেয় এই বোধ। ধর্মের সঙ্গে আধুনিকতার

সংঘাতও দেখা দেয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই সময়ের আরেকটি বাস্তবতা। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পথ ধরে ধর্ম এ সময়ে আবার রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। বিভিন্ন শাসক আসলে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যই ধর্মকে ব্যবহার করে। লক্ষণীয় ধর্মের এই স্বার্থকেন্দ্রিক ব্যবহার জেন্ডার-সম্পর্ককে বন্ধুত্বপূর্ণ না করে জটিল করে তুলেছে। কিন্তু গত তিন দশক যেহেতু ছিল জাতিরাষ্ট্রের উত্থানের কাল, ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়েছে। বাস্তবায়িত করতে হয়েছে জেন্ডারসুসহ বিভিন্ন কর্মসূচি। আমাদের নারীসমাজও ছিল এই সম্পর্ক উন্নয়নে সমান সোচ্চার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতা দেশগুলোও জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের সাহায্য করেছে।

জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করা হয়েছে। ডানপন্থী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকেই এই বাধা এসেছে সবচেয়ে বেশি। নারী যাতে ঘরের বাইরে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, সমঅধিকারের প্রশ্ন না তোলে, জেন্ডার সমতার দিকে এগিয়ে যেতে সমর্থ না হয়, সেজন্যই ধর্মভিত্তিক দলগুলো সোচ্চার ছিল। কোনো কোনো জায়গায় তারা নারী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ওপর আক্রমণও চালিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডেও জেন্ডার সমতার বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। আমরা দেখেছি, গত তিন দশকে উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তার বেশিরভাগই ছিল পুরুষকেন্দ্রিক; নারী ইস্যুগুলোকে ওই কর্মকাণ্ডে সেইভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ছিল। বর্ষপরিক্রমায় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। বেড়েছে রাজনৈতিক দলগুলোতে তাদের সংখ্যাও। কিন্তু সরকারে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল না। সরকারপ্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দুজনই মহিলা—তবু পুরুষপ্রাধান্যের কারণে জেন্ডারের অনুকূলে মৌলিক পরিবর্তন আসতে পরে, এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নীতিনির্ধারণ স্তরেই নারীর উপস্থিতি ছিল কম। সরকারের উঁচু পদগুলোতেও নারীর প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ফলে নীতিনির্ধারণে নারী ভূমিকা রাখতে পারেনি, জেন্ডারসম্পর্ক তাই যে আরও উন্নত হবে সে সুযোগ নারীরা তৈরি করতে পারেনি। সরকারের এবং নীতিনির্ধারণ স্তরে পুরুষপ্রাধান্যের কারণেই এমনটা ঘটেছে। রাষ্ট্রের তৃণমূল পর্যায়ের ছবিটিও ছিল হতাশাজনক। জেন্ডারশিক্ষার অভাবেই মূলত তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তারা নারীর বিরুদ্ধে যেসব সহিংসতা ঘটেছে, সেইসব সহিংসতা রোধ করতে পারেননি। রাষ্ট্র তাদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি কিংবা উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখেনি। নারীকে রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আইনরক্ষাকারী বাহিনী সেইসব আইন প্রয়োগ করেনি। ফলে জেন্ডার-সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেনি।

আমরা লক্ষ করি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন নারী সংগঠন নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে স্থান করে নিয়েছে। তারা রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে জেন্ডার বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যতটা সাফল্য অর্জিত হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। রাষ্ট্রের স্ববিরোধী চরিত্রের জন্যই এটা সম্ভব হয়নি। সনাতন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে খুশি রেখে জেন্ডার উন্নয়ন ঘটাতে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এই বিপত্তি। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও জেন্ডারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। কেননা নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে জেন্ডার-সম্পর্ক উন্নত করার জন্য জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সাফল্য যা এসেছে তা এসেছে ওই নারী সংগঠনগুলোর চাপে আর আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে।

Watson, S (1990), Playing the State: Australian Feminist Interventions, Sydney: Allen and Unwin.

Westergaard, K. (1985), *State and Rural Society in Bangladesh: A Study in Relationship*, Scandinavia Institute of Institute of Asian Studies Monograph Series No. 49, Curzon Office.

White, S. C. (1992), *Arguing With the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh*, London Zed Book Limited.

World Bank (1990), *Bangladesh Strategies for Enhancing the Role of Women in Economic Development: A World Bank Country Study*, Washington, D.C.

Ziemann, W. Lanzendorfer, M. (1977), 'The State in Penpheral Societies', *The Socialist Register*, London: Merlin Press.

জেন্ডার এবং সুশাসন

শাহীন রহমান

ক. গভর্নেন্স ধারণায়ন

সাম্প্রতিককালে গভর্নেন্স (Governance) বা শাসন প্রক্রিয়া শব্দটি উন্নয়নের শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে। যদিও গভর্নেন্স বা শাসন প্রক্রিয়ার বিষয়টি আমাদের সভ্যতার মতোই পুরাতন। গভর্নেন্স ইস্যুটি এখন উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মরত সকলেরই গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। গভর্নেন্স বিষয়টি উন্নয়ন ভাবনার কেন্দ্রেই আজ কেবল ঠাঁই পায়নি বরং তা এখন উন্নয়ন নীতিকৌশলের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে সংযুক্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপেও বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯০ দশকের গোড়া থেকে এই গভর্নেন্স ইস্যুটি উন্নয়ন নীতিকৌশলে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে। অবশ্য এই গভর্নেন্স ধারণাটি তার উপাদান ও পরিধি সমেত এখনও অস্পষ্ট ও অবিকশিত এবং নানা ব্যাখ্যায় বিতর্কিত। তাই গভর্নেন্সের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নেই। অনেক সময় প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে অসতর্কভাবে গভর্নমেন্ট বা সরকার এবং গভর্নেন্স শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও তা ঠিক নয়। গভর্নেন্স বিষয়টি ধারণাগতভাবেই রাষ্ট্রের তত্ত্ব থেকে আলাদা। প্রচলিত সংকীর্ণ ধারণায় গভর্নেন্স বলতে রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখার অর্থাৎ সরকারের (তার আইনসভা ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি) কার্যক্রম বোঝানো হয় এবং এখানে ব্যক্তিগত খাত ও সিভিল সোসাইটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সাম্প্রতিকতম ব্যাখ্যায় গভর্নেন্স হল সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখা (সরকার, আইনসভা, বিচার বিভাগ), স্থানীয় সরকার কাঠামো, জনগণের বিভিন্ন গ্রুপ, স্থানীয় সম্প্রদায়, ব্যবসা-বাণিজ্য খাত কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং নারী-পুরুষের সংগঠন, যারা জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মেটায় ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। গভর্নেন্স নিজেই একটি প্রায়োগিক প্রক্রিয়া, যা একটি দেশের সংবিধানে বর্ণিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে সমাজকে সক্ষম করে তোলার জন্য গ্রহণ করা হয়। আবার গভর্নেন্সের এই সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত

বিবেচনায় আনলে গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন বলতে বোঝায় একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি, যেখানে জনগণের পক্ষ থেকে যাদের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করা হয় তারা তাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ করার সদিচ্ছায় উদ্বুদ্ধ, জনগণের মঙ্গল সাধনে রত, জনগণের সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত এবং জনগণের জীবনকে আরও প্রাণবন্ত, সন্তোষজনক ও উপভোগ্য করতে সচেষ্ট। গভর্নেন্স-এর মধ্যে তাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতা, বিকেন্দ্রীকরণ, নীতিমালার মালিকানা বোধ, আর্থিক সংহতি ইত্যাদি ইস্যু। আর এসব ইস্যুকে গুড গভর্নেন্স বা সুশাসনের উপাদান রূপে বিবেচনা করা হয়।

জাতিসংঘের (UNDP) মতে, গভর্নেন্স-এর আধুনিক ধারণার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা, সভা সমিতিতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা, নির্ভরযোগ্য ও সমতাধর্মী আইনি কাঠামো, আমলাতন্ত্রের স্বচ্ছতা, প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের সহজলভ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় খাতের দক্ষ ও উত্তম ব্যবস্থাপনা। এখানে গর্ভনেন্সকে দেখা হয় সকল ক্ষেত্রে একটি দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চা হিসেবে। এর মধ্যে রয়েছে মেকানিজম, প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে নাগরিক ও গোষ্ঠীগুলো তাদের স্বার্থ স্পষ্টভাবে তুলে ধরে, তাদের আইনগত অধিকার ভোগ করে ও দায়বদ্ধ থাকে এবং তাদের পার্থক্য নিরসন করে।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়ন প্রচেষ্টার দক্ষতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে গভর্নেন্সকে দেখে। বিশ্বব্যাংকের মতে গভর্নেন্স হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা ব্যবহারের রীতিনীতি বা প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাংক গভর্নেন্স-এর সুস্পষ্ট তিনটি দিক তুলে ধরেছে : ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধরন বা রূপ; খ) উন্নয়নের নিমিত্তে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া; গ) নীতিমালা রূপায়ন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতা। বিশ্বব্যাংকের মতে শক্তিশালী ও সমতাধর্মী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখাটাই হচ্ছে গভর্নেন্স, যা কিনা ভালো অর্থনৈতিক নীতিমালার আবশ্যিক সম্পূরক। তাই বিশ্বব্যাংকের ভাষ্যে গভর্নেন্স এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। এখানে গভর্নেন্সের মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল :

- রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী ও সরকারের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা;
- নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান;
- সরকারি সংস্থাগুলোর সংবেদনশীলতা বা সাড়া দেওয়ার আগ্রহ;
- তথ্যের পর্যাপ্ত ও সহজলভ্যতা;
- সভা-সমাবেশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। বিশ্বব্যাংকের ব্যাখ্যায় তাই গভর্নেন্স-এর ৪টি দিক রয়েছে : রাষ্ট্রীয় খাত ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা উন্নয়নের জন্য আইনি কাঠামো, তথ্য ও স্বচ্ছতা।

ওইসিডিভুক্ত দেশগুলির মতে গভর্নেন্স হচ্ছে একটি সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ। গভর্নেন্সের এই ব্যাপক সংজ্ঞা অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সুফল বণ্টনসহ শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার সম্পর্কের ধরন নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার বিষয়টিকেও ধারণ করে।

সম্প্রতি এই গভর্নেন্স ধারণাটি সংকীর্ণ সংজ্ঞার পরিধি ছাড়িয়ে আরও ব্যাপক সংজ্ঞায় পরিচিত হচ্ছে। এই প্রসারিত সংজ্ঞায় গভর্নেন্স হচ্ছে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান—সরকারি ও ব্যক্তিগত, তাদের সাধারণ বিষয়াদি ব্যবস্থাপনায় গৃহীত বিভিন্ন পন্থার সমষ্টি। তবে প্রায়শই একটি সুস্পষ্ট চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বর্ণনাধর্মী উপায়ে সুশাসন বা গুড গভর্নেন্সকে ব্যাখ্যা করা হয়। আসলে গভর্নেন্স বা শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রকে তার অধীনস্থ সকলের কাছে আরো আস্থাভাজন করে তোলা, তাকে তার নাগরিকের ও নিজেদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আরো মানবিক ও সভ্য করে তোলা। অবশ্য আমরা যদি দক্ষিণ এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে, গভর্নেন্স বা গুড গভর্নেন্স বিষয়টি কেবল ভালো রাজনীতি কিংবা একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গভর্নেন্স অধিকতর মানব উন্নয়ন ও মানুষের আরো কল্যাণ সাধনের উপায়স্বরূপ সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিগত খাতকে সক্ষম করে তুলবে।

গত বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে গভর্নেন্স বিতর্কটি বেশ তীব্র আকার ধারণ করে। জনগণের বিষয়টি ক্রমশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। সেই সঙ্গে গভর্নেন্স কিভাবে জনগণের প্রকৃত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করছে, সেটাই গভর্নেন্সকে বিচার করার মাপকাঠি হয়ে ওঠে। তাই গভর্নেন্স যদি মানব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে, তবে তা কেবল গণমুখী বা জনগণকেন্দ্রিক হলেই চলবে না; এর মালিকানাও থাকতে হবে জনগণের হাতে। সুশাসন বা গুড গভর্নেন্স ওপর থেকে এলিট বা অভিজাতদের দ্বারা চালিত হলে চলবে না, জনগণকেই তাদের নিজস্ব গভর্নেন্স গড়ে তুলতে হবে। অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে; দৈনন্দিন জীবনের অবমাননা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে হবে।

বস্তুত গুড গভর্নেন্স বা সুশাসন মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণেই নিবেদিত। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিগত খাতের কর্মকাণ্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ, যা কিনা মানব উন্নয়নের সহায়ক। সেই সঙ্গে তা সকল মানুষের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সক্ষমতা গঠনের জন্য সহায়তা করতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও ব্যক্তিগত খাতের ওপর দায় দায়িত্ব আরোপ করে।

খ. সুশাসন : জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের বিস্ময়কর উত্থান ঘটলেও পরিসংখ্যান কিন্তু ভিন্ন সত্যকেই প্রকাশ করে।

গভর্নেন্স বা শাসন প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে নারীদের অতি নগণ্য উপস্থিতি রাষ্ট্রপ্রধানের মতো শীর্ষপদে নারীদের আসীন হবার গৌরবকে ম্লান করে দেয়। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী নিরক্ষর এবং রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। জাতীয় হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার কাছে তারা মূলত অদৃশ্য। বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইনগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বঞ্চনার শিকার। গভর্নেন্স কাঠামোতেও তাদের অংশগ্রহণের হার সর্বনিম্ন।

দক্ষিণ এশিয়া গভর্নেন্স কাঠামোতে নারী উপস্থিতির হার :

- সংসদীয় আসনের মাত্র ৭ শতাংশ আসন নারীদের দখলে;
- মন্ত্রিসভায় নারীদের অংশগ্রহণের হার মাত্র ৭ শতাংশ;
- বিচার বিভাগের পদগুলোর মাত্র ৬ শতাংশ পদে নারীরা আসীন;
- সরকারি চাকরির মাত্র ৯ শতাংশ হচ্ছে নারী;
- স্থানীয় সরকারের মাত্র ২০ শতাংশ সদস্য নারী।

নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও গভর্নেন্স শাসন প্রক্রিয়ার সকল প্রতিষ্ঠানে নারীরা প্রায় অদৃশ্য; নারীরা এই অঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বে অবস্থান করলেও তাদের সেই শক্তিশালী অবস্থান অধিকাংশ নারীর জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনেনি। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই তাদের নারী সদস্যদের সম্বন্ধে কোনো তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করে না। নির্বাচনে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রেও নারীদেরকে উপেক্ষা করা হয়। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে ভারত ও বাংলাদেশে অন্যান্য গভর্নেন্স কাঠামোর চাইতে স্থানীয় সরকারে বিপুল সংখ্যক নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি নজর কাড়ে। কিন্তু তবুও সামগ্রিক বিচারে এ অঞ্চলে গভর্নেন্সের সর্বস্তরে জেন্ডার বৈষম্যের সর্বগ্রাসী বিস্তার লক্ষণীয়, যা এখানকার গভর্নেন্স সংকটের অন্যতম কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে।

১. গভর্নেন্স কাঠামোতে নারী

বাংলাদেশসহ গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় ঐতিহ্যগতভাবে নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি পুরুষদের এলাকা বলে বিবেচিত। বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত প্রথা রীতিনীতিকে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে এখানে নারীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে সরিয়ে রাখা হয়। অবশ্য বিগত কয়েক দশকে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ নারীর কাছে এ ধরনের স্বাধীনতা এখনও স্বপ্নের মতোই মনে হয়। নারীর এই পরাধীনতা পরিবারে ও সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত প্রথারই ফল, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি পুরুষ কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পুরুষেরাই জাতীয় আইনসভা ও সংসদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন।

গভর্নেন্সে নারী
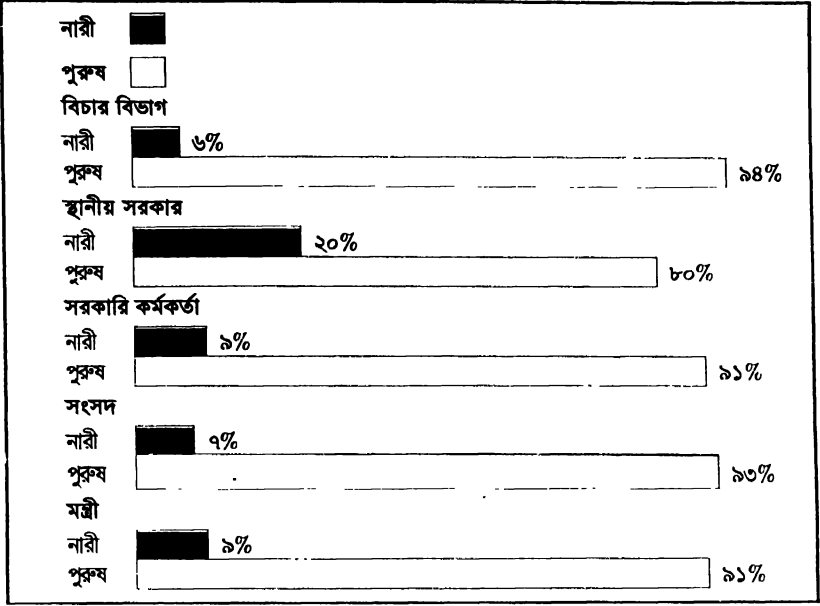
জাতীয় সংসদ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের দৈন্য খুবই প্রকট। এ অঞ্চলের ৭টি দেশের মধ্যে ৪টিতে বর্তমানে কিংবা কোনো না কোনো সময়ে নারীরা রাষ্ট্রপ্রধানরূপে নির্বাচিত হলেও এসব দেশের সংসদে নারীর অংশগ্রহণের হার এখনও অনেক নিম্ন মাত্রায় রয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় সংসদে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৭ শতাংশ, যা আরব বিশ্ব ছাড়া বিশ্বে সর্বনিম্ন। আরব দেশগুলোতে সংসদে নারীর অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার চাইতে কম।

বিগত কয়েক দশকে সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও তা ঘটেছে অসমভাবে। যেমন বিগত ৫০ বছরে ভারতের লোকসভায় নারীর আসন সংখ্যা ২২ থেকে ৪৮-এ উন্নীত হলেও, তা কিন্তু লোকসভার মোট আসন সংখ্যার ৯ শতাংশের কম। বর্তমানে শ্রীলংকায় সংসদে নারী অংশগ্রহণ দাঁড়িয়েছে ৪.৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ২.৬ শতাংশ এবং ভুটানে সবচেয়ে কম—মাত্র ২ শতাংশ। বাংলাদেশে এই হার ১২.৮ শতাংশ। অথচ সিডও সনদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংসদে নারীর আসন অন্তত পক্ষে ৩৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছিল।

বাংলাদেশে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১০ ভাগ আসন বা ৩০টি সিট সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এই মেয়াদ শেষ

হওয়ায় এবং নারী আসন সংরক্ষণের বিলটি সংসদে এখনো পাস না হওয়ায় বাংলাদেশে নারী আসনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যদিও বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি (অন্ততপক্ষে ৬৪টি করা) এবং সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবিটি উত্থাপিত হয়েছে। কেননা সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদরা নির্বাহীভাবে ক্ষমতাহীন ও রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্বহীন হয়ে দলীয় রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়। ভারতে কখনও সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়নি।

শ্রীলংকাতেও গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সাংগঠনিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়নি। সংবিধানে অবশ্য লৈঙ্গিক ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানকার সংসদে বা স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। তবে ১৯৬০ সালে শ্রীমাভো বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শ্রীলংকা বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর দেশ হবার গৌরব অর্জন করে। কিন্তু তবুও শ্রীলংকার সংসদে নারীদের অনুপাত বিশ্বের গড় হারের বেশ নিচে—মাত্র ৪.৯ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই গত সংসদে নারী অনুপাতের ক্ষেত্রে গড় পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে সংসদ নেত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়েই নারী। শুরু থেকেই বাংলাদেশের সংসদ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণীর ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এসেছে।

সংসদে নারী

দেশ/অঞ্চল	সংসদ	উচ্চস্তর বা সিনেট	মোট
বাংলাদেশ	১২.৪		১২.৪
ভারত	৮.৮	৮.৫	৮.৭
নেপাল	৫.৪	১৫	৭.৫
মালদ্বীপ	৬.৩		৬.৩
ভুটান	২.০		২.০
পাকিস্তান	২.৮	২.৩	২.৬
শ্রীলংকা	৪.৯		
দক্ষিণ এশিয়া	৭.৪	৭.৫	৭.৩
বিশ্ব	১৩.৩	১০.৬	১২.৮
নরডিক দেশসমূহ	৩৮.৩		৩৮.২
সাব সাহারান আফ্রিকা	১১.৬	১৩.২	১১.১৮
পূর্ব এশিয়া	৯.৫	১৩.০	১০.১

Source : Human Development in South Asia : The Gender Question Mahbubul Haq, Human Development Center, UPL.

সংবিধানের ৬৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়। সংসদ সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই নারী সাংসদের মনোনীত করার বিধানটি প্রচলিত ছিল। অবশ্য এই বিধান ৩০০টি সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারকে খর্ব করেনি। সমাজে প্রকাশ্যভাবে পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বেলায় নারীরা যে সামাজিক বাধার সম্মুখীন তা বিবেচনা করে সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশা করা হয়েছিল এর ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে একসময় নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষে সংসদে নারী আসন ৩০টি বৃদ্ধি করা হলেও কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

আসন সংখ্যা সংরক্ষণ বিধির আওতায় ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের সংসদে নারীর সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০ শতাংশে উন্নীত হলেও এর পর থেকে তা সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে সেখানে ৬ জন নারী সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়। পরে ২ জন নারী সাংসদ সিনেট কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করে। মন্ত্রিত্বও লাভ করে ২ জন নারী সাংসদ। কিন্তু ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে সংসদ ভেঙে দিয়ে সামরিক শাসন জারি করা হয়। বর্তমান সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ৮ সদস্যদের ১ জনসহ মন্ত্রিসভার ১ জন হলেন নারী। এছাড়াও প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে নারীদের যুক্ত করা হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারী সংসদ সদস্যরা কিন্তু মিশ্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ বা আইনসভায় নারীদের সীমিত প্রতিনিধিত্ব তাদের নগণ্য অংশগ্রহণকেই চিহ্নিত করে। এ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক আইনকানুন ও রীতিনীতি বিদ্যমান, যা অব্যাহতভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে। আর নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক এই সব প্রথাকে ধর্ম বা সংস্কৃতির নামে জায়েজ করা হয়। নারী সাংসদরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় এইসব বৈষম্য আজও টিকে রয়েছে। এছাড়া আবার দেখা যায় নারী সংসদ সদস্যরা নির্দিষ্ট নারী ইস্যুর বদলে দলীয় আদর্শের দ্বারা চালিত হওয়ায় নারীর বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতামত অভিন্ন হয় না। জাতীয় বা দলীয় ইস্যুই তখন নারী ইস্যুর চাইতে প্রাধান্য লাভ করে। যেমন শ্রীলংকায় নারী উন্নয়নে নানা উদ্যোগ গৃহীত হলেও গৃহযুদ্ধের কারণে নারী ইস্যু সেখানে কাঙ্ক্ষিত মনোযোগ লাভ করেনি। তবে এটা ঠিক নয় যে, নারী সংসদ সদস্যরা নারী ইস্যুতে সরব হয়নি। কেননা এমন উদাহরণ রয়েছে যেখানে দেখা যায়, নারী সাংসদরা পার্টি কর্তৃক গৃহীত হবার আগেই নারী ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন। বিভিন্ন নারী সংগঠনের সহায়তায় তারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলেই গভর্নেন্সের বিভিন্ন কাঠামোতে নানাভাবে নারী প্রতিনিধিত্ব দৃশ্যমান হয়েছে। তবে ভারতের রাজ্যসভায় নারীর প্রতিনিধিত্বের হার ১৯৮০ সালের ১২ শতাংশ থেকে ১৯৯০

সালে ৮.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমানে ২০ জন নারী রাজ্যসভায় রয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত গুরুত্বপূর্ণ দলীয় নেতাদেরকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রেও পুরুষদেরকেই বিবেচনা করা হয়।

অনুরূপভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতেও নারীরা সিনেটে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে খুবই বাধার সম্মুখীন হন। আসলে এখানে সংসদে মনোনীত হবার পদ্ধতিটি এমনই যে, বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে একজন নারীর এখানে জিতে আসাটা প্রায় অসম্ভব। ১৯৭৭ সালে সিনেটের ৬৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন নারী, যা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ২৪ জন নারী জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হলেও মাত্র একজন নারী সিনেটে নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। আর ১৯৮৫ সালের নির্বাচনে কোনো নারীই সংসদে নির্বাচিত হতে পারেননি। অন্যদিকে ১৯৭১ সালে যখন শ্রীলংকার সংসদ বিলুপ্ত করা হয় তখন (বিগত ২৫ বছরে) মাত্র ৬ জন নারী সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নেপালে কিন্তু নিম্নস্তরের সংসদের চাইতে উচ্চ স্তরের সংসদে নারীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশি। নেপালের উচ্চস্তরের সংসদে ৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হলেও অন্যত্র নারী আসন এখনও সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হয়নি। তাই দেখা যায় নেপালের নিম্নস্তরের সংসদে নারীর সংখ্যা ১৯৬০ সালের একজন থেকে ১৯৯৯ সালে ১২ জনে উন্নীত হলেও সামগ্রিকভাবে নারীর প্রতিনিধিত্বের হার খুবই নিম্ন পর্যায়ে, অর্থাৎ ৩.৫ শতাংশে রয়ে গেছে।

আসলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদেরকে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় উন্নীত করার বদলে গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখে। ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা মদদপুষ্ট সাংস্কৃতিক রীতিনীতি নারীদের সামাজিক জীবনে প্রবেশ করাটাকে ভালো চোখে দেখে না। যেমন পাকিস্তানের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চলে মেয়েদেরকে ভোটদানসহ কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। বেলুচিস্তান কিংবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মেয়েদের চাইতে পাঞ্জাব বা সিন্ধের মেয়েরা, বিশেষত শহরাঞ্চলের মেয়েরা অনেক বেশি ঘোরাফেরার ও পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই দেখা যায়, ১৯৯৩ সালে সংসদে নারী আসন সংরক্ষণের বিধান চালু করার পরেই বেলুচিস্তানে মেয়েরা সংসদে আসতে পেরেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সংসদে নারী প্রতিনিধিদের হারের ক্ষেত্রে খুব সামান্য তারতম্য দেখা দিলেও যেসব রাজ্যে সাক্ষরতার হার বেশি, সেসব রাজ্যের সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হারও তুলনামূলকভাবে বেশি। যেমন কেরালায় সাক্ষরতার হার বেশি হওয়ায় এখানে রাজ্যসভায় নারীর সংখ্যা অনেক বেশি—৯.২ শতাংশ আর বিহার ও উড়িষ্যায় তা যথাক্রমে ৩ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। কেননা সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশের কম।

মন্ত্রিসভায় নারী

দক্ষিণ এশিয়ার মন্ত্রিসভাগুলোতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার এখন খুবই নগণ্য। সাম্প্রতিক কালে এ অঞ্চলে মন্ত্রিসভায় নারীদের অংশগ্রহণের হার ৯ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলের দেশগুলোর নারী মন্ত্রীদের কখনোই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বা প্রভাবশালী বলে বিবেচিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় না। সমাজকল্যাণ জাতীয় মন্ত্রণালয় সাধারণত নারীদের ভাগ্যে জোটে। যেমন ১৯৯৯ সালে নেপালের মন্ত্রিসভায় একজন মাত্র নারী প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। তার কোনো স্বাধীন দপ্তর ছিল না এবং তিনি পূর্ণ মন্ত্রিসভার সভায় অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করেননি।

ভারতে ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম নারীমন্ত্রী হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেও দুঃখজনকভাবে তখন তাঁর মন্ত্রিসভায় আর কোনো নারীমন্ত্রী ছিল না। অবশ্য ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে নারীর জন্য দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর একটি হল গর্ভধারণকালীন চিকিৎসা ছুটি (Medical Termination of Pregnancy Act-1972) এবং অন্যটি সমান কাজের সমান মজুরি অধ্যাদেশ (Equal Pay for Equal Work Ordinance-1976)। ১৯৬৯ সালে আরেকজন নারী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান এবং তিনি ভারতের দ্বিতীয় নারী মন্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করেন। বিস্ময়ের কথা, এই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত নারীমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত রয়েছে। অবশ্য নগর উন্নয়ন, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এখন নারীদেরকে দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন আগে একজন নারী ভারতের রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন এবং আরও ৭ জন নারী রাজ্য মন্ত্রিসভায় আছেন।

মন্ত্রিসভায় নারী (১৯৯৯)

দেশ	নারী	পুরুষ
পাকিস্তান	৩	২৬
ভারত	৮	৭৬
শ্রীলংকা	৪	২৯
বাংলাদেশ	৪	৪১
নেপাল	১	৩১

বিগত ৫৩ বছরে পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় মাত্র ৬ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন। এদের মধ্যে দুজন ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পরে নারী উন্নয়ন ও যুব মন্ত্রণালয় এবং জনসংখ্যা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। আরেকজন নারী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য পাকিস্তানে একজন নারী শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল অবধি শ্রীলংকায় ২০ জনেরও অধিক সদস্যের মন্ত্রিসভায় একজন মাত্র নারী ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করেছেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ শ্রীলংকার মন্ত্রিসভায় এখন ৪ জন নারীমন্ত্রী রয়েছেন। আরো দুজন নারীকে নারীবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী হিসেবে দুজন নারীকে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। লক্ষণীয় নারীমন্ত্রীদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মতো নিম্ন পর্যায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রী হবার সুবাদে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই তাদের শাসনামলে প্রতিরক্ষা, তথ্য ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিগত সরকারের ৪ জন নারীমন্ত্রীর মধ্যে দুজনকে কৃষি ও পরিবেশ—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ওই দুজন নারীমন্ত্রী তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, যা নীতিমালাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের সক্ষম করে তুলেছে। কিন্তু বিস্ময়কর হল, এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো নারীই পররাষ্ট্র বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হননি।

নারী মন্ত্রীদেরকে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করার দরুন নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা খুব সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এ ছাড়া নারী সাংসদ বা নারীমন্ত্রীদের—এমনকি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের নারীমন্ত্রীদের আরেকটি ট্রাজিডি হল, তাদেরকে নারী ইস্যুর বদলে জাতীয় ইস্যুর প্রতিই নজর দিতে হয়।

সংসদীয় কমিটিতে নারী

জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও কদাচিৎ এখানে নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ভারতের লোকসভায় ৩০-এর বেশি সংসদীয় কমিটির অধিকাংশ কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকলেও মাত্র একটি সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন নারীকে করা হয়েছে। পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ের আগে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বা অর্থনৈতিক সমন্বয় কমিটির মতো স্থায়ী পরিষদ ও কমিটিতে দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো নারী সদস্য ছিল না। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইসলামী আদর্শ পরিষদ (CII)-এর ২০ জন সদস্যের মধ্যে একজন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী কমিটি যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি, বেইজিং প্লাস ফাইভ জাতীয় রিপোর্ট প্রণয়ন কমিটিতে মহিলাদের যুক্ত করা হয়। এ ধরনের কমিটির অধিকাংশ সদস্যই নারী। পাকিস্তানের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটিতে নারীরা এখন উচ্চকণ্ঠ হলেও দুর্ভাগ্যবশত তাদের খুব সামান্য সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে পাকিস্তান সরকার অর্থনৈতিক পরামর্শ বোর্ডসহ বিভিন্ন পরামর্শ কমিটিতে নারীদের যুক্ত করার উদ্যোগ নিচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর শেষেও নেপাল ও শ্রীলংকার সংসদীয় কমিটিগুলিতে নারী অনুপস্থিত। এসব কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম। কেবল ১৯৯৩ সালে গঠিত জাতীয় নারী উন্নয়ন কমিটিতে কতিপয় নারীর দেখা পাওয়া যায়। আর এ অবস্থায় এই নারী সদস্যরা নারী উন্নয়নকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারবে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতে পালাক্রমে নারীদের যুক্ত করা হয়ে থাকে। তবে এখানেও বৈষম্য রয়েছে, বিশেষত সংরক্ষিত আসনে মনোনীত নারী সাংসদদের প্রতি এই বৈষম্য দেখানো হয়েছে।

২. গভর্নেন্স-এর স্থানীয় পর্যায়ে নারী

সাধারণত তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন জনগণকে তাদের সমাজের গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন দেশের তৃণমূলের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নারীরা গভর্নেন্সের স্থানীয় কাঠামোতে যুক্ত হবার পর নতুন ধরনের সুফল এসেছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অবশ্য স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণের হারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। কিছু দেশ স্থানীয় সরকারে নারীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে।

এ অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া সর্বত্রই স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা এখনও নগণ্য। এমনকি বাংলাদেশ এবং ভারতের স্থানীয় সরকারের নারী প্রতিনিধিদের হার ২০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি। ১৯৯২ সালে ভারতীয় সংবিধানে ৭৩তম ও ৭৪তম সংশোধনী এনে সকল পঞ্চায়েতে (গ্রাম সরকার) ৩৩ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করে স্থানীয় সরকারে নারীর প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করা হয়। অধিকাংশ রাজ্যের স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য সংরক্ষিত এই আসন সফলতার সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যায় এবং নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এর পাশাপাশি অনেক রাজ্যে (যেমন মধ্যপ্রদেশ) স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিম্ন পর্যায়েই থেকে গেছে। এক্ষেত্রে কয়েক দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যেসব নারী পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় যাবার সুযোগ লাভ করেছেন, তারাই সেখানে ভালোভাবে তাদের কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এদের অনেকে ইতোমধ্যেই খুব ভালো সুনাম অর্জন করেছেন। তাদের কর্মনৈপুণ্যের জন্য পুরস্কৃতও হয়েছেন। এমনকি পঞ্চায়েতের অধিকাংশ নারী সদস্য নিজেরা নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষরতা অর্জনের প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যদিয়ে বিকশিত হয়েছে—যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকার, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়ন পরিষদই বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের সবচেয়ে কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো। এই ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় গভর্নেন্স কাঠামোতে তাদেরকে সংযুক্ত করা হয়।

বর্তমানে ৪২৭টি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটিতে ৩টি আসন বা প্রতিটিতে মোট আসনের একচতুর্থাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। এর ফলে এই স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব ২০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশিতে উন্নীত হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের একতৃতীয়াংশ আসন যদিও নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা জনপ্রশাসন সংস্কারে উল্লেখ করা হয়েছে, তবু তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

স্থানীয় সরকারের নারী (শতকরা হার)
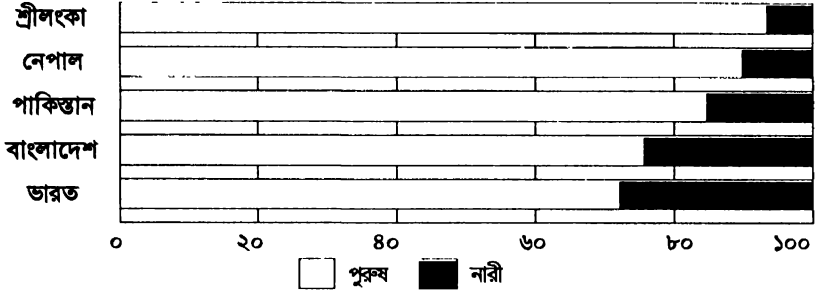
নেপালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এখানে নারীদের অংশগ্রহণ বেশ সীমিত। জেলা উন্নয়ন কমিটি (DDC) ও গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (VDC) উভয় পর্যায় মিলে সেদেশে নারীর সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। কোনো নারীই সেখানে এখন পর্যন্ত জেলা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারপার্সন কিংবা কোনো পৌরসভার মেয়র হতে পারেনি। ৩৯১৩টি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মধ্যে মাত্র ১৩ জন নারী চেয়ারপার্সন হয়েছেন। অবশ্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটির একটি আসন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের ৫টি আসনের মধ্যে একটি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত। এর মাধ্যমে গ্রামউন্নয়ন কমিটি ও পৌরসভার মতো গভর্নেন্সের স্থানীয় কাঠামোতে ৩৬০২৩ জন নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেছে।

বর্তমানে শ্রীলংকার স্থানীয় সরকার কাঠামো তিন স্তরে বিভক্ত—পৌরসভা পরিষদ, নগর পরিষদ এবং প্রাদেশিক সভা। এসব পরিষদের মোট ৩ হাজারের বেশি সদস্যের মধ্যে নারীর সংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জাফনা প্রদেশের একটি পৌরসভা পরিষদের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়েছেন একজন নারী। নগর পরিষদের ৩৬ জন চেয়ারপার্সনের মধ্যে একজনও নারী নেই, তবে সম্প্রতি দুজন নারী ভাইস-চেয়ারপার্সন হতে পেরেছেন। সেখানে এখন প্রাদেশিক সভায় ৩ জন নারী চেয়ারপার্সন এবং দুজন ভাইস-চেয়ারপার্সন আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সভার মোট সদস্য সংখ্যার মাত্র ১.৭২ শতাংশ হচ্ছে নারী। অবশ্য সম্প্রতি স্থানীয় সরকারে নারীর জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ শ্রীলংকা করেছে।

পাকিস্তানে এখনও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। সেখানকার বর্তমান সরকার ২০০০ সালের ডিসেম্বরে নতুন করে স্থানীয় সরকার

নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। ইউনিয়ন পরিষদ, তহশিল পরিষদ, ডিস্ট্রিক্ট স্থানীয় সরকারের এই তিন পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদে ৫০ ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। তহশিল ও জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ৫টি ও ১০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা মোট আসনের ১৫ শতাংশ।

এখনও এ অঞ্চলের রাজনীতির জায়গাটা ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষের রাজ্য। তাই সকল রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক বিষয়-আশয় ঘরের বাইরে পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হয়। নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা খুবই কম এবং আর্থিক সম্পদপ্রাপ্তির সুযোগ ও তার ওপর নিয়ন্ত্রণ নারীদের একেবারেই নেই। ফলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। আসলে যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক সমতার বিষয়টি এখনও এই স্তরে দুরাশা বলেই মনে হয়। কেননা পুরুষেরা সম্পদের অধিকারী ও নিয়ন্ত্রক হওয়ায় কিংবা তুলনামূলকভাবে ভালো শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করায় রাজনৈতিক ক্ষমতার সবচেয়ে উচ্চ স্থানে তারা অবস্থান করে এবং নারীরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় চালক হিসেবে রয়ে যায়।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের চাইতে স্থানীয় সরকারে নারীদের লোক দেখানো উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, যা অনেক সমস্যাও সৃষ্টি করে থাকে। দেখা যায় স্থানীয় সরকারে অবস্থানরত অনেক নারী সদস্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেনি। এর ফলে সচেতনতার অভাব থেকে তাদের এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যেখানে তারা বাধ্য হয়ে পুরুষের ওপর বা রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নারী ইস্যুর চাইতে পুরুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বেশি করে নজর দিতে হয়। বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের অনেক নারী সদস্য এই সত্যটি স্বীকার করেছেন যে, স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নিজেদের বাবা বা স্বামী থাকার কারণে তারা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পেরেছেন। আসলে স্থানীয় পর্যায়ের গভর্নেন্স কাঠামোতে এখনও নারীদের কোনো কার্যকর ক্ষমতা বা প্রভাব নেই। এখানে অনেক নারীই নিজেদের ধ্যানধারণা ও মতামত তুলে ধরার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ করতে পারেননি। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের এই সীমাবদ্ধতার অর্থ হল একদিকে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখার সুযোগ কমে যায়, অন্যদিকে তা নারীর ক্ষমতায়নকেও বিঘ্নিত করে। অবশ্য বর্তমানে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারে অবস্থানরত নারীরা তাদের এই সমস্যা উপলব্ধি করছে এবং তা মোকাবেলার নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে। নেপালে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় গভর্নেন্স কাঠামোতে তাদেরকে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য নারী প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা ধরনের কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ভারতে কতকগুলি এনজিও পঞ্চায়েতের নারী সদস্যদের আলাপ আলোচনা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ দিকনির্দেশনা প্রদানের মতো সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

বস্তুত স্থানীয় কাঠামোকে যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা নারীর অংশগ্রহণকে কার্যকরভাবে মূলধারায় নিয়ে আসার একটি মাধ্যম হয়ে উঠবে। যেহেতু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাই তাদের নারী ও পুরুষ উভয় প্রতিনিধি নারী ও শিশুর চাহিদাপূরণসহ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানে অনেক বেশি সাড়া দিয়ে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার আর্থসামাজিক উন্নয়ন সত্যিকারভাবে ত্বরান্বিত করতে হলে এ অঞ্চলের স্থানীয় পর্যায়ের নারীদের সুপ্ত সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগকে অস্বীকার করার বিদ্যমান মনোভাব ও কর্মপ্রক্রিয়া পরিবর্তিত না হয়, তাহলে ক্ষমতার নিছক স্থানান্তর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

৩. রাজনৈতিক দলে নারী

বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর নারী শাখা থাকলেও দলের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সামান্য। দেখা গেছে বিভিন্ন দলের এসব নারী শাখার কাজ হল ভোটের সময় নারী ভোটারদের ভোট সংগ্রহ করা। তাই তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, কিংবা ন্যূনতম মাত্রায় থাকলেও তা পার্টির এজেন্ডার দ্বারা প্রভাবিত। মূলধারার রাজনীতিতে নারীর পদচারণার ক্ষেত্রে এই নারী শাখা প্রাথমিক পদক্ষেপ হলেও, নারী শাখার খুব নগণ্য সংখ্যক সদস্য দলের উচ্চ পদে উন্নীত হতে পেরেছেন। দলের নেতৃত্ব ও নারী কর্মীদের মধ্যেও ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এর ফলে নারী ও নারীইস্যু কেন্দ্রচ্যুত হয়ে দলের নারী শাখার চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য নারীর মধ্যে নিজেদের ভোটের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দলের নারী শাখাগুলো অবদান রয়েছে। কোনো কোনো দেশের এই নারী শাখাগুলো নারী ইস্যুকে সামনে আনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বাধ্য করেছে। যেমন ১৯৯৯ সালে শ্রীলংকার শেষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুজন মূল প্রার্থী তাদের প্রচারাভিযানে নারীদের ইস্যুগুলোতে মনোযোগ দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো নারী আন্দোলন ও নির্বাচনে নারী ভোটারদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এ অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষপদে নারীরা অবস্থান করছেন। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলো এখন পর্যন্ত তাদের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের স্তরে যথেষ্ট মাত্রায় নারীদেরকে নির্বাচিত করেনি। ভারতে মূল রাজনৈতিক দলগুলোর সকল নির্বাহী কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৯.১ শতাংশ। সম্প্রতি কংগ্রেস তাদের উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির একতৃতীয়াংশ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেপালেও নারীরা দলীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট মাত্রায় সক্রিয়। সকল জাতীয় রাজনৈতিক দলের নারী শাখাগুলোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যও উদ্দেশ্য রয়েছে, যদিও এ অঞ্চলের

অন্যান্য দেশের মতো এখানেও দলের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বেশ কম। নেপালের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের হার কখনই ১০ শতাংশের বেশি হয়নি। সাম্প্রতিক কালে নেপালি নারীরা অধিক মাত্রায় রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠছেন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন। অধিকাংশ নেপালি নারী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বে নারীদের যুক্ত করার বিষয়টি উপলব্ধি করছে। কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে ধীর গতিতে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে নেপালের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর সংখ্যা ৫.৬ শতাংশ থেকে ৭.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এসব নারীর অধিকাংশকেই আবার দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়। এমনকি তাদেরকে দল কর্তৃক সেই সব নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন দেওয়া হয়, যেখানে দলের জেতার সম্ভাবনা খুব কম।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণের হার মাত্র ৫.১ শতাংশ। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি—দেশের এই দুটি মূল রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শীর্ষ কাঠামোতে নারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের ২৩ শতাংশ ও নির্বাহী কমিটির ৯.২ শতাংশ হচ্ছে নারী। বিএনপির নির্বাহী কমিটিতে নারীর সংখ্যা ১৪.৭ শতাংশ। জামাতে ইসলামের নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে কোনো নারী নেই। কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়ামে রয়েছে একজন নারী। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের দলীয় এজেন্ডায় নারী ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পাকিস্তানে শুরুর দিকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম হলেও পরবর্তী কালে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করায় এ পরিস্থিতির অবসান ঘটে। পিপলস পার্টি ১৯৭০ ও ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণাকালে ব্যাপক সংখ্যক নারীদেরকে সংগঠিত করে। যদিও এর ফলে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে ঘটেনি। সেদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী সদস্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য। প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই নারী শাখা রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলে নারী সদস্য সংখ্যা ৫ শতাংশেরও নিচে। দলের নীতি নির্ধারণী কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীরা নগণ্যসংখ্যক। সেখানকার শীর্ষ দুটি রাজনৈতিক দলের একটির কেন্দ্রীয় কমিটিতে মোট ২১ জনের মধ্যে নারী হল ৩ জন এবং অপরটিতে ৪৭ জনের মধ্যে ৫ জন হল নারী।

শ্রীলংকাতেও মূল রাজনৈতিক দলগুলোর নারী শাখা থাকলেও তাদের সদস্য সংখ্যা খুবই কম। এসব নারীশাখা দলের রাজনৈতিক স্বার্থে নারীদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত। সম্প্রতি সেখানকার প্রধান দলগুলোর দুটিতে শীর্ষ নেতৃত্বে এসেছেন দুজন নারী। এদের একজন শ্রীমাভো বন্দরনায়েক হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রাকনির্বাচনী সহিংসতা কালে বেশ কিছু দলীয় নারীকর্মী এককভাবে যৌন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে।

মেয়েরা যাতে করে তৃণমূলে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে না পারে সে জন্য বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নারী কর্মীদের ওপর ওই যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

এছাড়াও নারী রাজনীতিকেরা দলের ভেতরেও বৈষম্যের শিকার হন। এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই তাদের নারী কর্মীদের সম্বন্ধে আলাদা করে কোনো তথ্য সংরক্ষণ করে না। দলের নারী কর্মীরা ভোটের সময় নারী ভোটারদের দলের পক্ষে টানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও দলের রাজনৈতিক তৎপরতায় নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কোনো তথ্য নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধকরণ করা হয় না। আর এর ফলে দলে নারী কর্মীদের নিম্ন মর্যাদা বিদ্যমান থাকে এবং তা নারীদেরকে নির্বাচনে দলের মনোনয়ন প্রদানে নিরুৎসাহিত করে।

নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নারী

রাজনৈতিক দলগুলো খুব নগণ্যসংখ্যক নারীকে নির্বাচনে দলের প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। মনোনয়ন সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী কমিটিতেও নারীদের সংখ্যা খুবই অল্প। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-এর সাধারণ নির্বাচনে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ের একতৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য পূরণ করেনি। তাই দেখা যায় ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে ৪০০০-এর বেশি প্রার্থীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬.৫ শতাংশ। বাংলাদেশের নির্বাচনেও নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হার ছিল মোট আসনের মাত্র ৩ শতাংশ। তাছাড়াও দেখা গেছে অনেক যোগ্য নারী নির্বাচনে মনোনয়ন পাবার জন্য আবেদন করলেও তা উপেক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে হয় স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াতে হয়, নয়তো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। যেমন পাকিস্তানে ১৯৯৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৫০ জনেরও বেশি নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ১৫ জন প্রধান দুটি দল ও জোট কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করেছেন আর ২৬ জন নারী স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যদিও স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীদের কেউই বিজয়ী হতে পারেননি। ভারতেও ১৯৯৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৭৮ জন নারী স্বতন্ত্রভাবে ভোটে দাঁড়ান, কিন্তু এদের মধ্যে কেবল একজন নির্বাচনে জয়ী হতে পেরেছেন। আসলে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদে যাবার ক্ষেত্রে দলের সমর্থন লাভের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ নির্বাচনে জয়ী হবার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো মূল ধারার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার বিষয়টি বর্তমানে একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হওয়ায়, তা অনেক নারীকে দলীয় রাজনীতির বাইরে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

জাতীয় নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন না দেওয়ার রাজনৈতিক দলগুলো অনীহার কতকগুলো কারণ রয়েছে। মূল কারণটি হল এমন কাউকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দিতে চায় যার জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ধরে নেয়া হয় যে, প্রবল

পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে অধিকাংশ ভোটার নারী প্রার্থীর চাইতে পুরুষ প্রার্থীকেই বেশি ভোট দেবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সোনিয়া গান্ধী, শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, বেনজির ভুট্টো এদের কথা আলাদা। কেননা তারা হলেন ব্যতিক্রম। এরা সকলেই তাদের পিতা বা স্বামীর উত্তরাধিকার রূপে রাজনীতিতে এসেছেন। তাই তখনই একজন নারীকে দল মনোনয়ন দেয়, যখন তার জেতার সম্ভাবনা নিশ্চিত থাকে। আবার এমনও দেখা যায় যে, দলের পক্ষে জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই, এমন আসনে নারীকে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। যেমন নেপালের সংবিধান অনুযায়ী অন্ততপক্ষে ৫ শতাংশ আসনে নারী প্রার্থী দিতে হয়। তাই রাজনৈতিক দলগুলো এই সাংবিধানিক শর্ত পূরণ করার জন্য যেসব আসনে দলের জেতার আশা নেই, সেখানে দুর্বল নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়। শ্রীলংকায় সর্বশেষ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মোট প্রার্থীর মাত্র ৩.৮ শতাংশ ছিল নারী। এখানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকায় নির্বাচনে মেয়েদের প্রার্থী হবার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজ হলেও অর্থ ও অভিজ্ঞতার ঘাটতিসহ অন্যান্য শর্ত এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ধর্ম, বর্ণ, জাত-পাত, প্রার্থীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা এসব নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে কাজ করে।

নারী রাজনীতিবিদরা সবচেয়ে বড় যে বাধার সম্মুখীন হয় তা হল, নির্বাচনে প্রচার অভিযান চালাবার মতো প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আর্থিক সম্পদের অভাব পরিবারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতাকে খর্ব করে। মজুরি বৈষম্যও এমন ভাবমূর্তি তুলে ধরে যে মেয়েরা কম আয় করে, তাই তারা রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে ততটা সক্ষম নয়। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে যে, মেয়েরা তাদের স্থানীয় এলাকার ঘটনাবলি, তাদের অধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। সেজন্য নির্বাচনী প্রচার চালাবার জন্য মেয়েদেরকে আর্থিক সহায়তা করতে দলগুলো অনীহা প্রকাশ করে। পুরুষদের যেখানে নিজস্ব আয় উপার্জন আছে, নারীদের সেখানে নির্বাচনী প্রচারণা চালাবার জন্য পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অর্থের ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দল কর্তৃক নারীদেরকে দলীয় প্রার্থী রূপে মনোনয়ন দানের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় বাংলাদেশ ও নেপালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ব্যয়ের সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও নির্বাচনী প্রচারণার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার, মেয়েদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়াটাকে অসম্ভব করে তোলে।

নারীদের ভোটাধিকার ও ভোটদান

বিভিন্ন দেশে নারী ভোটারদের সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব এবং জাতীয় নির্বাচনে মেয়েদের ভোটদানের চিত্রটি ভিন্ন ভিন্ন। দেখা যায় যে, সাক্ষরতার হারের সঙ্গে তাদের ভোটে অংশগ্রহণের হারের কমা-বাড়াটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ভারতে যেসব রাজ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার বেশি সেখানে নারীর ভোটদানের হার ৭০ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে সেখানে নারীদের ভোটদানের অনুপাত ৫৮ শতাংশের বেশি, তবে পুরুষের চেয়ে ১০ শতাংশ কম। নিরক্ষরতা, নিজেদের মৌলিক অধিকার

সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব অনেক নারীকে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখে। নেপালে অধিকাংশ নারীই ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম। এখানে শহরের ৮৮ শতাংশ ও গ্রামের ৮৫ শতাংশ নারী নির্বাচনে নিয়মিতভাবে ভোট দিচ্ছে। বাংলাদেশে মেয়েদের ভোটদানের হার শতকরা ৪৯ শতাংশের বেশি। এখানে কিছু কিছু অঞ্চলে ধর্মীয় গোঁড়ামি এখনও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। পাকিস্তানের ১৯৯৭ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে নারী ভোটারদের অংশগ্রহণের হার ছিল মোট নারী ভোটারের মাত্র ৩৫ শতাংশ এবং অনেক গ্রামীণ এলাকায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাধার জন্য মেয়েরা ভোট দিতে পারে না। পাকিস্তানে ভোট দিতে হলে ভোটারদের পরিচয়পত্র বহন করতে হয় এবং অনেক মেয়েরই এ ধরনের পরিচয়পত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে ছবি লাগানো হয় না। এই পরিচয়পত্র তখন অন্যেরা জালভোট দিতে ব্যবহার করে। এর ফলে মেয়েরা কেবল ভোটাধিকার থেকেই বঞ্চিত হয় না, তাদের এই অধিকারের অপব্যবহারও হয়।

আবার এ অঞ্চলের নারীদের চলাফেরা সীমিত হওয়ায় তারা নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থীদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে পারে না। ফলে তারা জেনে শুনে বুঝে তাদের ভোট দিতে পারে না। তাই কাকে ভোট দিতে হবে অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই তা ঠিক করে দেয় তাদের স্বামী বা অন্য পুরুষেরা।

নারীর ভোটাধিকার কেবল সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার দরুন খর্ব হয় না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারাও তা বিঘ্নিত করে। অধিকাংশ দেশই আলাদা করে নারী ভোটার সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে না। ফলে নারীসমাজের পক্ষ থেকে কত ভোট পাওয়া গেল তা হিসাব করা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এছাড়া একটা বিদ্যমান ধারণা হল, একটি পরিবারে পুরুষ সদস্যরা যাকে ভোট দেয়, নারীরাও সেই একই প্রার্থীকেই ভোট দেবে। তাই নির্বাচনী প্রচারের সময় অধিকাংশ দল নারীদের চাইতে পুরুষ ভোটারদের প্রতিই বেশি করে মনোযোগী হয়, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারী ভোটারদের গুরুত্বকে কমিয়ে দেয়। কিন্তু যেখানে নারী ভোটারদের সম্বন্ধে আলাদা করে তথ্য সংগৃহীত হয় এবং নারী ভোটারদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ করা যায়, সেখানেই দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদাজনক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছে। যেমন ১৯৯৯ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে বেশ কতকগুলো রাজনৈতিক দল নারী ভোটারদের সমর্থন আদায়ের জন্য পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতন বন্ধের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে।

তুলনামূলকভাবে শহরের শিক্ষিত নারীরা তাদের অধিকার এবং এসব অধিকার কিভাবে আদায় করা যায় সে সম্বন্ধে মোটামুটি সচেতন।

৪. আইন ও বিচার ব্যবস্থায় নারী

সাধারণত একটি দেশের বিচার ব্যবস্থা সেই সমাজের অনুমোদিত কিছু মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে থাকে। তাই কিভাবে কী আইন প্রণীত হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে,

প্রয়োগ হচ্ছে—এসবই একটি দেশের সামাজিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। আর এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ধারক বাহক তথা আইনজীবী ও বিচারকদের ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারক রূপে নারী

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিচার বিভাগে নারীদের সংখ্যা খুবই অল্প। বিস্তারিত তথ্য না পেলেও দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ ও নিম্ন উভয় পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থায় নারীর উপস্থিতির হার ৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি নয়।

১৯৩৭ সালে ভারতের কেরালার হাইকোর্টে আন্না চান্ডি নামের এক নারী প্রথম মুন্সেফ হবার গৌরব অর্জন করেন, যিনি পরে কেরালা হাইকোর্টের বিচারক নির্বাচিত হন। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে এ পর্যন্ত দুজন নারীর সন্ধান মেলে—একজন ফাতেমা বিবি (পরে তামিলনাড়ুর গভর্নর), অন্যজন সুজাতা মনোহর। এই সুজাতা মনোহর মানবাধিকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুতে কয়েকটি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। বর্তমানে ভারতের হাইকোর্টে ১৫ জন নারী বিচারক কর্মরত এবং বিচার ব্যবস্থায় কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের কর্মের স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগে মাত্র দুজন নারী লাহোর ও পেশোয়ারের হাইকোর্টে বিচারক রূপে আছেন। ১৯৯৪ সালের পূর্বে পাকিস্তানের হাইকোর্টে ৫ জন নারীকে বিচারক নিয়োগ করা হয়। তখন উচ্চ আদালতে কোনো নারী বিচারক ছিলেন না। এই ৫ জনের মধ্যে ৩ জন লাহোর হাইকোর্টে এবং বাকি দুজনের একজন সিন্ধু ও অন্যজন পেশোয়ার হাইকোর্টে নিযুক্ত হন। এসব নিয়োগ সর্বস্তরে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধির একটি উদ্যোগ হলেও এগুলি ছিল মূলত রাজনৈতিক মনোনয়ন। তাই পরে কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুজন নারীকে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট বা ফেডারেল শরিয়া কোর্টে বিচারক পদে কোনো নারী নেই।

হাইকোর্টে নারী

দেশ	পুরুষ	নারী	নারী (পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত %)
শ্রীলংকা	২৬	২	৭.৬৯
ভারত	৪৮৮	১৫	৩.০৭
বাংলাদেশ	৪৫	১	২.২২
পাকিস্তান	৯৪	২	২.১৩
নেপাল	১০১	২	১.৯৮
মোট	৭৫৪	২২	২.৯২

বাংলাদেশেও এখন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে কোনো নারীকে নিয়োগ করা হয়নি। এদেশের বিচার বিভাগ একটি রক্ষণশীল কাঠামোতে আবদ্ধ। আইন ডিগ্রি অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীরাও একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে সমভাবে সকল প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ করলেও নারীরা এ ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য ও জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্টতার শিকার। বাংলাদেশে মোট বিচারকদের মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ হল নারী এবং ২০০০ সালে প্রথম একজন নারীকে হাইকোর্টের বিচারকের পদে নিয়োগ করা হয়।

শ্রীলংকায় কিন্তু ১৯৯৬ সালে প্রথম এক নারীকে (শ্রী রানী এ. বন্দরনায়েক) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও সেখানে একজন নারীকে আপিল বিভাগে ও অন্য দুজন নারীকে হাইকোর্টের বিচারক করা হয়। বর্তমানে নিম্ন আদালতের মোট বিচারকের ২৫ শতাংশ হল নারী। উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকার প্রাথমিক আদালতের ৯ জন বিচারকের ৪ জনই হচ্ছেন নারী।

নেপালের বিচার বিভাগে পুরুষদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য। এখানে সুপ্রিম কোর্টে কোনো নারী নেই। আপিল বিভাগের ১০৩ জন বিচারকের মধ্যে মাত্র ২ জন হচ্ছেন নারী এবং নিম্ন আদালতের ১০২ জন বিচারকের মধ্যে নারী হলেন মাত্র ৩ জন। বর্তমানে ২৪৭ জন বিচারকের ৫ জন হলেন নারী।
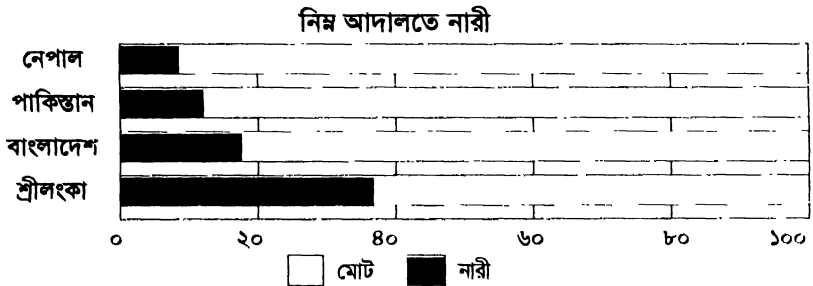
অবশ্য এখন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সরকার বিচার বিভাগের নারীদের কোটা সংরক্ষণ করার নানা ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশে বিচারক পদের ১০ ভাগ নারীর জন্য সংরক্ষিত, যদিও এখানে অনেক নারী এখনও সিনিয়র বা সহকারী বিচারকের পদে রয়েছেন। পাকিস্তান সিভিল কোর্টের বিচারক পদের ২ শতাংশ এবং জেলা ও সেশন কোর্টের বিচারকদের ৫ শতাংশ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেই ন্যূনতম কোটা এখনও পূরণ করা হয়নি।

১৯৮৮ সালে ভারত সরকার দ্রুত পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য 'পারিবারিক আদালত' প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ নিষিদ্ধ থাকায় তা আইনজীবী সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এই পারিবারিক আদালতে বিচারকের সংখ্যা কম থাকায় তা ততটা কার্যকর হয়নি। পরে ভারত সরকার 'মহিলা কোর্ট' স্থাপন করলেও সেখানে যথেষ্ট নারী বিচারক নেই। সম্প্রতি ভারতে

হাইকোর্ট ও এনজিও নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় 'মহিলা লোক আদালত' নামে একটি নতুন ধরনের কোর্ট চালু করা হয়েছে। এই আদালতে প্রচুর পরিমাণে ঝুলে থাকা মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে নারীরা সুবিচার পাচ্ছে। অনেক নারী আইনজীবীও এই আদালতে নিরাপদ হেফাজত, তালাক, খোরপোশ ইত্যাদি মামলায় লড়ছেন।

নারী আইনজীবী

এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে দেখা যায় যে, অনেক মেয়েই আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করে আইনজীবী হিসেবে লাইসেন্স পাবার পরও ওকালতি পেশায় যুক্ত হচ্ছেন না। কিংবা যুক্ত হলেও বিয়ের পর সামাজিক চাপের মুখে ওকালতি ছেড়ে দিচ্ছেন।

এই নেতিবাচক বাস্তবতা মেয়েদেরকে এই পেশায় যুক্ত হতে নিরুৎসাহিত করে। অধিকাংশ শিক্ষিত নারীই ব্যাংকিং, শিক্ষকতা, চিকিৎসা ইত্যাদি ধরনের গৎবাঁধা পেশায় আসতেই বেশি আগ্রহী। এটাও বিচার ব্যবস্থায় নারীর নগণ্য অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ।

সাম্প্রতিক কালে অনেক নারী আইন পেশায় এলেও এখন পর্যন্ত নারী আইনজীবীদের সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত নেই। ভারতে বার কাউন্সিল থেকে নিবন্ধিকৃত ৬ লক্ষ ৩০ হাজার আইনজীবী রয়েছেন এবং মোট আইনজীবীর অন্তত ১০ শতাংশ হচ্ছেন নারী। এখানকার আইনজীবীদের সংগঠন 'ল ইয়ার্স কালেকটিভ'-এর ৫০ ভাগ সদস্য নারী, যারা বিভিন্ন ইস্যুতে জেন্ডার-সমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করছেন। নানা বাধা সত্ত্বেও ভারতের নারী আইনজীবীরা সাফল্যের সঙ্গে আইন পেশায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তারা এমন এমন ঐতিহাসিক রায় প্রদানে ভূমিকা রাখছেন, যা মানবাধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেমন কিছুদিন আগে সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কিত এক রায়ে একটি সন্তানের মাকে সন্তানের 'প্রাকৃতিক অভিভাবক' (natural guardian) রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একজন সাহসী নারী আইনজীবী ও তার সহকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।

নারী বিচারকদের তুলনায় পাকিস্তানে নারী আইনজীবীদের সংখ্যা কিছুটা বেশি। তবে সংখ্যায় কম হলেও আদালতে, বিশেষত করাচিতে তাদের উপস্থিতি বেশ উজ্জ্বল। বর্তমানে পাঞ্জাবে ৩৫৩ জন, সিন্ধুতে ৩০০ জন এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৫৫ জন নারী আইনজীবী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও পাকিস্তান নারী আইনজীবীদের অধিকাংশই নারীর অধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এজিএইচএস লিগ্যাল এইড নারীর অধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এজিএইচএস লিগ্যাল এইড সেল ও পাকিস্তান নারী আইনজীবী সমিতি (PWLA) এখন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানাকর্মে নিয়োজিত। এমনকি নারীদেরকে এই পেশায় আসার জন্যও তারা উৎসাহিত করছে।

অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্রীলংকায় নারী আইনজীবীদের উপস্থিতি বেশ দৃশ্যমান। বর্তমানে এখানে ৫ হাজারের বেশি নারী আইনজীবী রয়েছেন। এখানে অধিকাংশ নারী

আইনজীবী নিম্ন আদালতে ওকালতি করলেও সুপ্রিম কোর্টে নিবন্ধিকৃত মোট আইনজীবীর ৪৮ শতাংশই এখন নারী। এছাড়াও অনেক নারী আইনজীবী এ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসসহ নানা আইনি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে কর্মরত।

বাংলাদেশে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্যমূলক আইন পরিবর্তন করার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শুরু থেকেই নারী আইনজীবীরা ক্রমবর্ধমানভাবে নারী অধিকার সংক্রান্ত ইস্যুতে মনোযোগ স্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে নারী নির্যাতন দমন আইনসহ নারীর জন্য নানা আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে এই আইন নারীর অধিকার সংরক্ষণে কেবল অসম্পূর্ণই নয়, বরং তা কাগুজে আইনে পরিণত হয়েছে। কেননা বাস্তবে তার প্রয়োগটাও ঠিকমতো হয় না। তাই কর্মরত নারী আইনজীবীরা উপলব্ধি করছেন যে, আইন ও বিচার ব্যবস্থার জটিল প্রকৃতি এবং বিদ্যমান ফাঁক-ফোঁকর কেবল ন্যায়বিচার প্রত্যাশী নারীদেরকেই নিরুৎসাহিত করে চলেছে।

বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন থাকার কথা ঘোষণা করলেও আদালতের মনোভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চয়তা বিধানকারী বিদ্যমান আইন কানুনকে প্রহসনে পরিণত করে। তাই দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতির দ্বারা বিচার বিভাগ সংক্রমিত হয়। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি দেশের সংবিধানে লৈঙ্গিক বৈষম্য সৃষ্টি না করার কথা লিপিবদ্ধ থাকলেও বাস্তবে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব আদালতের রায়কে নেতিবাচকভাবে নারীর বিরুদ্ধে প্রভাবিত করে থাকে। তাই স্বাভাবিক কারণেই পুরুষ-প্রাধান্যশীল বিচার ব্যবস্থার একটি সমাজে পুরুষপক্ষপাতিত্ব ও নারীর প্রতি বিরূপতা আরো মদদপ্রাপ্ত হয়। এ ছাড়াও দেখা যায়, অধিকাংশ নারী বিচারক ও নারী আইনজীবীও আবার জেন্ডার সংবেদনশীল নন। একদিকে রয়েছে বিয়ে, সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন—যা নারীর স্বার্থবিরোধী; অন্যদিকে বিচারকের আসনে বসে নারী বিচারকেরাই আবার ঐ সব বৈষম্যমূলক আইনের দ্বারা চালিত হয়ে এমন রায় দিচ্ছেন যা ন্যায়বিচারপ্রার্থী নারীর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। অনেক দেশই এই সমস্যা সমাধানের নানা উদ্যোগ নিচ্ছে। যেমন বাংলাদেশের বার কাউন্সিল একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এখানকার নারী বিচারকরা তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছেন। পাকিস্তানের বিচার বিভাগে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে একজন নারী ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ এসেছে। ভারতের বিচারকদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারণায় একজন নারীর চাইতে একজন পুরুষই যোগ্য আইনজীবী বিবেচিত হওয়ায় তা অধিকাংশ নারী আইনজীবীকে নিজের পায়ে স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে বাধা দেয়। অনেক নারী আইনজীবীই তাই কোনো না কোনো বড় পুরুষ আইনজীবীর জুনিয়র বা সহযোগী রূপে কাজ করতে বাধ্য হয়, নয়তো কোনো বড় পুরুষপ্রধান আইন পরামর্শদানকারী ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার নেপাল ও

পাকিস্তানের মতো দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী আইনজীবী সিভিল কেস সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কদাচিৎ দুএকজন ক্রিমিনাল মামলা নেয়। অনেকে কেবল নারী ইস্যু সংক্রান্ত মামলা গ্রহণে আগ্রহী হয়।

আসলে গোটা বিচারব্যবস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হলে অনেক নারীকে এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ে। সেই সঙ্গে বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলের জন্য জেন্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তবে স্মরণ রাখা দরকার সমাজ সামগ্রিকভাবে সংবেদনশীল না হলে, এককভাবে বিচার ব্যবস্থা থেকে জেন্ডার বৈষম্যের শিকড় উৎপাটন করা যাবে না।

৫. সিভিল সার্ভিসে নারী

সাধারণত সরকারি কর্মকর্তা পদে বা সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়কেই একই ধরনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং এক্ষেত্রে বৈষম্যের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির বেলায় বৈষম্য বিদ্যমান। সমস্তরের সহকর্মীদের মনোভাবও বৈষম্যদুষ্ট। মোটকথা গোটা ব্যবস্থাটা এতটাই বৈষম্যমূলক যে, তা অর্ধেকেরই বেশি নারীসমাজকে শিক্ষাগতভাবে পশ্চাদপদ করে রেখেছে। তাই দেখা যায়, এ অঞ্চলের দেশগুলোতে সরকারি কর্মকর্তা পদে নারীর অনুপাত ১০ শতাংশ বা তারও কম। তাদের অধিকাংশই আবার সামাজিক খাতের সঙ্গে যুক্ত।

ভারতের সরকারি চাকরিতে বিবাহিত নারী নিয়োগে বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল, বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে। বিবাহিত নারীরা তখন সরকারি চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারত না। ফলে খুব কম মেয়েই সরকারি চাকরিতে যেত। পরবর্তীকালে এই বাধা দূর হলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নারীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ভারতের মোট সরকারি কর্মকর্তার ৮.৪ শতাংশ হচ্ছে নারী। ১৯৫১ সালে ভারতে প্রথম একজন নারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে যোগ দেয় এবং ১৯৮০ সালের আগে সেখানে কোনো মেয়েকেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করা হয়নি। কোনো মেয়েকে ১৯৭০ সালের পূর্বে পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা হত না। ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদানের কথা বলা হলেও গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদের চাকরি নারীর ভাগ্যে খুব কমই জুটেছে। এখনও ভারতের কোনো নারী মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব বা অর্থ সচিব পদে উন্নীত হতে পারেনি।

১৯৭৬ সালে সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরির ১০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৮৮ সাল নাগাদ সকল সরকারি কর্মকর্তা পদে নারীর সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এরপর ১৯৯৬ সালে অর্থাৎ নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের ২০ বছর পর সরকারি চাকরিতে নাবীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে

মাত্র ১০ শতাংশের অল্প কিছুটা বেশি হয়। এর অন্যতম কারণ হল সরকারি কর্মকর্তা পদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নারীরা ঘর সংসারের দায়দায়িত্ব, বিভিন্ন স্থানে বদলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, আরো ভালো চাকরির সুযোগ ইত্যাদি নানা সমস্যার জন্য ঐ চাকরিতে নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারে না। প্রাপ্ত তথ্যে তাই দেখা যায়, বিসিএস পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ মোট প্রার্থীর ১৪ শতাংশ নারী হলেও এদের মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ বিসিএস চাকরিতে যোগ দেয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের উচ্চপদে সামান্য কিছু নারীর পদচারণা লক্ষ করা যাচ্ছে। এদের মধ্যে মাত্র একজন সচিব, একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্ম সচিব পদে এবং ৪ জন নারী জেলা প্রশাসক, একজন কর কমিশনার ও একজন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন একজন নারী। পরিকল্পনা কমিশনে যদিও এখনও কোনো নারী সদস্য হতে পারেননি।

সিভিল সার্ভিসে নারী

দেশ	সিভিল সার্ভিসে নারী (মোট সংখ্যার %)	নীতি নির্ধারণী পদে নারী (মোট সংখ্যার %)
ভারত	৬.৮০	—
নেপাল	৭.৬৬	০.৪৬৩
বাংলাদেশ	৭.৮৮	০.০১২
শ্রীলংকা	২১.১	১০.২৩
পাকিস্তান	৫.৩৫	০.২৬৬

শ্রীলংকায় সরকারি কর্মকর্তা পদে নারীর সংখ্যা ২০ শতাংশের বেশি। ১৯৬৩ সালের আগে এখানে সরকারি চাকরিতে নারীর প্রবেশাধিকার রুদ্ধ ছিল এবং পরবর্তীকালে শ্রীলংকা অ্যাডমিনেস্ট্রেটিভ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পর সরকারি চাকরিতে নারীর দ্বার উন্মুক্ত হয়। ভারতের মতো এখানেও বিবাহিত নারীর জন্য সরকারি চাকরি নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে চাকরির জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার পূর্বে স্বামীর লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হত। এছাড়াও সিভিল সার্ভিসে ২০ শতাংশের বেশি নারী নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল এবং ১৯৭৮ সালে বিধিনিষেধ শিথিল করে তা ২৫ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়। অবশ্য পরে জাতিসংঘ সিডও সনদে স্বাক্ষর করার পর শ্রীলংকা সরকারি চাকরিতে নারীর কোটাভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। বর্তমানে এখানকার উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদের ২১ শতাংশই নারী। তবে গত ১১ বছরে প্রতি বছর ১.৫ শতাংশ হারে সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ১৯৯৮ সালের ১২ জন থেকে এখন শ্রীলংকায় উচ্চ পদে ১৩৫ জন নারী অবস্থান করছেন। ১৯৯৯ সালে মন্ত্রণালয়ের ৩২ জন সচিবের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন নারী। তবে অতিরিক্ত সচিব পদের মধ্যে নারী হচ্ছেন ৩৬ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১২ জন চ্যান্সেলারের মধ্যে একজন নারী এবং ১৯৯৯ সালে শ্রীলংকা প্রথম একজন নারীকে ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করে।

পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে জেন্ডার বৈষম্য খুব প্রকট। ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুযায়ী এখানে সরকারি কর্মকর্তা পদের মাত্র ৫.৪ শতাংশ হল নারী। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থ, পররাষ্ট্র—এই ধরনের মন্ত্রণালয়ের মোট চাকরির মধ্যে নারীদের অনুপাত ১০ শতাংশেরও কম। ১৯৯০ সালের শুরু পর্যন্ত পররাষ্ট্র বিভাগে নারী ছিলেন মাত্র ৫ শতাংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্তরের চাকরির ৫১ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্তরের চাকরির ৩০ শতাংশ নারী। খুব নগণ্য সংখ্যক নারী উচ্চ পর্যায়ের পদে আসীন হতে পেরেছেন। ১৯৯৩ সালে যেখানে যুগ্ম সচিব, চেয়ারম্যান বা পরিচালক পদে ৮০০ জন পুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে মাত্র ১৯ জন নারী যুগ্ম সচিব হবার গৌরব অর্জন করেছে। অবশ্য বর্তমানে একজন নারী মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং আরও একজন নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত রয়েছেন।

নেপালে শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার জন্য অধিকাংশ নারী সরকারি কর্মকর্তা পদের চাকরিতে যাবার পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবুও নেপালে সরকারি কর্মকর্তা পদের চাকরিতে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত ২০ বছরে সরকারি পদের সংখ্যা দ্বিগুণ হবার পাশাপাশি এসব পদে নারীর সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২.৬ শতাংশ থেকে ১৯৯৯ সালে তা ৭.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এখন নেপালের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশেষ পদে তিনজন নারী কর্মরত আছেন।

সাধারণত দেখা যায়, নারী কর্মকর্তাদের নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের মতো সামাজিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। আবার এসব সামাজিক খাতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত পদগুলো থাকে পুরুষের দখলে। যেমন ভারতের বন বিভাগে পুরুষদেরকে মাঠের কাজে যুক্ত করা হয় আর নারীরা হেডকোয়ার্টারে কম চ্যালেঞ্জিং কাজে নিয়োজিত থাকেন। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা পদের নিয়োগ মেধাভিত্তিক হলেও উচ্চ পদে পদোন্নতি রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে করা হয়। শ্রীলংকায় প্রশাসনিক পদে কর্মরত নারীদের অধিকাংশ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে কাজ করেন। যেমন স্বাস্থ্য খাতের ৮৯ শতাংশ নার্সই হলেন নারী। নেপালেও সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত নারীর ৯৩ শতাংশ হচ্ছে সার্ভিস স্টাফ; প্রফেশনাল ক্যাডার নয়। স্বাস্থ্য খাতেই সবচেয়ে বেশি নারী রয়েছেন। নার্স, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মী ধরনের চাকরিতেই মেয়েদের বেশি করে নিযুক্ত করা হয়। নেপালে এ পর্যন্ত মাত্র একজন নারী রাষ্ট্রদূত হতে পেরেছেন। সরকারি প্রশাসনে নারীর এই অধঃস্তন অবস্থান নারীর প্রতি গৎবাঁধা প্রচলিত ধ্যান ধারণার কারণে সৃষ্ট বৈষম্যকেই প্রতিফলিত করে।

অবশ্য এসব বৈষম্য দূর করতে ইতোমধ্যে নানা দেশে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারতের সিভিল সার্ভিসে আরো বেশি করে নারীদের আকর্ষণ করার জন্য সরকারিভাবে প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে টিভি সিরিয়ালও দেখানো হচ্ছে। আমলাতন্ত্রকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে ১৯৯৮ সালে কতকগুলো কর্মশালা পরিচালিত হয়। এর সুফল রূপে দেখা গেল ভারতের ৫ম পে কমিশন নারীর জন্য ১৩৫ দিনের মাতৃত্বকালীন

ছুটি ও পুরুষের জন্য ১৫ দিনের পিতৃত্ব ছুটি মঞ্জুর করার সুপারিশ করে এবং সরকার কর্তৃক এই সুপারিশ গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়।

জেন্ডার ইস্যুকে মাথায় রেখে বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত কোনো জনপ্রশাসন সংস্কার হয়নি। সাধারণত দেখা যায় যে, বিবাহিত দম্পতিকে এখানে একই জায়গায় পোস্টিং বা বদলি করা হয়ে থাকে। যদিও এ ক্ষেত্রে তাদের একত্রে পোস্টিং পাওয়ার বা বদলির আবেদন যে নিশ্চিতভাবে মঞ্জুর হবে, এমন কোনো কথা নেই। সরকার সিডও, বেইজিং, পিএফএ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার সাধিত হলেও এর কোনোটিই জেন্ডার ইস্যুর প্রতি নজর দেয়নি।

পাকিস্তানে আবার ১৯৭২ সালে একবার মাত্র প্রশাসনিক সংস্কার হলে তা সরকারি চাকরিতে নারীর পথ উন্মুক্ত করে দেয়। তবে এসব সংস্কারের পর সরকার নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে নারীর সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৬৩ সালের পর শ্রীলংকায় যতবার প্রশাসনিক সংস্কার ঘটে, তার সবগুলোই ছিল জেন্ডার অসচেতন।

তবে এ সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নারীরা সাধারণত সরকারি কর্মকর্তার চাকরিকে নিরাপদ কর্মসংস্থানরূপে বিবেচনা করে থাকে। বর্তমানে প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বিরাজ করলেও অনেক নারীই সরকারি কর্মকর্তার চাকরিতে তাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে এ পথেই নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে।

৬. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নারী

নারীর সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিগত দশকগুলোর তুলনায় বর্তমানে অর্থনীতিতে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে অনেক বেশি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার হার যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সেই মাত্রায় বৃদ্ধি না পাওয়ায় তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর গুণগত অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নারীশ্রমিক মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অসংগঠিত খাতের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষিত নারীরা আবার স্বাস্থ্যকর্মী বা শিক্ষকতা পেশার দিকে ঝোঁকে, যা কিনা সাধারণত মেয়েলি কাজ বলে বিবেচিত। সম্প্রতি নারীরা ব্যাংকিং এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় খাতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উচ্চ পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। সরকারি খাতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুটিকতক নারী নির্বাহী পদে আসীন; সে তুলনায় ব্যক্তিগত খাতের নির্বাহী পদে নারীর সংখ্যা কিছুটা আশাব্যঞ্জক। অর্থনীতিতে নারীর প্রতি বৈষম্য কেবল চাকরির ধরন ও মজুরির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রেও তারা যৌনপীড়নসহ নানা নিপীড়নের সম্মুখীন হন।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নীতি নির্ধারণী অবস্থানে নারী

এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই নারীদেরকে চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী, বিজ্ঞানীরূপে কিছুটা দেখা গেলেও ব্যবসায়ী বা অন্টারপ্রেনার হিসেবে এখনও তাদের সংখ্যা খুবই কম। ১৯৮৮ সালে ভারতে ১০ হাজারেরও বেশি ব্যবসার মূল মালিক ছিলেন নারী। বেসরকারি খাতের নারীদের অধিকাংশই সেখানে বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, কেবল ১৩ শতাংশ নারী ক্ষুদে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। অবশ্য ব্যবস্থাপকসহ উচ্চ পর্যায়ের পদে নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। অন্যদিকে ভারতে সরকারি খাতে নারীশ্রমের উপস্থিতি অনেক বেশি। রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত প্রায় ৪৮ শতাংশ নারী আছেন সরকারি দপ্তরে, বিশেষ করে স্থানীয় কাঠামোতে। এরপরই রাজ্য সরকারে ১৭ শতাংশ নারী কর্মরত। বিগত ১৫ বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে নারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

নারী অন্টারপ্রেনারদের ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে পাকিস্তান সরকার প্রথম নারীব্যাংক স্থাপন করে। এই ব্যাংকের নির্বাহী পদসহ সকল কর্মকর্তাই নারী। কিন্তু সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারী ব্যবস্থাপক নেই বললেই চলে। বর্তমানে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত নারীর ২ শতাংশের কম ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা পদে আসীন। ১৯৯৭ সালে পাকিস্তানের ৩টি সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল কর্মচারীর মধ্যে নারীর অনুপাত ছিল খুবই কম—প্রায় ২ শতাংশ। গত শতাব্দী থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হলেও এ ব্যাপারে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ১৯৯৪-৯৫ সালে একজন নারী কেবল পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশনের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হন।

সাক্ষরতার উচ্চ হার সত্ত্বেও শ্রীলংকায় গুটিকতক নারী ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণী পদে আসীন হতে পেরেছেন। বিগত দশকে ব্যবস্থাপনা পদে নারীর অনুপাত ১৭ শতাংশেই আটকে আছে। অবশ্য সেই তুলনায় বেসরকারি খাতে নারীদেরকে আরো বেশি সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। বেসরকারি খাতে অধিকাংশ নারীরাই ম্যানুফ্যাকচারিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা, বাণিজ্য, সেবা ইত্যাদিতে ব্যবস্থাপক পদে নিযুক্ত রয়েছেন। ১৯৯৭ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত মোট নারীর ২৩ শতাংশ ছিল ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত। অন্যদিকে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত নারীদের বেশিরভাগই হল স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক পরিসেবার সঙ্গে যুক্ত। নেপালে রাষ্ট্রীয় এন্টারপ্রাইজে কর্মরত ৭০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ১০ হাজার। গত কয়েক বছরে এখানে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা অপেশাদার ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী পর্যায়ে আটকে থেকেছে। পেশাগত ও ব্যবস্থাপক পর্যায়ে ৩ হাজার পুরুষের বিপরীতে নারী রয়েছেন মাত্র ৩০০ জন। তবে সরকারি খাতের চেয়ে বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপক পদে নারীর সংখ্যা বেশি—প্রায় ২৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের সরকারি করপোরেশনগুলোর নারী কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত কম। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ১০ শতাংশ পদ নারীর জন্য সংরক্ষিত থাকলেও মোট ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাত্র ৬.৪ শতাংশ হচ্ছেন নারী। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন করপোরেশনে মোট কর্মচারীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৫ শতাংশের কম। তবে সচিবালয়ের সম্প্রসারিত অংশ—রাজধানীতে অবস্থিত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও বিভাগে নারী প্রতিনিধিত্ব কিছুটা বেশি—মোট কর্মচারীর ১৩ শতাংশ। বাংলাদেশ সরকারের চাকরিতে নারীদের জেলা কোটা ১৩ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেলা পর্যায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে মোট কর্মচারীর মধ্যে নারীর অনুপাত ৫ শতাংশেরও কম।

বেসরকারি কর্পোরেট সেক্টরে নারী

দেশ	ব্যবস্থাপক ও পেশাগত পর্যায়ে নারী (% ১৯৯০)
শ্রীলংকা	২২.৩
বাংলাদেশ	১২
নেপাল	১৭
পাকিস্তান	৪

বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে নারী শ্রমশক্তি সবচেয়ে বেশি যুক্ত হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পে। এখানকার মোট শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশ নারী হলেও ব্যবস্থাপক পর্যায়ে নারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এছাড়াও মেয়েরা আরো বেশি মাত্রায় ওষুধ শিল্প, ইলেকট্রনিক্স, পাট ও বস্ত্রকলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এসব নারী সাধারণত শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত হওয়ায় তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থানে রয়েছেন।

৭. সুশীল সমাজে নারী

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কেবল ভারতেই কর্মরত রয়েছে ৫ লক্ষের মতো এনজিও, যাদের অধিকাংশ নারী ইস্যুতে কাজ করছে। ১৯২৯ সালে এখানে যখন নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের উদ্যোগে নিখিল ভারত নারী শিক্ষা তহবিল স্থাপিত হয়, তখন এর লক্ষ্য ছিল কেবল নারী শিক্ষার প্রসার। বর্তমানে মূল শহরাঞ্চলসহ সমগ্র ভারতে এই সংগঠন ক্রিয়াশীল। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার উন্নয়নের অংশীদাররূপে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড স্থাপন করে। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে তহবিল প্রদান করা হয়। এখানে সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গড়ে ওঠা 'মহিলা মণ্ডল' (নারীগ্রুপ) নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। কতকগুলো রাজ্যে এসব নারীগ্রুপ নারী সমিতি রূপে নিবন্ধিকৃত হচ্ছে এবং নানামুখী সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ১৯৭৫-১৯৮৫ সময়কালে ভারতের সুশীল

সমাজের অনেক সংগঠন নারী ইস্যু নিয়ে কাজ করেছে। ১৯৮৫ সালে ভারত সরকার জনকার্যক্রম উন্নয়ন ও গ্রামীণ প্রযুক্তি বিষয়ক পরিষদ (CAPART) গঠন করে, যা গ্রামীণ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং পানীয় জল ও স্যানিটেশন প্রকল্পে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের পথ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে বহু সংখ্যক নারী ও পুরুষ এনজিও এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। নারী ইস্যুসহ বিভিন্ন জরুরি ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জাতীয় নারী কমিশন (NCW) ১৯৯৩ সাল থেকে ১০ হাজারেরও বেশি এনজিওর সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

দেশ ভাগের পরে ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের বিপুল আশ্রয়চ্যুত মানুষজনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে উইমেন্স ভলেন্টিয়ার সার্ভিস (WVS)। বস্তুত এটাই পাকিস্তানের প্রথম নারী সংগঠন—অল পাকিস্তান উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন (APWA)-এর ভিত গড়ে তোলে। এই সংগঠন দরিদ্র এলাকায় শিশুদের জন্য স্কুল চালু করা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি পাকিস্তানের সামাজিক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে পরিণত হয়। ১৯৬০ সাল থেকেই এই সংগঠন নারী অধিকারের জন্য লড়ছে এবং পাকিস্তানের অন্যান্য নারী সংগঠনের সাথে মিলে সংবিধানে মুসলিম পারিবারিক আইন সংযোজনের জন্য সফলতার সঙ্গে লবি করেছে। আশির দশকে কিছু কালাকানুন বাতিলসহ ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে গড়ে ওঠে উইমেন্স অ্যাকশন ফোরাম (WAF)। পাকিস্তানে বর্তমানে ১০ থেকে ৩০ হাজার এনজিও কর্মরত বলে ধারণা করা হয়। নারী উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য সামাজিক খাতেও এনজিওরা কাজ করছে এখানে।

সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে শ্রীলংকার অধিকাংশ সুশীল সমাজ সংক্রান্ত সংগঠন গড়ে ওঠে। বর্তমানে কর্মরত এনজিওর ৬৫ ভাগই গড়ে উঠেছে ১৯৭৭ সালের পর। এই সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ওপর মনোযোগ স্থাপন করেছে। শ্রীলংকায় প্রথম নারী ও উন্নয়ন বিষয়ক এনজিও গড়ে ওঠে ১৯৩০ সালে। এর লক্ষ্য ছিল সুশীল সমাজে গ্রামীণ নারীসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন। উইমেন্স পলিটিক্যাল ইউনিয়নসহ আরো অনেক নারী সংগঠন পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে। এসব শীর্ষ সংগঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী ব্যুরো গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এনজিওদের চাপের ফলেই শ্রীলংকায় আলাদাভাবে নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়। এখানে বর্তমানে ৫০ হাজারেরও বেশি সুশীল সমাজ সংগঠন বা এনজিও তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। এদের ২৯ শতাংশ জেন্ডার ইস্যুতে কর্মরত। এনজিওগুলোর ৫০ শতাংশ কাজ করে রাজধানী শহর কলম্বোতে এবং এদের ২২ শতাংশের মূল সংগঠক হচ্ছে নারী। নারীরা কিছু সুশীল সংগঠনেরও প্রধান। আর এদের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে নারী ইস্যুতে গবেষণা থেকে শুরু করে জেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সমাজসেবা পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৯০ সালের পূর্বে মাত্র ২২৯টি এনজিও নেপালে সমাজকল্যাণ পরিষদে নিবন্ধিকৃত হলেও, বিগত দশকে প্রচুর এনজিও গড়ে উঠেছে। এখানে এনজিওদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড সরকার কর্তৃক

কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তা সুশীল সমাজের কাছে ছিল হুমকি স্বরূপ। এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ার পর ১৯৯৮ সালে সেখানে ১৫ হাজার এনজিও কর্মরত ছিল, যাদের মধ্যে ৫ হাজার এনজিও নিবন্ধিকৃত। এ ধরনের প্রায় ৬০০ এনজিও এখন নারী ইস্যুতে তৎপর। মোটামুটি নারী ইস্যুতে কর্মরত সকল এনজিওর প্রধান কর্মকর্তা নারী এবং তাদের অধিকাংশ সদস্যও নারী।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে এনজিওদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে এনজিওদের দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং নানা সামাজিক ইস্যুতে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। আশির দশকে এনজিওরা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা প্রভৃতি সংগঠন দরিদ্র মানুষ, বিশেষত দরিদ্র নারীদের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করে। এ ছাড়াও প্রশিকাসহ অধিকাংশ এনজিও গ্রামীণ নারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, দারিদ্র্য এবং পুরুষতন্ত্রকে একই সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। কেননা তা আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে নারীদেরকে দূরে ঠেলে দেয়। অন্যান্য অনেক এনজিও আবার ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধরনের কমপক্ষে ৫০০ এনজিও কর্মরত রয়েছে এবং তাদের মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

নারী উন্নয়নে সুশীল সমাজ

নারী আন্দোলনকে সহায়তা করার পাশাপাশি নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ অঞ্চলের প্রবল পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজে নারীদের অবরোধ প্রথা, তাদের চলাফেরা ও তথ্যপ্রাপ্তির সীমিত সুযোগের কারণে নারীর কাছে পৌঁছানোটা প্রায়শই দুরূহ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ গ্রামীণ নারী কেবল তাদের অধিকার সম্পর্কেই অসচেতন নয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো স্বীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ইস্যু সম্বন্ধেও তারা উদাসীন। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নানা এনজিওসহ সুশীল সমাজের নানা সংগঠনে চাকরি বা স্বেচ্ছাসেবীরূপে কর্মরত। আর নারী হবার কারণে তারা গ্রাম ও শহরের নারীদের কাছে পৌঁছাতে পারছে।

এভাবে সুশীল সমাজের নানা উদ্যোগ নারীদেরকে সংগঠিত করাসহ নানা ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে চলেছে। যেমন পাকিস্তানের দাত্তা গুলামকা গ্রামের পুতুল তৈরির নারী কারিগরেরা এখন একটি আয় উপার্জনকারী এন্টারপ্রাইজে পরিণত হয়েছে। ভারতের স্বনিয়োজিত নারী সমিতি (SEWA) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হতে সাহায্য করছে। আগে এই খাতের মেয়েরা মজুরি বৈষম্য ও চাকরি হারাবার ঝুঁকির শিকার হত। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক বা ভারতের কর্মজীবী নারী ফোরাম (WWF)-এর মতো সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো

ক্ষুদে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তোলার জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে নারীর প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে নারীরা যেমন আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে, তেমনি তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে তারা আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে। এছাড়া এশিয়ায় আগা খান রুরাল সাপোর্ট প্রোগ্রামসহ অন্যান্য গ্রামীণ সহায়তা কর্মসূচি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রামে গ্রামে তৃণমূল সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং নারীরা এসব উদ্যোগের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে। এসব সংস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ কেবল তাদের ক্ষমতায়নই ঘটাচ্ছে না, সমাজে নারীর মর্যাদাও বৃদ্ধি করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারী শিক্ষা প্রসারেও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন বাংলাদেশের প্রশিকা, ব্র্যাক, ভারতের লোক জাস্থিস স্যানিটেশন থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য পর্যন্ত নানা স্বাস্থ্য ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি করে চলেছে। অনেক এনজিও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। ভারতের নার্স অ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় নারী আন্দোলন রূপে আরো ভালো কর্মপরিবেশের দাবিতে লড়াই করছে। তারা বেশ সাফল্যের সঙ্গে সহিংসতাসহ ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো যৌন অপরাধ মোকাবেলা করেছে। বাংলাদেশের সম্মিলিত নারীসমাজ ও যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চ যৌন নিপীড়নসহ নারীর প্রতি নানা বৈষম্য বিলোপের দাবিতে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। শ্রীলংকায় উইমেন ইন নিড (WIN) নামক এনজিও নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের সাহায্য করছে।

৮. ট্রেড ইউনিয়নে নারী

ট্রেড ইউনিয়ন তার সদস্য শ্রমিকদের দাবি দাওয়া আন্দোলন ও তাদের শোষণের তীব্রতা লাঘব করার প্ল্যাটফরম হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ খুব সামান্য। মূলত পুরুষ প্রাধান্যশীল শিল্পখাতে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করে থাকে। এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নারীশ্রমিক গার্মেন্টস, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মতো নিম্ন মজুরির কলকারখানায় যুক্ত, যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন করার কোনো অধিকার নেই। এসব খাত ট্রেড ইউনিয়নের আওতার বাইরে পড়ে রয়েছে। এভাবে তাই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিপুল 'সংখ্যক নারীশ্রমিক অসংগঠিত অবস্থায় মারাত্মকভাবে শোষিত হলেও ট্রেড ইউনিয়নে আসার সুযোগ পায়নি। অনেক নারীশ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত ধারণা একেবারেই নেই। যে সামান্য সংখ্যক নারীশ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, তাদেরকে আবার ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের মুখোমুখি হতে হয়। তাই পুরুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট এজেন্ডাই ট্রেড ইউনিয়নে প্রাধান্য পায় এবং নারী ইস্যুগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়।

আশ্চর্যজনকভাবে ভারতে আনাসুয়াবেন সারাভাই নামক একজন নারী আহমেদাবাদে সেই ১৯১৭ সালে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত

এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অথচ ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতৃত্বে নারীর সংখ্যা এখনও খুবই কম। এআইটিউসি, এআইএনটিইউসি, সিআইটিইউ-এর মতো সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো সম্প্রতি নারীশ্রমিকদের প্রতি নজর দিতে শুরু করেছে। ১৯৭৯ সালের শুরুতেই ভারতের বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন সিটু (CITU) তার এজেন্ডায় নারী ইস্যু যুক্ত করে। ঐ বছর সেখানে নারীশ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 'নারীশ্রমিকের কণ্ঠস্বর' নামের একটি জার্নাল প্রকাশিত হতে শুরু করে। যদিও ১৯৯৫ সালের তথ্যমতে সিটুর জাতীয় কার্যালয়ের নির্বাহী পদে কোনো নারী ছিল না। ১৯৯৫ সাল নাগাদ এআইটিইউ-এর জাতীয় কার্যালয়ের ২৭ জন সদস্যের মধ্যে নারী ছিল মাত্র দুজন। আইএনটিইউসি সম্প্রতি নারী ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসার জন্য ইউনিয়নের মধ্যে একটি নারীশাখা গঠন করেছে, যদিও এই সংগঠনের ২২ জন জাতীয় কার্যালয় সদস্যের মধ্যে কেবল একজন নারী।

অন্যদিকে পাকিস্তানের ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নারীদের সংখ্যা খুব কম হলেও তাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। যেমন অল পাকিস্তান ফেডারেশনের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সনসহ ২০ জন নারী (২৬ শতাংশ) নির্বাহী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। এখানে নারীদের আলাদা ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে—যেমন পাকিস্তান নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, যার সদস্য সংখ্যা ৫ হাজার। সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়নে নারীদেরকে সংগঠিত করার জন্য করাচির উইমেন্স ওয়ার্কার্স সেন্টার-এর মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে মুলতানে ওয়ার্কিং উইমেন্স ফেডারেশন এবং ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাবে উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদের নির্বাহী কমিটিতে নারীদের জন্য পদ সংরক্ষিত করে রাখছে; যদিও এসব উদ্যোগ খুবই সীমিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকেরাই এসব ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য।

শ্রীলংকায় ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ২০ শতাংশেরও কম এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীর অনুপাত একশতাংশের কম। ট্রেড ইউনিয়নের নারীদের সংগঠিত করা ও তাদের কল্যাণ সাধনের বিষয়টি এখানকার ট্রেড ইউনিয়নে গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয় না। ধর্মঘটসহ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে নারী শ্রমিকের নগণ্য অংশগ্রহণ হয়তো এই অবহেলার কারণ। তা সত্ত্বেও ১৯৮০ সাল থেকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও নার্স ধর্মঘটের মতো নানা কর্মকাণ্ডে নারী শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। চা বাগান, সচিবালয়, কেরানি, নার্স, শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় নারীর সংখ্যা বেশি হলেও পুরুষেরাই এখানে নেতৃত্বে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এবং এক্ষেত্রে নারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট জরুরি বিষয়গুলো ততটা মনোযোগ পায় না। নেপালেও ৩টি জাতীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নে নারীর সংখ্যা নগণ্য। নেপালিজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে নারীর অনুপাত সবচেয়ে বেশি—২৪ শতাংশ। ডেমোক্রেটিক কনফেডারেশন অব নেপালিজ ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির ৪ জন নারীর একজন ভাইস চেয়ারপার্সন পদে আসীন। এখানে প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নেরই আলাদা নারী শাখা

রয়েছে, যার প্রধান হলেন নারী। তবুও নারীরা ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে খুবই কম থাকায় নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবও খুবই সামান্য।

বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোতেও নারীদের অংশগ্রহণ নেই। এখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলো মূলত প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শিল্প কল-কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। এখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই নারী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কর্মরত, যারা ট্রেড ইউনিয়নের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের ৬০-৮০ ভাগ শ্রমশক্তি নারীশ্রমিক হলেও তাদের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। সম্প্রতি গার্মেন্টস নারীশ্রমিকদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে নারীশ্রমিকদের সংগঠিত করাটা এখনও একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে অনেক এনজিও তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদেরকে সংগঠিত করলেও, এর বাইরেও বিপুল সংখ্যক নারী পড়ে রয়েছে, যারা তাদের অধিকার এবং তা আদায়ের পথ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

গ. গভর্নেন্স : জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত

প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা গভর্নেন্সকে জেন্ডার নিরপেক্ষ বলে ধরে নেই, কেননা তা নারী বা পুরুষ কোনো একটি লিঙ্গের স্বার্থ বা আদর্শকে তুলে ধরে না। কিন্তু বাস্তবে গভর্নেন্সের মতবাদ, ধ্যানধারণা, প্রক্রিয়া, কাঠামো, কার্যক্রম—এ সবকিছুই সাধারণভাবে পুরুষের এবং নির্দিষ্টভাবে পুরুষদের বিশেষ অংশের পক্ষাবলম্বন করে থাকে। ক্ষমতার এই অসম অংশীদারিত্ব অবশেষে নারী পুরুষের মধ্যে সম্পদের (সময়, আয় উপার্জন, সম্পত্তি) অসম ভাগাভাগির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অসম বণ্টনের প্রতিফলরূপে আমরা অসম অনুপাতে বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর নারীকে চরম দারিদ্র্যদশার মধ্যে নিপতিত দেখতে পাই। তাই এসব বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজন গভর্নেন্সের বিদ্যমান প্রক্রিয়া ও কাঠামোর জেন্ডার বিশ্লেষণ।

সামগ্রিক বিবেচনায় পরিবার ও সমাজ গভর্নেন্সের স্থান বা ক্ষেত্র; অর্থাৎ গভর্নেন্সের আওতাভুক্ত। কেননা পরিবার ও সমাজে মানুষ পারস্পরিক ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় এবং এই পরিবার ও সমাজেই ক্ষমতার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ঘটে। আর গভর্নেন্সের এসব স্থান স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক—এই তিন স্তরের সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় অস্তিত্বমান। গভর্নেন্সের জেন্ডার বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যকার তথাকথিত বিভক্তিকে অস্বীকার করে এবং দেখায় যে কিভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন একে অপরকে প্রভাবিত করে।

প্রচলিত ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত হলে আমরা ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। ব্যক্তিগত বলে যে কিছু নেই, সবকিছুই যে সামাজিক জীবনেরই প্রতিবিম্ব—তা উপলব্ধি করতে পারি। যেমন পরিবারে নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সহিংসতাকে এখন ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক বিষয়রূপে দেখা হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বের অনেক

দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটা ব্যর্থতা লক্ষণীয়। দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন উপনিবেশবাদ থাকে নিজেদেরকে মুক্ত করলেও গৃহে স্বামীর ব্যক্তিগত শোষণ-শাসনের খপ্পর থেকে নারীদেরকে মুক্ত করতে পারেনি। আর এর কুফল পারিবারিক জীবনের পরিধিকে ছাড়িয়ে সমাজ জীবনেও প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের পরিমণ্ডলে পুরুষের মনোভাব ও আচরণ সমাজে, কর্মক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যেকার অসম সম্পর্ক ও ক্ষমতার বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করেছে। যেমন সুশীল সমাজের একটি সংগঠন যত আনুষ্ঠানিক হয়ে ওঠে, ততই তার উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। সুশীল সমাজের স্বশাসনের ধারণার মধ্যেও অনেক সময় সামাজিক গ্রুপ হিসেবে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব দেখানো হয়। কর্মক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের ক্ষমতা অসম। এর প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পেশায় (যেমন সেনাবাহিনী) নারীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধকরণ, মজুরি বা বেতন বৈষম্যের মধ্যে। এসব সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করে। শ্রমবাজারের এই অসমতা বেসরকারি খাত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

অন্যদিকে স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের পর্যায়ে গভর্নেন্সের জেন্ডার বিশ্লেষণ সর্বাগ্রে বৈষম্যমূলক প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে তুলে ধরে। অনেক সময় বলা হয়, স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ জেন্ডার বৈষম্যকে দূর করতে সাহায্য করে। কেননা বিকেন্দ্রীকরণ তৃণমূল মানুষের (সেই সঙ্গে নারীদেরও) প্রতিনিধিত্ব বাড়ায়। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর যথেষ্ট অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। তবে স্মরণ রাখা দরকার, 'উল্লেখযোগ্য সংখ্যক'-এর অর্থ কেবল নারীদের যথেষ্ট মাত্রায় সংখ্যাগত উপস্থিতি নয়, সেই সঙ্গে তা প্রভাব খাটিয়ে বা নারী নেতৃত্বের বৃদ্ধি ঘটিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করাটাকেও বোঝায়। আর এ অবস্থা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায় হল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অবস্থানরত অভিজ্ঞ নারীদের দ্বারা তরুণ নারী সহকর্মীদের দিকনির্দেশনা প্রদান, যা রাজনীতি সম্পর্কে নারীর ধারণাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

বস্তুত গভর্নেন্সের জেন্ডার বিশ্লেষণ নারীর অধঃস্তনতার বাস্তবতা এবং এর ভয়াবহতাকে তুলে ধরে। সেই সঙ্গে তা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আবার এটা ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ঠিক কোন এজেন্ডাটি বেছে নিতে হবে, তা আমাদের দেখিয়ে দেয় এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যে এভাবে আনা সম্ভব, তার নিশ্চয়তা দেয়। যেমন পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রথমেই নির্বাচন পদ্ধতিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কেননা তা নারীর অংশগ্রহণকে সমর্থন করে থাকে এবং সমান সুযোগ প্রদান ও ইতিবাচক কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের সংস্কার সাধন করতে পারে। এছাড়াও নারী বা পুরুষ সকল নীতি নির্ধারকের জন্য জেন্ডার প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। সেই সঙ্গে প্রচলিত ভাষা ও পুরুষালি পরিভাষা পরিবর্তনের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা এই প্রবণতা নারীকে অদৃশ্য ও হীন করে রাখে।

গভর্নেন্স বা সুশাসনে নারীর অংশগ্রহণ কেন জরুরি

প্রথমত নারীরা গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় গুণগত ভিন্নতা আনায়ন করে। এটা আজ স্বীকৃত সত্য যে নারীরা গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে নতুন ধ্যানধারণা, শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নয়া অ্যাপ্রোচ আনতে সক্ষম। কেননা নারীদের সুপ্ত, লুক্কায়িত এবং অব্যবহৃত বা কম ব্যবহৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা গভর্নেন্স প্রক্রিয়াকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। নারীদের অংশগ্রহণ রাজনীতি ও তার বিভিন্ন ইস্যুর ক্ষেত্রে গুণগত রূপান্তর সাধন করে থাকে। এছাড়াও দেখা যায়, গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় যুক্ত নারীরা সবার কথা শোনে, জনগণের মনোভাবকে গুরুত্ব দেয়, তাদের কথা বলার সুযোগ দান করে এবং কখনো ওপর থেকে মতামত চাপিয়ে দেয় না; বরং সবার মতামত শোনার পর বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত নারীরা উন্নয়নকে ভিন্নভাবে দেখে। পুরুষের বিপরীতে নারীরা উন্নয়নকে প্রচলিত সংকীর্ণ মাপকাঠিতে পরিমাপ করে না, তারা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নকে বিচার করে। এক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে তারা প্রাধান্য দেয়। আবার দেখা যায় পুরুষেরা যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি/সামাজিক সেবা পাবার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে মনোযোগী হয়; নারীরা সেখানে এসব সামাজিক সেবা নিজ এলাকাতেই পাবার জন্য উদ্যোগী হয়। এছাড়া নারীর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক জীবনঘনিষ্ঠ এবং তৃণমূলের বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত। তাই তারা তলা বা নিচ থেকে উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়।

তৃতীয়ত নারীরা জনগণের অধিক অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততাকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে সক্ষম, যদিও নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষের মতামত বিবেচনায় নেয়। কিন্তু দেখা যায় নারী নেতৃত্বের প্রতি একধরনের অবজ্ঞা থাকে। ফলে জনগণকে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে পুরুষের চাইতে নারীকে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়। পুরুষের পক্ষে একটি মিটিং ডাকা যত সহজ, নারীর ক্ষেত্রে ততটা সহজ হয় না। ফলে নারীরা জনগণকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য পুরুষের চাইতে বেশিমাত্রায় সক্রিয় হয়।

চতুর্থত নারীদের রয়েছে ভিন্ন ধরনের সহজাত দক্ষতা, যা তাদের নেতৃত্বের ধারণাকে উন্নত করে থাকে। সাধারণত সামাজিকভাবে গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় নারীরা অনুপস্থিত থাকার দরুন তাদের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয় না। কিন্তু আবার অপরদিকে তারা নেতৃত্বে নতুন হবার কারণে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক নেতৃত্বের অনেক মন্দ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকে এবং সেজন্য তারা নানাভাবে গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় অনেক নতুন ও ভিন্ন ধরনের রীতিনীতি সংযুক্ত করতে পারে। তাছাড়া দেখা যায় নারীরা অনেক বেশি সৎ থাকে এবং যে কোনো পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিখুঁত ও স্পষ্ট তথ্য তুলে ধরে। নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে নেতার চাইতে বরং নেত্রীরাই জনগণের কাছে সহজগম্য হয় এবং নেত্রীর কাছে জনগণ সাবলীলভাবে মত প্রকাশ করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

পঞ্চমত গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ঘরেবাইরে তাদের ভূমিকাকে পরিবর্তন করে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে। দেখা যায় গভর্নেন্স প্রক্রিয়ায়, বিশেষত স্থানীয় পর্যায়ে যুক্ত হয়ে নারীরা নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেয় যেমন কৃষি ও ভূমি সংস্কার, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, পানীয় জল সরবরাহ, জ্বালানি ব্যবস্থা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পারিবারিক কল্যাণ, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এসব করতে গিয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তাদের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ সক্ষমতার প্রসার ঘটে। এর প্রভাব তাদের পারিবারিক জীবনেও পড়ে। নারীরা উপলব্ধি করতে শেখে যে সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী-পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনীয়, তা কোনো শাশ্বত বিধান নয়।

শেষত দেখা যায়, নারীরা অনেক কম দুর্নীতিপরায়ণ হয়। বিভিন্ন দেশের সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা এখন প্রমাণিত যে, যেখানে সকল স্তরের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেশি এবং যেখানে সংসদে নারীর আসন সংখ্যা বেশি, সেখানে দুর্নীতির হারও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ক্ষমতার অপব্যবহারও সেখানে কম হয়।

জেন্ডার সংবেদনশীল সুশাসনের কর্মকৌশল

দক্ষিণ এশিয়ায় সংসদীয় আসনের মাত্র ৭ শতাংশ, মন্ত্রিপরিষদের মাত্র ৯ শতাংশ. বিচার বিভাগের ৬ শতাংশ ও সিভিল সার্ভিসের মাত্র ৯ শতাংশ নারীদের দখলে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতির মতো নানা ক্ষেত্রে নারীর এই নগণ্য অংশগ্রহণ গভর্নেন্স কাঠামোতে নারীর অস্তিত্বকে প্রায় অদৃশ্য করে তুলেছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারে নারী সংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলেও, মোট আসনের মাত্র ২০ শতাংশ হচ্ছে নারী। এমনকি মূল রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতৃত্বে নারীরা অবস্থান করলেও গভর্নেন্সের সকল স্তরে ভয়াবহ জেন্ডার বৈষম্য বিদ্যমান। কিছু কিছু দেশ বৈষম্য দূরীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কোনো দেশেই নারীরা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ক্ষমতা ও নীতিনির্ধারণী কাঠামোতে প্রবেশ করতে পারেনি, যা নারীদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে সক্ষম। সেজন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নীতিমালাকে নারীর অগ্রগতির পক্ষে প্রভাবিত করার জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকাকে শক্তিশালী করা আবশ্যক। সেজন্য ন্যূনতম করণীয় হচ্ছে :

- সকল আইনি, বিচার বিভাগীয় ও নির্বাহী কাঠামোতে নারীর জন্য অন্ততপক্ষে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা।
- প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই দলের নীতিনির্ধারণী কমিটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।

- নারী সাংসদদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা পদে নারীদের নিযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।
- গভর্নেন্স কাঠামোতে, সকল খাতে ও সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পুরুষ সাংসদ, বিচারক, সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকারের সদস্যদেরকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ দিতে হবে, কেননা তা গভর্নেন্সে জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- ইতোমধ্যে কতকগুলি আন্তর্জাতিক কনভেনশন ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, যা গভর্নেন্সের মধ্যে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্য ধারণাগত ও আইনগত কাঠামো প্রদান করেছে। এসব কনভেনশন খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করা দরকার।

বস্তুত গভর্নেন্স কাঠামোর সকল স্তরে নারীর পরিমাণগত ও গুণগত অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত, যা টেকসই উন্নয়নের পথকে সুগম করে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীদেরকে তাই গভর্নেন্সের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে যুক্ত হবার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী উভয় পর্যায়েই নারীকে সংযুক্ত করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, নারী, পুরুষ, সরকার ও সুশীলসমাজ প্রত্যেকের সুষম অংশগ্রহণ সুশাসনের অবিচ্ছেদ অংশ।

তথ্যসূত্র

Towards Good Governance, Kamal Siddyqui, UPL

Governance : South Asian Perspective, Edited by Hasnat Abdul Hye, UPL.

Problems of Governance in South Asia, Edited by V. A. Pai Pamandiker, UPL.

Towards Theory of Governance and Development, Edited by Rehman Sobhan, CPD.

Gcnderd Governance : An Agenda for change, Geargina Ashwarth, 1996, UNDP.

Human Development in South Asia 1999 : The Crisis of Governance, HDC, UPL.

Participation and Governance, Society for Participatory Research in Asia, November, 2000, New Delhi.

Women in Contemporary Democratization, Shahra Razavi, UNRISD

উন্নয়ন পদক্ষেপ জার্নালসমূহ।

ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী : বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান

আবেদা সুলতানা

১৯৯৫ সালে বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে কৌশলগত পদক্ষেপ নেয়া হয় : ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। মূলত PFA (Platform For Action) হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মূল দলিল। এটি বিশ্বের দেশে দেশে নারীসমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। PFA-এর লক্ষ হল নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবি অগ্রমুখী কৌশল NFLS-এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ ও সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল পরিমণ্ডলে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথে সকল বাধা দূর করা। এক্ষেত্রে বলা হয়, Women's equal participation in decision making is not only a demand for simple justice or democracy but can also seen as a necessary condition for women's interests to be taken into account. Without the active participation of women and the incorporation of women's perspective at all levels of decision making the goals of equality development and peace cannot be achieved. (UN, 1995 : 82)। যেসব ক্ষমতা-সম্পর্ক নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল। ক্ষমতাকাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ সকল বাধা দূরীভূত হবে, অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজব্যবস্থা তৈরি হবে। এ ব্যবস্থাই সমাজের গঠনকে আরো নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে এবং গঠনতন্ত্রকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

তবে শুধুমাত্র গণতন্ত্রই নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়নি। তাই বর্তমানের শ্লোগান হচ্ছে—"Democracy is not enough, we need gender justice." (UN. Vol. 5.67.)

রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারীসমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবলমাত্র গণতন্ত্র প্রকৃত গুণগত মান অর্জন করবে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মূল হাতিয়ার হল ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ প্রবন্ধে তাই বৈশ্বিক ও বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বিশ্লেষণমূলক চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হল।

অধ্যয়নের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বৈশ্বিক চিত্র ও বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র ও পরিস্থিতি অনুসন্ধান এ অধ্যয়নের মূল বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কত সংখ্যক নারী প্রতিনিধিত্ব করছে, অর্থাৎ রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দল মন্ত্রিসভা, আইনসভা, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদে নারী কিরূপ ভূমিকা রাখছে, তার একটি বিশ্লেষণমূলক চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস থাকবে। বিশেষভাবে এ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বৈশ্বিক চিত্র উপস্থাপন;
২. নারী-উন্নয়নের ধারায় অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের সচেতন নারীর ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ততার মাত্রা নিরূপণ;
৩. বাংলাদেশের নারীসমাজ ক্ষমতা-কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কিরূপ ভূমিকা রাখছে;
৪. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তথা উন্নয়নের জন্য এটা কতটা জরুরি ইত্যাদি।

বর্তমান লেখায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে তথ্যচিত্রমূলক বিশ্লেষণ থাকবে।

পদ্ধতি

এ অধ্যয়নে মূলত গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যায়নের মাধ্যমে পরিমাণগত সারণিও ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা, জার্নাল, দৈনিক পত্র-পত্রিকা, বই-পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনা তথ্য গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনীয়

তথ্য সংগ্রহে লেখক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, মন্ত্রিসভা, আইনসভা এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় ও নিম্ন পর্যায়কে ঘটনা (কেইস) হিসেবে পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশে নারী প্রতিনিধিত্বের হার তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিষয় ও সময় অনুযায়ী শ্রেণীকৃত করা হয়েছে এবং শ্রেণীকৃত তথ্যাবলি গুণগতভাবে তত্ত্ব ও যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

আধুনিক ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খুবই স্বাভাবিক : "Politics is one of the unavoidable facts of human existence, everyone is involved in some fashion at some fashion at some time in some kind of political system." (Dahl, 1965 : 1)। মানুষ হিসেবে নারীও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোনো জীব নয়। রাজনীতির মূল বিষয়ই হল ক্ষমতা। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হল রাজনীতি। ক্ষমতা অর্জন ও বজায় রাখার সংগ্রাম, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রয়োগ বা তার প্রতিরোধমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত (Robson, 1956 : 16)। A political system is any persistent pattern of human relationships that involves power, rule or authority. (Dahl, 1995 : 1)। এ কারণে ক্ষমতা রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় ধারণায় পরিণত হয়েছে। তাই ক্ষমতা রাজনীতি, নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম নির্ধারক। অথচ জেন্ডার বৈষম্যের কারণে নারী ক্ষমতা, রাজনীতি, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি থেকে আজও অনেক দূরে। জেন্ডারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীর অবস্থান প্রান্তিক। তাই রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব গৌণ কিংবা অদৃশ্য। অথচ নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেক অংশ নারী এবং বলা হয়—Political power is a key to gaining control over community's resources. Political participation is a means of gaining access to the power-structure, where decisions with regard to the allocation of resources amongst people and other issues of community's concern are made. (Salahuddin. 1995 : 1)। রাজনৈতিক দল হল জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এক্ষেত্রে বলা যায়, The participation of women in political parties is important because it provides a path to power and political decision making. It leads to participation in parliaments and other elected bodies, as well as nominations to positions in the cabinet or other political offices and the judiciary. (

সুতরাং রাজনীতিতে ও রাজনৈতিক দলে নারীর অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঙ্গে নারীর ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপস্থিতির মাধ্যমে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে। নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক হল জাতীয় সংসদ ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোয় তার উপস্থিতি। Women in politics and decision making positions in governments and legislative bodies contribute to redefining political priorities, placing new items or the political agenda that reflect and address women's gender specific concerns, values and experiences, and providing new perspectives on mainstream political issues. (UN, 1995 : 82)।

স্থানীয় রাজনীতি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হল ইউনিয়ন পরিষদ। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে জেন্ডার উপাদান সম্বলিত কার্যকর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা। সুতরাং জেন্ডার উপাদান সম্বলিত ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমঅংশীদারিত্বের মাধ্যমেই নারীর স্বার্থ ও সমস্যা জাতীয়-স্বার্থ ও সমস্যার অখণ্ড অংশ হিসেবে প্রতিফলিত হবে এবং নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গৃহীত হবে। তাই এই লেখার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই মূলত বিশ্লেষিত হবে এবং বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রের সমকালীন চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস থাকবে।

ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

লক্ষ করা গেছে, Women's representation at the highest levels of national and international decision making has not changed in the five years since the 1995 fourth world conference on women in Beijing. Women continue to be in the minority in national parliaments, with an average of 13 percent world wide in 1999, despite the fact that women comprise the majority of the electorate in almost all countries.

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ আধুনিক বিশ্বে ১৯৯৭ সালে ১৫ জন মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে ৬ জন এশিয়ায়, ৫ জন ইউরোপে, ৩ জন ল্যাটিন আমেরিকায় এবং ১ জন আফ্রিকায়। পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দর নায়েক একজন শ্রীলংকান তথা এশীয়। আধুনিক বিশ্বে তখন ৫ জন মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখানেও এশীয়দের সংখ্যাধিক্য। নির্বাচিত এ সকল প্রেসিডেন্ট হলেন আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরন সোবেট, ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো, নিকারাগুয়ার ভেলিয়াটা জুলিয়াস, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও আইসল্যাণ্ডের ভিগদিস ফিন বুগাদাত্তিব (ইত্তেফাক, ৫ জুলাই ১৯৯৭)। কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা কমে গেছে। যেমন ১৯৯৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান পদে ১০ জন নারী ছিলেন— বাংলাদেশ, গায়ানা, আয়ারল্যান্ড, লাটভিয়া, নিউজিল্যান্ড, পানামা, স্যানমেরিনো,

বন্দরনায়েক মারা গেছেন) ও সুইজারল্যান্ড। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে নারীমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্থানীয় সচিব ও দপ্তর প্রধান প্রতিনিধিত্বের অগ্রগতির হার অত্যন্ত মন্থর (Daily Observer, 6th June 2000)। জাতিসংঘের তথ্যসূত্র জানাচ্ছে :

In 1996, women made up 6.8 percent of cabinet ministers world wide, 7 percent in 1997 and 7.4 percent in 1998.

In 1999, there were only 677 female members of the upper house or Senate compared to 5,639 male members.

The majority of women ministers still concentrated in social sectors such as education, health and women and family affairs. (UNIC, 2000 : 3)

সংসদে গড়ে ৩৬.৪ ভাগ আসন নিয়ে আনুপাতিক হারের দিক থেকে নারীরা স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলো পুরোভাগে রয়েছে। সুইডেনের নিম্ন পরিষদে নারীর হার সর্বোচ্চ শতকরা ৪০.৪ ভাগ। জাতিসংঘ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে কিছুটা অগ্রগিত হলেও ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৫০ ভাগে উপনীত হবার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি বলে জানা গেছে :

Since 1 January 1999, the percentage of women on appointments subject to geographical distribution increased form 37.7 percent to 38.6 percent. Although the rate of progress is improving women's overall representation remains slow head way has been made in improving the representation of women at the senior and policy making levels. Since the submission of the Secretary Generals Strategic Plan of Action for the Improvement of the status of women in the Secretariat (1995-2000) in November 1994 the percentage of women of the Deputy Director level and above has risen form 15.1 percent to 29.7 percent.

কিছুদিন আগে ফিনল্যান্ডের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারজা হ্যালোনেন। এর মধ্যদিয়ে ফিনল্যান্ডের রাজনীতি ও সরকারি কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফিনিশ পার্লামেন্টের ২০০ সদস্যের মধ্যে ৭৪ জনই হচ্ছেন মহিলা। ইউরোপের মধ্যে ফিনল্যান্ডের মহিলারাই সর্বপ্রথম ভোটের অধিকার লাভ করেছিলেন।

ইউরোপের দুটি দেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্সে ১৯৯৭ সালে যে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, সেই নির্বাচনে মহিলারা উল্লেখযোগ্য তথা রেকর্ড সংখ্যক আসন পেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমা বিশ্লেষকগণ এটিকে বলেছেন, 'জেন্ডার রেভ্যুলেশন' (ইত্তেফাক, ৫ জুলাই, ১৯৯৭)। ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সের ৬৫৯ আসনের মধ্যে মহিলারা লাভ

করেছেন ১২০টি, পূর্বের তুলনায় মহিলা সাংসদ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপের আরেকটি দেশ ফ্রান্স। রাজনীতি যেখানে পুরুষের খেলা সেখানে ৫৭৭ সদস্যের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৫৭৭ জনের মধ্যে ৬২ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন যা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ। মন্ত্রিপরিষদে ৬ জন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদ—যেমন বিচার, পরিবেশ, যুব ও ক্রীড়া এবং সরকারি চাকরি সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। শুধু মন্ত্রণালয়ই নয় সংস্কৃতিমন্ত্রী ক্যাথরিন স্টেটম্যানকে জসপিনের মুখপাত্র নিয়োগ করা হয়। এছাড়া শ্রমমন্ত্রী মার্টিন আব্রে জসপিন না থাকলে তার স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অথচ ফ্রান্সে নারীর ভোটাধিকারের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৮৫ সালে এখানে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে।

নির্বাচন দুটির মাধ্যমে লক্ষণীয় বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল থেকেই মহিলা সাংসদ অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, রক্ষণশীলতা নারীর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক। গতিশীল সমাজে এই প্রতিবন্ধকতা ক্রমশ দূরীভূত হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপে আবার এর বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। সেখানে বাজার অর্থনীতি ও অবাধ সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংসদে নারীর হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বেকার শাসনামলে প্রবর্তিত মহিলা কোটার বিলুপ্তি পার্লামেন্টে তাদের সংখ্যা দারুণভাবে কমিয়ে ফেলেছে। অন্যান্য দেশের ক্রমোন্নতি হলেও পূর্ব ইউরোপের অভিজ্ঞতা প্রতিপন্ন করছে যে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নর-নারীর সমান প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেয় না (Daily

জাতিসংঘ চিত্র

নির্বাহী সচিব পদে পোল্যান্ডের দানুতা হারবাকে নিয়োগ দেন, যিনি জাতিসংঘের কোনো আঞ্চলিক কমিশনারের নির্বাহী সচিব পদে প্রথম মহিলা। এছাড়া জাতিসংঘের অপর চারটি আঞ্চলিক কমিশনের তিনটিরই উপ-নির্বাহী সচিব পদে মহিলা নিযুক্ত রয়েছেন—পশ্চিম এশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এবং আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন। নীতি নির্ধারণী ও নেতৃস্থানীয় পদগুলোতে বিপুল হারে মহিলা নিয়োগ করে জাতিসংঘ এমন এক মান অর্জন করেছে যা তার বেশিরভাগ সদস্যরাষ্ট্র এখনো অর্জন করতে পারেনি। আন্তঃপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১৬টি দেশের পার্লামেন্টে শতকরা ২৫ ভাগ বা তার বেশি মহিলা রয়েছেন। বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মিনিস্টার, ডেলিগেট, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি অব স্টেট, ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট বা সংসদ সচিব পর্যায়ে সরকারের নির্বাহী শাখার শতকরা মাত্র ১১.৭ ভাগ পদে মহিলা রয়েছেন। এছাড়া জাতিসংঘ প্রটোকল ও লিয়াজঁ সার্ভিসের

২০০০ সালের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে মাত্র ৮ জন মহিলা রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান ছিলেন। কিন্তু জাতিসংঘ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন ও নীতিনির্ধারণী পদগুলোতে মহিলাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পদে বর্তমানে শতকরা ২৪.৫ ভাগ মহিলা রয়েছেন। সার্বিকভাবে ২০০০ সালের ৩০ মার্চের হিসেবে শতকরা ৩৮.৯ ভাগ পেশাদারি ও স্টাফ পর্যায়ের উচ্চতর পদে মহিলা রয়েছেন। এখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব শতকরা বার্ষিক ১.২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মন্থর বলা যায়। এই হারে ২০১২ সালের আগে লক্ষমাত্রা অর্জিত হবে না। সার্বিক অবস্থা অবলোকনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও, এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ খুবই নগণ্য। আজও পৃথিবীর কোথাও নারীরা একজন পুরুষের মতো পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা উপভোগ করেন না (রহমান ১৯৯৮ : ৫২)।

বাংলাদেশের চিত্র

১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের PFA বা বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা বা বৈশ্বিক ঐকমত্যের রূপ (global concensus) বিশেষ। এই মূল দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯টি দেশ নারী উন্নয়ন নীতিমালার বৈশ্বিক রূপরেখা হিসেবে এই প্লাটফরম ফর এ্যাকশনকে পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছে এবং এর আলোকে নিজ নিজ দেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তা জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এই দলিলের মাধ্যমে দারিদ্র্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, নির্যাতন ও উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান সুযোগ এবং পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ, নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোঁজা হচ্ছে। কারণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত, যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং একটি অবিভাজ্য ধারণা (indivisible concept) বিশেষ। এক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়নের দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতনায়িত হলেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি নীতি নির্ধারণে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িত না হওয়ায় নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হবে। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

বর্তমানে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, Within the "development" discourse the concept of empowerment has evolved concurrently with the "bottom-up" approach to development as theorists and practitioners grappled with the challenge of articulating an alternative vision to moderninsation and a new framework of development.

এই প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন দর্শনে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে যা বোঝায় তা হল :

Good governance, legitimacy creativity for a flourishing private sector;

Transformation of economics to self reliant, indigenous, human centred development;

Promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects;

A process enabling collective decision making and collective action; and

Popular participation is a concept that has gained popularity within the development agenda. (Singh, 1995 : 12)।

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, Political empowerment is not only for sharing policy and decision making but also for the survival of women with dignity and to project and promote basic human rights of women. (UN, 2000 : 69)।

জেন্ডারসাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য দূর করতে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বেইজিং সম্মেলনের পর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ছাড়াও প্লাটফরম ফর এ্যাক্শন (PFA) বাস্তবায়নসহ নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষিত হয়, যা পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সংযুক্ত হয়েছে। এতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক (Micro and Macro) উভয় ক্ষেত্রেই নারী উন্নয়ন নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়বিচারসহ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনের মান-উন্নয়ন ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এর অংশ। নারীসমাজ দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং তাই তারা অর্ধেক জনশক্তির প্রতিনিধি। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অব্যাহত বৈষম্য এটাই প্রমাণ করে যে, উন্নয়ন বিনিয়োগ ও কর্মসূচিগুলো নারীর জন্য সমভাবে কোনো উপকার বয়ে আনে না। জেন্ডার বৈষম্য নারীর উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং তা দেশের পরিপূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার জাতীয় সামর্থ্যকেও সীমিত করে ফেলে।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধামন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদন নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড়ো অর্জন। এই নীতিমালা জাতীয়, স্থানীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে নারীইস্যুকে মূলধারায় নিয়ে আসার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর এ উদ্দেশ্যে যে কৌশলগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও তৃর্ণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা শক্তিশালীকরণ;
- জাতীয় মেশিনারি শক্তিশালীকরণ;
- এনজিও এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজের মধ্যে আরো সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন;
- জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
- জেন্ডারকে মূলধারা করতে সহায়তার জন্য প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সক্ষমতা গঠন;
- জেন্ডার ইস্যু সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি ও লবিং এবং গণতৎপরতা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নেটওয়ার্কিং;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

(পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল, ১৯৯৭-২০০০)

এ সকল কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য :

- নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা;
- পরিবার, সমাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমান ভূমিকা পালনসহ নারীকে উন্নয়নের সমান অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা করা;
- নীতিমালা সংস্কার ও জোরালো ইতিবাচক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর সমান অধিকার চর্চায় বাধাদানকারী সকল আইনগত, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক বাধা অপসারণ;
- নারীর ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও অগ্রাধিকার সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি/বৃদ্ধি এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন সাধনের অঙ্গীকার সুদৃঢ়করণ।

নারী-উন্নয়নের জাতীয় মেকানিজমের অন্যতম গুরুবাহী অংশ হচ্ছে WID focal points। মন্ত্রণালয়গুলো ইতোমধ্যে উইড ফোকাল পয়েন্ট, অ্যাসেসোসিয়েট ফোকাল পয়েন্ট প্রয়োগ করেছে। বেইজিং সম্মেলনের পর এই উইড ফোকাল পয়েন্টকে বিস্তৃত শক্তিশালী করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিসমূহের নীতি নির্ধারণী কাঠামোতে—যেমন গভর্নিং বোর্ড, নির্বাহী কমিটি, স্থানীয় প্রকল্প প্রণয়ন, সরকার কাঠামো এবং বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে নারীকে সরাসরি নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন বিগত সরকারের আমলে তিনজন নারীকে কূটনীতিবিদ ও

তিনজনকে যুগ্ম সচিব ও একজনকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০% ঊর্ধ্বতন পদে নারীকে নিয়োগদানের বিধান রাখা হয়েছে। গৃহীত এ সকল উদ্যোগের পাশে বিদ্যমান বাস্তবতা বিশ্লেষণে যে দিকগুলো বেরিয়ে আসে তা নিচে তুলে ধরা হল।

ক. রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলে নারী

এখনো বাংলাদেশে রাজনীতির অঙ্গনে নারী অবস্থানের যে বাস্তবতা, তা পরস্পর বিরোধী। কেননা বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রী একজন নারী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীও একজন নারী। সিদ্ধান্ত গ্রহণস্তরে এই দুই নেত্রীর প্রাধান্য প্রচণ্ড দৃশ্যমান হলেও সার্বিকভাবে বিরাজ করছে শূন্যতা। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়—সর্বস্তরে, বিশেষ করে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান তেমন ব্যাপক ও ক্ষমতা সংহতকরণে কার্যকর নয়। অর্থাৎ উপরিকাঠামোতে নারীর অবস্থান থাকলেও অধিকাঠামোতে তা প্রতিফলিত ও সুসংহত নয়। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক ক্ষেত্রে নারী প্রায় অনুপস্থিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটি দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, শুধু রাজনীতিতে নয়, রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও নারীর সংখ্যা নগণ্য। নিচের সারণি বিষয়টির সত্যতা তুলে ধরে।

সারণি-১

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	৩৬	৫
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৪	৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৪	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই-শুরা	—	০
	মজলিশ-ই-আমলা	—	০

সূত্র : রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত, ৩ জুন, ১৯৯৯

উল্লেখ্য যে, নারীর ক্ষমতায়নের ওপর বিগত ও বর্তমান সরকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্রিয়। তাদের এ আন্তরিকতার প্রকাশ নারী বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও

কার্যনির্বাহী সংসদের তালিকা অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দলীয় পর্যায়ে নেই। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষেত্রে একই চিত্র লক্ষণীয়। বিষয়টি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের দিক থেকে 'নেতিবাচক' বলে প্রতীয়মান হয়। অতএব নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক উদ্যোগকে প্রকৃতভাবে কার্যকর করার জন্য দলীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অনুপাতে নারী সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন।

খ. মন্ত্রিসভায় নারী

বর্তমানে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীসহ তিনজন মন্ত্রী অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্ববর্তী সরকারে ছিলেন ৪ জন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রিগণ 'নরম' বা গুরুত্বপূর্ণ বলে সচারচর বিবেচিত নয় এমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। মেয়েলি বা ফেমিনিন বলে চিহ্নিত মন্ত্রণালয়েই সাধারণত তারা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সমাজকল্যাণ, মহিলা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কো-অপরেটিভ ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের কথা। সুতরাং বিশ্বব্যাপী নারী মন্ত্রীদের দায়িত্বের ক্ষেত্রে 'নরম' বা গুরুত্বপূর্ণ নয় এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টনের প্রবণতা বাংলাদেশেও বিদ্যমান। তবে বিগত প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। বিগত সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য তিনজন মন্ত্রীর একজন কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, একজন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং আরেকজন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা বলা যায়, বাংলাদেশে মন্ত্রিসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে স্টেরিওটাইপড্ বা চিরাচরিত ছাঁচের বাইরে পা রেখেছেন। নিচের সারণিতে ১৯৭২-৯৭ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীদের শতকরা হার তুলে ধরা হল :

সারণি-২

মন্ত্রিসভায় নারী অংশগ্রহণের হার

সময়কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার %
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২-৭৫	৫০	২	৪
বিএনপি সরকার ১৯৭৬-৮২	১০১	৬	৬
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-৯০	১৩৩	৪	৩
বিএনপি সরকার ১৯৯১-৯৫	৩৯	৩	৫
আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬	২৪	৪	১৬

সূত্র : চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ সালে পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য, প্রবন্ধকার কর্তৃক নির্বাচন অফিস থেকে সংগৃহীত, ১৯৯৯

ওপরের সারণি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, জেন্ডারভিত্তিকভাবে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল—দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়। এর সাথে মন্ত্রী পরিষদে তার দুর্বল অবস্থানের একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।

গ. প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী

আধুনিককালে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রশাসনের সাথেই বেশি জড়িত। বাংলাদেশে আমলাতন্ত্রের শীর্ষ পর্যায়ের পদসমূহে এখনো নারী তেমন একটা নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা উদ্দেশ্য এবং আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে উচ্চকণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চস্তরে সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা আনার ব্যাপারটি নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের কেবল একটি অভীষ্ট লক্ষমাত্র নয়, গুরুত্বপূর্ণ কৌশলও। নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং স্ট্রাটিজিতে (NFLS) সত্যিকারভাবে সমতাকে নারীর জন্য বাস্তবতায় পরিণত করতে হলে পুরুষের সঙ্গে ক্ষমতার সমান অংশীদারিত্ব একটি মূল কৌশল বলে বিবেচিত হয়েছে, যা বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন-এ ঘোষিত নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত। নিচে বাংলাদেশের প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী অংশগ্রহণের হার তুলে ধরা হল :

সারণি-৩

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণের হার

পদ	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা হার (%)
সচিব	৪৮	১	৪৯	২.০৮
অতিরিক্ত সচিব	৫৫	১	৫৬	১.৮১
যুগ্ম সচিব	২৭২	৩	২৭৫	১.১০
উপ সচিব	৬৪২	৬	৬৪৮	০.৯৩

সূত্র : লোক প্রশাসন কম্পিউটার কেন্দ্র, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত, ৩ জুন, ১৯৯৯

উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত (সুলতানা, ২০০০ : ১৪৩)।

ঘ. আইন সভায় নারী

প্রথম সংসদ থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ২০৩ জন মহিলা সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এদের মধ্যে একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। সংসদীয় এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতিতে নারীর আগমন ত্বরান্বিত করেছে এমন কথা বলা যাবে না। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ ছিলেন মাত্র ৭ জন। ২০০১ সালের নির্বাচনে ৬। ১৯৯১-এর নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচিত নারী সাংসদ ছিলেন ৫ জন। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার খুব কম। সংরক্ষিত ৩০টি নারী আসনের প্রতিনিধিরা নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের পরোক্ষভোটে নির্বাচিত হতেন। ফলে নারী সাংসদগণ দেশের নারীসমাজের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেননি। তাই

প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। বর্তমান সংসদে সংরক্ষিত আসনগুলোও বিলুপ্ত।

বর্তমান সংসদের সংরক্ষিত আসনে তাই কোনো নারী নেই। সপ্তম সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষিত আসনে মহিলা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ শেষ হয়ে যায়। দেশের নারী সংগঠনগুলি অবশ্য সংসদে সংরক্ষিত আসনে নয়, সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ গত ১১ নভেম্বর এক কর্মশালায় বলেন যে সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি অষ্টম সংসদ চলাকালে পূরণ করা সম্ভব নয়।

অনেকেই মনে করেছিলেন ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং বিগত বছরের তুলনায় কমেছে। বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন লাভকারী ৩৭ জন নারীর মাত্র ৬ জন বিজয়ী হয়ে সংসদে এসেছেন। ১৯৯৬ সালের মতো এবারেও নারী প্রার্থীর সংখ্যা ১.৩৬ শতাংশেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিংবা বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা লক্ষ করা গেলেও ১৯৭৩-২০০১ পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক ধারা লক্ষণীয়।

বিগত বছরগুলোর নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী প্রার্থী ক্রমান্বয়ে ভোটারদের কাছে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। নিচের সারণিতে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হল :

সারণি-৪

সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে নারীর জয়লাভ	উপ-নির্বাচনে নারীর জয়লাভ	মোট নারীর জয়লাভ	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	সংসদে নারী আসনের হার (%)
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	—	—
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	১১*	২	৭	৩০	১১.২১

সূত্র : নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন ১৯৯৬, নারী ও উন্নয়ন; উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সংখ্যা ২৪, ২০০১

* শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

উপরের সারণি অবলোকনে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্তমান সংসদটি ছাড়া রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ এবং ২০০১-এর নির্বাচনে নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

ঙ. ইউনিয়ন পরিষদে নারী

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর হচ্ছে স্থানীয় সরকার। ইউনিয়ন পরিষদে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত হয় একটি নতুন আইন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : ১৯৯৭)। এতে নারীদের ৩টি (একতৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট অর্জন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনসহ বিগত নির্বাচনগুলোতে নারী প্রার্থীদের অবস্থান কেমন ছিল, তা সারণি-৫ এ তুলে ধরা হল (Qadir, 1994 : 6)।

১৯৯৭ সালের নির্বাচনেই প্রথম মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপার্সন ছিলেন ২০ জন। ১১০ জন সাধারণ সদস্যপদে এবং সংরক্ষিত আসনে ১২,৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট পদক্ষেপ। তবে বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ সকল সদস্যের ভূমিকা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অবস্থান ছিল প্রান্তিক।

সারণি-৫

ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে নারী অংশগ্রহণের হার

নির্বাচনের বছর	ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারপার্সন
১৯৭৩	৪৩৫২	—	১
১৯৭৭	৪৩৫২	—	৪
১৯৮৪	৪৪০০	—	৪ + ২ = ৬
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ (১% প্রায়)
১৯৯৩	৪৪৫০	১১৫	১৩ + ১১ = ২৪
১৯৯৭	—	—	২০

সূত্র : নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান এবং ড. সৈয়দা রওশন কাদিরের প্রবন্ধ, দৈনিক জনকণ্ঠ ১০ মে, ১৯৯৮

সংরক্ষিত নারী আসন ও নির্বাচন

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা নেই। ভোটের অধিকার, সমিতি ও সংস্থার অধিকার, প্রতিনিধি হবার সমান

অধিকার এতে স্বীকৃত হয়েছে (GOB, 1991)। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি (ধারা-৬৬, ১২২)। সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান করেছিল (ধারা-৬৫)। সংবিধানে নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রেরণে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীর প্রতি সমাজের অধঃস্তন মূল্যবোধ তথা জেন্ডার বৈষম্য লালনের একটি প্রয়াস ছিল বলা যায়। সুতরাং বাংলাদেশের মতো পুরুষাধিক্যের দ্বারা সৃষ্ট হেজিমনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নারী নিগৃহীত ও চিহ্নিত হচ্ছে অবহেলিত শ্রেণী হিসেবে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নারীর অবস্থান নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তৎপ্রসূত ও পরিচালিত রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা। কেননা রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি মূলত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। তাই নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তথা আইন পরিষদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। আমরা জানি, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নির্বাচন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া। এতে নির্বাচনের মাধ্যমে (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ) জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি আবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় জাতীয় সংসদে কিংবা স্থানীয় সরকারের স্তর বিন্যাসে।

১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (একতৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯টি ওয়ার্ডকে ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতিভাগে ১টি করে সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সরকারের নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত এই পদক্ষেপ একটি অনন্য অর্জন। আমরা জানি বাংলাদেশের আইনসভায় নারী প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনের বর্তমান সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়ে গেছে। এখন নারীসমাজের দাবি সরাসরি নির্বাচনের। কিন্তু এটি এখনো একটি অমীমাংসিত ইস্যু হয়ে আছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পিছিয়ে থাকলেও মোট ইউপি সদস্যদের ২২% ছিল নারী।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান এ অর্থে ভালো যে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী পুরুষ প্রার্থীদের পরাজিত করেই নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু এ দুজনই নয়, আরও আছে বা ছিলেন আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী, বিএনপির খুরশীদ জাহান হক, আনোয়ারা বেগম, জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-এর রওশন এরশাদ ও জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) এর তাসমিমা হোসেন। আর শুধু বাংলাদেশে কেন? পৃথিবীর বহু দেশেই সংরক্ষিত আসন ছাড়াই মহিলারা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছেন। শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো, ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার—সবাই সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তাহলে আমাদের নারী নেত্রীদের ক্ষেত্রে আপত্তি কেন? তবে এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। সংসদে সমাজের পশ্চাৎপদ শ্রেণী হিসেবে নারীর আসন সংরক্ষণ হত দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। এতে বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়ন না হয়ে দলের ক্ষমতায়ন হত। কারণ এ ধরনের একটি ব্যবস্থায় নারী ব্যবহৃত হত ক্ষমতা সংহত করণের কৌশল হিসেবে। সরাসরি নির্বাচনের দাবি তাই যুগোপযোগী বলা যায়।

লক্ষণীয় যে, উন্নত দেশে নারীর অবস্থান—শিক্ষা, সামগ্রিক অর্থনীতি, সব ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান হলেও বিশ্বে মহিলা সংসদ সদস্যদের হার মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়, ১১.৪ ভাগ। ইউরোপে এই হার ৩৬ ভাগ। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে এই হার ১২.২, ভারতে ৭, পাকিস্তানে ২.৮, শ্রীলংকায় ৩.৮ ভাগ। সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান ভারত ও শ্রীলংকায় নেই। নেপালে সম্প্রতি ৩৫টি আসনের মধ্যে ৩টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের আইন চালু হয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৭৩ সালে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২০টি করা হয় (জনকণ্ঠ, ২০ জুলাই ১৯৯৯)। সরাসরি নারী প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটিকে এখন বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা এবং বাস্তবতার আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এক্ষেত্রে কৌশল উদ্ভাবন এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে নারীর অগ্রগতি বেগবান হয়—নিছক প্রতীকী অর্জন বা উদারতা প্রদর্শনই সার না হয়।

সর্বশেষ মন্তব্য

ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অবস্থান ও অংশগ্রহণের চিত্র নির্ধারণের এই বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, সর্বক্ষেত্রেই নারীর ক্ষমতায়নে একটি প্রতীকী বৃদ্ধি ঘটেছে। জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জন এখনও দূর-ভবিষ্যতের ব্যাপার হয়ে আছে। কারণ, রাজনৈতিক জীবনে নর-নারীর অংশগ্রহণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন স্বীকৃত হয়নি। বাস্তবে ব্যবধান ব্যাপক। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামগ্রিকভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে, তার ওপর নারীর কোনো প্রভাব নেই। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর স্বার্থ ও দুশ্চিন্তার প্রতিনিধিত্ব নেই। রাষ্ট্রপ্রধান নারী হলেও তা নারীর সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে নারী অবস্থানের একটা সুফল রয়েছে। কারণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে স্বল্প হারের প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতির সমস্ত সিদ্ধান্ত রয়ে যায় পুরুষের অধীনে। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে নারীর অধঃস্তনতা অক্ষুণ্ন থেকে যায়, ফলে জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গৃহীত হয় না। তাই ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বশালী পুরুষতান্ত্রিকতাপ্রসূত প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি

প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণসহ কার্যকর, দক্ষ এবং পারস্পরিক শক্তি বৃদ্ধিমূলক জেন্ডার-সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য। তাছাড়া আরো প্রয়োজন রাজনৈতিক পেশার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা কর্মসূচির জন্য মানব ও আর্থিক সম্পদের অভাব এবং জনজীবনে জেন্ডারসমতা ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা। দরকার প্রণীত সংস্কার ও কর্ম প্রণয়নের আলোকে পুরনো আইনগুলোর যথাসম্ভব দ্রুত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা। আরো যেটি প্রয়োজন তা হল, যথাযথ নীতির আলোকে প্রণীত কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং আইনসমূহকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লাগসই কর্মকৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যমান বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য সবকিছুর সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। নতুবা জেন্ডার সমতা আনায়নে পারস্পরিক মতামত, অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনা বিনিময়ের মাধ্যমে কেবল এ্যাক্শন প্লান তৈরি হবে—এর সত্যিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অর্থাৎ সম্মেলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের যে মূল উপাদানগুলো পাওয়া যায়, তার সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্থাৎ ক্ষমতাকাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে নারী যথার্থ অর্থেই ক্ষমতায়িত হয়। এখন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

Salahuddin, Khaleda (1995), "Women's political participation : Bangladesh", In Haq, Jahanara et.al (eds), *Women in Politics and Bureaucracy*, Women for Women, February, 1995.

Singh, Naresh and Tiji, Vanglie (1995), *Empowerment: Towards Sustanable Development*, Zed Books Ltd, London.

UN (1995), *Report of the fourth world conference on women*, Beijing, China, 17 October 1995.

UN (2000), Vol. XII May 2000 UN. A monthly news bulletin from UNIC Dhaka.

Unnayan Podokkhep (2000), April-June 2000, Vol 5. No 2 Steps Towards Development.

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন

সাবিনা আক্তার

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্রায়ন, বিশ্বায়ন এবং সুশাসন সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলো বহুল আলোচিত, সেই সাথে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ভূমিকা অনেক, কিন্তু ক্ষমতায়ন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিত্ব এদেশের নারী অধিকার আদায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। গণতন্ত্রায়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। বাংলাদেশ এ রাষ্ট্রের বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাস হতে দেখা যায়, সামরিক তথা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক সরকার সবাই বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। অপর দিকে, সামরিক সরকার তার ক্লাইন্টাল তৈরির জন্য বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর ইউনিয়ন পরিষদের পটভূমি, ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির অবস্থান, সমস্যা এবং ভূমিকা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত সেইসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদের ঐতিহাসিক পটভূমি

ব্রিটিশ আমল থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সর্বভারতীয় মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন তৈরির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৯৩ সালে একটি বিল পাস করে। কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে এই আইনে অধিভুক্ত করা হয়। এরপর ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ শাসকরা নতুন করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ফলে ১৮৭০ সালে চৌকিদারি প্রথা প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় সনাতন পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কালে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যা পরবর্তীকালে ১৮৮৫

সালে বেঙ্গল কাউন্সিল হতে পাস হয়। এই আইন অনুসারে একটি তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এর সর্বনিম্ন স্তরটি ছিল ইউনিয়ন কমিটি। এর বেশ কিছুকাল পরে ১৯১৯ সালের আইন, গ্রাম বাংলায় 'নেটওয়ার্কিং' তৈরির জন্য পূর্বের চৌকিদারি প্রথা, ইউনিয়ন কমিটি প্রভৃতির স্থলে ইউনিয়ন বোর্ড নামে নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

আমরা জানি, ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের একটি অঙ্গরাজ্য ছিল। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিপ্লব বয়ে আনে ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র নীতি। মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল সর্বনিম্ন স্তর। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতি অধ্যদেশ নম্বর-৭ অনুযায়ী ইউনিয়ন কাউন্সিল, ইউনিয়ন পঞ্চায়েতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নম্বর-২২ ঐ নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ করে। এর দশ বছর পর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করে। ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, প্রতি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট নয়জন সদস্য এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য, অর্থাৎ মোট তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৯২ সালে স্থানীয় পরিষদ অধ্যাদেশ সংশোধনীতে এর মেয়াদ তিন বছর হতে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়।[১]

ইউনিয়ন পরিষদের বিবর্তনের ধারায় নারী প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব খুবই নগণ্য। পুরুষশাসিত সমাজে নীতি নির্ধারকগণ এভাবে নারীদের ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। তবে ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীদের সংরক্ষিত সব কয়টি আসনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। ৪২৭৬টি ইউনিয়নে নারীদের সংরক্ষিত ১২৮২৮টি আসনের জন্য ৪৪১৩৪ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।[২] ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো এই নির্বাচন হচ্ছে।

১৯৯৭ সালের চিত্র

নির্বাচিত নারীর অবস্থান

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অবস্থান সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ সচেতনতা, উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান কতটুকু, তা তার ভূমিকা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বাংলাদেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা ৫৩ ভাগ, তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ নির্বাচিত নারীর ৩০ ভাগই নিজস্ব ওয়ার্ডে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রায় ৫৮ ভাগ নারী যে ওয়ার্ডে নির্বাচিত হয়েছে সেই ওয়ার্ডে বৈবাহিক সূত্রে অবস্থানরত। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রথম পরিচয় পৈতৃক এবং দ্বিতীয় পরিচয় স্বামীসূত্রে। ইউনিয়ন

পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেহেতু উক্ত সূত্র ধরে অবস্থানরত, তাই নিজের ওয়ার্ডের সমস্যা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাসম এবং নিজের ওয়ার্ডের উন্নয়ন তার ব্যক্তিগত উন্নয়নসম। কাজেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবাসস্থান যেহেতু অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির নির্দেশক, তাই নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির আবাসস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। ৯৩ ভাগ নির্বাচিত প্রতিনিধির বাসগৃহ পাকা, অর্ধপাকা ও টিন শেডের। কাজেই তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বিদ্যমান। সাধারণত বলা হয় অভাবে স্বভাব নষ্ট কিংবা ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ।

নারীরা যেহেতু প্রায়শই স্বামীর পরামর্শে প্রভাবিত হয়, তাই তাদের স্বামীদের পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা দরকার। 'বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির' একটি গবেষণায় দেখা যায়,[৩] প্রতিনিধি নারীর স্বামী ১.৯৪% অক্ষরজ্ঞানহীন, ১৪.৭% প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন, ২৬.৯% উচ্চ বিদ্যালয় পাস, এসএসসি পাসের হার ২১.১%, এইচএসসি পাসের সংখ্যা ১৫.৫%। স্নাতক পর্যায়ে জ্ঞান রয়েছে ১৫.২% এবং অন্যান্য ৪.৪৪%। এদের বেশির ভাগই কৃষিজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং বেসরকারি চাকরিরত।

স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার স্তর	শতকরা হার
অক্ষরজ্ঞানহীন	১.৯৪%
প্রাথমিক স্তর	১৪.৭%
উচ্চ বিদ্যালয়	২৬.৯%
এস.এস.সি	২১.১%
এইচ.এস.সি	১৫.৫%
স্নাতক	১৫.২%
অন্যান্য	৪.৪৪%

নির্বাচিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করলে দেখা যায় এরা পারিবারিকভাবে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে ৪৪% স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজ কমিটির সাথে; রাজনৈতিক দলের সাথে ২৫%; মসজিদ বাজার এবং ঘাট কমিটির সাথে ২৩%; সমবায় সমিতির সাথে ১৫% এবং এনজিও এবং অন্যান্য সংগঠনের সাথে ৮% যুক্ত। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের পরিচিতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা তাদের নির্বাচিত হতে সহায়তা করেছে। এর ফলে তাদের দায়িত্ববোধ এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই কারণে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। যোগাযোগের অব্যবস্থা, সরু ও ভাঙা রাস্তাঘাট, নারীদের শিক্ষার অভাব, সীমিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক গ্রহণ এবং বিচারের অভাব প্রভৃতি স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। নির্বাচিত

প্রতিনিধিরা উক্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত। ১৯৯৭ এর নির্বাচনের পর নারী প্রতিনিধিদের উদ্যোগে বেশিরভাগ রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, সেতু নির্মাণ, বাজার তৈরি এবং ভিজিডিএ কার্ডের মাধ্যমে ১৬% গম যথাযথ বণ্টন করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়।[৪]

একটি গবেষণায় দেখা গেছে দুর্নীতি ও অদক্ষতার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়।[৫] নারী প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও সততা এই স্বল্প পরিসরেই লক্ষণীয়। অপরদিকে কিছু হতাশাব্যঞ্জক কথাও শোনা যায়।[৬] পুরুষ প্রতিনিধিরা নারীদের শোভাবর্ধনকারী অলঙ্কার মনে করেন। তারা নারীদের বক্তব্যকে মূল্যায়ন করেন না এবং তাদের কাজ করতে দেন না। ফলে নারী প্রতিনিধিদের একাংশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কাছে সশরীরে আবেদন করেছেন, কাজ করার পরিবেশের জন্য। কাজেই আমরা দেখছি যে সংরক্ষিত আসনে নারীরা নির্বাচিত হয়েছেন এটা আপাতদৃষ্টিতে নারীর ক্ষমতায়ন হলেও তা সত্যিকারের ক্ষমতায়ন নয়. কারণ তাদের মতামত প্রকাশের এবং কাজ করার সুযোগ সেখানে নেই।

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সমস্যা

নারীরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন, তাকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। একটি লিঙ্গবৈষম্য, অপরটি ত্রুটিপূর্ণ নীতি।

প্রথমত[৭] পুরুষ প্রতিনিধিরা তাদের কাজ করতে দেন না, তারা নারী বলে। নির্বাচনমণ্ডলী নারীদের অক্ষমতাকে উপহাস করে। এর কারণ সমাজ পুরুষশাসিত। পুরুষ প্রতিনিধিরা তাদের খারাপ ভাষায় সম্বোধন করেন, বিদ্রূপ করেন। সুযোগ পেলে তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। পরিষদের সভায় নারী প্রতিনিধিদের ডাকা হয় না এবং ঊর্ধ্বতন আদেশ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, সরকার তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়নি, তাই তারা কাজ পায় না। সভায় মহিলা সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা কিংবা তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাদের মতামত ও দস্তখত আবশ্যিক করা হয়নি।

মহিলাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা সরকার করেনি, যদিও তারা একেকজন তিনটি ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত। এ সত্ত্বেও তাদের পুরুষ প্রতিনিধির সমান বেতন দেয়া হয় না।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ১৯৭৩ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীতে স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের একতৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। সেক্ষেত্রেও নারীরা নির্যাতন এবং সমস্যার শিকার হয়েছেন,[৮] যেমনটি বাংলাদেশে বর্তমান ইউনিয়ন পর্যায়ে হচ্ছে। কাজেই নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি বৈষম্য যুগে যুগে, দেশে দেশে চলছে।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণঅংশগ্রহণ প্রয়োজন। গণঅংশগ্রহণের অর্থ শুধুমাত্র পুরুষের অংশগ্রহণ নয়। এদেশের মতো পিছিয়েপড়া সমাজে নারীর অংশগ্রহণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রথম ব্যাপক সংখ্যক নারী ভোটারের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। ১৯৯৭-এর ইউনিয়ন নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক নারী প্রতিনিধির নির্বাচন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। এই

সাফল্যকে অটুট রাখার জন্য পুরুষদের আধিপত্যমূলক মনোভাব দূর করতে হবে। সরকারিভাবে নারীদের কাজ নির্ধারণ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি। তাদের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা করে দেয়া প্রয়োজন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পুরুষ প্রতিনিধিদের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারেন, যা নারীর ভূমিকা পালনে সহায়ক হতে পারে। রাষ্ট্রে নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা কিংবা মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধির মতামতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। সর্বোপরি নারীর শিক্ষা, সচেতনতা, মনোবল এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বস্তরের জনগণের সদিচ্ছার প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী না হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না। ঠিক তেমনিভাবে একথাও স্বীকার করতে হবে, নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র

১. Sayeedul Huq; 1999; 'Union Praisad; the Local Govt. in Bangladesh' in Liberal Times (A forum for Liberal Policy in South Asia), Vol. VII; No-4.

২. Executive summary of workshop organized by Peace and Conflict Studies Department (DU) on State of Democracy in Bangladesh, held in 30-31st October, 2000.

৩. Elected women members of Union Parisad : A Socio Economic study; World Food Programme, December, 1999.

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রশাসন আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ভূমিকা, এরশাদ শাসন আমল, এম.ফিল. থিসিস; সাবিনা আক্তার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০০ (অপ্রকাশিত)।

৬. অধ্যাপক জেরিনা রহমান খান-এর উদ্ধৃতি; প্রাগুক্ত, Workshop on State of Democray in Bangladesh.

৭. Elected women members of Union Parisad : A Socio Economic Study; World Food Programme, Dec. 1999.

৮. George Mathew, 1999, 'Local self Government in India' in Liberal Times, A forum for Liberal Policy in South Asia, Vol-VII, No-4.

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিহিতার্থ : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের নারী

মালেকা বেগম

ভূমিকা

সমাজে নারীর মর্যাদা, অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে দেশে দেশে, যুগে যুগে দার্শনিক, সামাজিক ও চিন্তাবিদদের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। নিঃসন্দেহে এদের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে তেমনি রয়েছে অমিল। যে নারী বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক এবং শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ তার অবস্থা হচ্ছে শৃঙ্খলিত, অবদমিত, পরনির্ভর। নারী শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই অবস্থা? দায়ী কে? কে শোষণ করছে? বঞ্চিত করছে কে? এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতে হয় তথাকথিত সভ্যতা। ধর্মীয় অনুশাসন নারীকে নিচু অবস্থানে নামিয়ে, অবরুদ্ধ করে। শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের নীতি, বিধিনিষেধ, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও আইনের নামে এসব চলছে যুগ যুগ ধরে।

বিশ্বের জনসংখ্যার বাকি অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ। শ্রমশক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওরাই পূরণ করছে। মানুষমাত্রই নারী ও পুরুষ; সে জন্য নিপীড়িত নারীসমাজের মধ্যে ক্ষোভ থেকে আক্রমণ জাগে পুরুষদের প্রতি। কেননা নারীর তুলনায় পুরুষের অবস্থা অনেক মর্যাদাকর, স্বনির্ভর, স্বাধীন, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত এবং পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক বহুক্ষেত্রে পুরুষ নিপীড়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে পুরুষ এই অবস্থানে রয়েছে? কে তাকে এই মর্যাদা দিয়েছে? এককথায় উত্তর হচ্ছে তথাকথিত সমাজ ও সভ্যতা। কৃষি সভ্যতার উদ্ভবের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূত্র ধরে এল বংশধরের চিন্তা। সেজন্য স্ত্রী হল অবরুদ্ধ। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে তারই গর্ভে বংশধর রক্ষার স্বার্থে এবং আগের সকল মুক্ত স্বাধীন অবস্থান থেকে নারী হল বঞ্চিত। নারীর জন্য এক স্বামী নির্দিষ্ট হল। কিন্তু স্বামীর বহুগমন নিষিদ্ধ হল না। নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আধিপত্য খাটাবার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, আইন আশ্রয় নিল ধর্মীয় অনুশাসনের। এর মধ্য দিয়েই পুরুষ রয়ে গেল উঁচু পর্যায়ে। তার জন্য কোনো বিধিনিষেধ দেওয়া হল না। সমাজবিদরা বলেছেন, সভ্যতার

বিকাশের প্রতি পর্যায়ে সমঅবস্থান থেকে নারীকে নামিয়ে আনার জন্য রচিত হয়েছে নারীর অধিকার হরণের আইন ও বিধিনিষেধ।

কিন্তু নারী ও পুরুষ ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে শ্রেণীবিভাজন। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে রয়েছে একই রকম সমস্যা। ধনী নারী-পুরুষের অবস্থান দরিদ্র নারী-পুরুষের তুলনায় উঁচুতে। দরিদ্র নারী-পুরুষ শোষিত, বঞ্চিত। কাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থানের তারতম্য চিহ্নিত করে ভুল হচ্ছে না কি? এই প্রশ্নও সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা তুলেছেন। শ্রেণীবৈষম্যই সকল শোষণের মূল। মূলত এই তত্ত্ব পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিষয়ে পুরুষকে অন্ধ করে দিয়েছে।

হ্যাঁ, কথা ঠিকই। এমন কিছু চিহ্নিত করা ঠিক নয়, যা নারী ও পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগায় এবং মূল সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করে। সে জন্য আমি নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব মোটেও দেখাতে চাচ্ছি না। শুধু বলতে চাচ্ছি নারী কিভাবে সমাজ, ধর্মীয় অনুশাসন ও রাষ্ট্রের নীতি, আইন ও বিধিনিষেধে শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু নারীর শোষণ বঞ্চনার ইতিহাসে দুঃখজনকভাবে পুরুষের ভূমিকা যে শোষক, প্রতারক, শাসক, নীতিনির্ধারক, ধর্মযাজক, ধর্মীয় নেতা হিসেবে জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে, সেদিকে চোখ বুজে থাকি কিভাবে? ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব স্তরের, সব শ্রেণীর ও সমাজের নারীই নিজ নিজ সমাজ ও শ্রেণীর পুরুষের তুলনায় শোষিত, বঞ্চিত এবং অবদমিত বেশি এই সত্য অস্বীকার করার যুক্তি নেই।

আবার এ সত্যই বা লিপিবদ্ধ না করে পারি কী করে যে; নারীর এই অধঃস্তন শোষিত অবস্থান সম্পর্কে পুরুষ চিন্তাবিদ, সমাজবিদ, দার্শনিকরাই প্রথম প্রতিবাদ জানিয়ে এর অবসানের জন্য আন্দোলন করেছেন। নারীর নিচু অবস্থানের জন্য পুরুষ দায়ী নয়। কিন্তু সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র যে নীতি নির্ধারণ করেছে তাতে পুরুষ এগিয়েছে, নারী রয়েছে নিচুতে; কোনো ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই বাস্তব পরিস্থিতিই আলোচনার সূত্রপাত করেছে।

দাসপ্রথারও আগে নারীর দাসত্ব শুরু, সভ্যতার যুগে চলেছে নারী নির্যাতন-হত্যা

সমাজবিদ ও ইতিহাসবিদরা বলেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে দাসপ্রথারও আগে নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে, নারীই প্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। তাঁরা বলেছেন, দাসত্বের সূত্রপাত করেছে প্রভুত্ব। যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা এক অংশকে অন্য অংশের প্রভুত্বে দাঁড় করায় তা খুবই ভুল। মানবীয় উন্নতির এটিই প্রধান একটি বাধা। এসব তথ্য ও তত্ত্বের সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে নারী-মুক্তি আন্দোলন।

প্রাচ্যের সর্বত্র এবং বাংলাদেশে নারীর শোষিত-বঞ্চিত-অবদমিত অবস্থার জন্য সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রের নীতি, আইন ও বিধিনিষেধ দায়ী। বাংলাদেশে নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। বাঙালি হলেও ধর্মীয় পরিচয়ে নারীর অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রে নির্ধারিত হয়ে আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম নারী একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাম্য নেই। এর মূল কারণ ব্যক্তিগত আইন বা

ধর্মীয় আইনে নারীর প্রতি যে বিধিনিষেধ আছে সেটা দিয়েই সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার বিবেচিত হয়। প্রত্যেক ধর্মে নারীর অধিকার ভিন্ন রকম। যেহেতু ধর্মীয় বিধানে নির্ধারিত নারীর অধিকারকেই রাষ্ট্র প্রাধান্য দিচ্ছে সে জন্য বাঙলাদেশের নাগরিক হয়েও অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা নেই। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে নারীর সমঅধিকার স্বীকৃত হলেও পারিবারিক আইনে, কর্মক্ষেত্র নির্ধারণে ও সম্পত্তির অধিকারে, ভূমি আইনে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায়, প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণে বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে। সমাজের মধ্যে নারীস্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে, শুধুই পুরুষের প্রাধান্য মেনে নেওয়া হচ্ছে। এভাবেই সমাজ ও রাষ্ট্র নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বাড়াচ্ছে এবং নারীদের মধ্যেও ধর্মেরভিত্তিতে বৈষম্য বজায় রাখছে।

ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের সময় ১৯৪৭ সালে এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়েছিল ধর্মেরভিত্তিতে। ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানি শাসননীতি এ দেশের নারীর ওপর চাপিয়ে দিল অবরোধ। শিক্ষা ও কাজের অধিকার নিয়ন্ত্রিত হল। মেয়েদের স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেল, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা নিষিদ্ধ হল। পারিবারিক আইনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলল। বাঙালির ভাষা, জাতিসত্তা ও অর্থনীতির ওপর আঘাত এল। চলল সংগ্রাম।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। কিন্তু এ দেশের নারী সমাজসহ সকল নাগরিক সমাজের আন্দোলন, জীবন সংগঠন, কাজের ইতিহাসের সূত্র বা শিকড় অনুসন্ধান করতে হবে আবহমান বাংলার মধ্যে। অতদূর যদি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব না হয় তবে ১৯৪৭ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেই হবে। সেজন্য আলোচ্য প্রসঙ্গ 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিহিতার্থ · পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের নারী' আলোচনায়

পরিষ্কার বলতে চাই : ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেহেতু সমাজ প্রগতি ছাড়া নারী প্রগতি সম্ভব নয়, নারী প্রগতির অর্থও সমাজ প্রগতিকে সৃষ্টি করা— তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের সোচ্চার প্রতিরোধ রয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতার স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সরল ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করা। যুগে যুগে যে কোনো শাসন ব্যবস্থাই ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে মানুষের অধিকারকে খর্ব করেছে। নারীর অধিকার ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মানা হয় না। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন শুধু জামায়াতে ইসলাম নয়, গণতান্ত্রিক রাজনীতি যাদের ঘোষণায় রয়েছে, সেই সব দলও নারীর অধিকার বিষয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মতোই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়।

বিভাগোত্তর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী সংগ্রাম করেছিল স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশ শাসক স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগের ঘোষণা দিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশের প্রতিষ্ঠা হল।

ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ঘোষণার ফলে বীজ রোপিত হল এসবের :

ক. সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ভিত্তিক রাজনীতি;
খ. নারী অধিকার নিয়ন্ত্রণে ধর্মভি রাজনীতির প্রাধান্যের

এ থেকে পরিষ্কার ধারণা ও সূত্র পাওয়া যাবে নারী অধিকার অর্জনের পথে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যেভাবে বাধা হিসেবে বিরাজ করছে তার শিকড় প্রোথিত রয়েছে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ঘোষণার জঠরে, যা ঘটেছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে।

৪৭-এর পর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যারা রাজনীতিতে ধর্ম প্রাধান্যের তথা ধর্মনিরপেক্ষ সরকার, শাসক ও রাজনীতির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন করেছেন—স্বাধীনতার পর ক্ষমতায় আসে সেই শক্তির প্রধান দল। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিলেও বাস্তবে নারীর ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত করতে চায়নি এবং পারেনি।

সত্তর থেকে আশির দশকে অনেক উত্থানপতন ঘটেছে এ দেশে। হত্যার রাজনীতির সূচনা ঘটল। ধর্মভিত্তিক, সামরিক, গণবিরোধী শাসনামলের মধ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত শাসনামলও ছিল এই সময়কালে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, চল্লিশ থেকে ষাটের দশকে এবং সত্তর থেকে আশির দশকে ধর্মভিত্তিক শুধু নয়, সামরিক ও গণতন্ত্রবিরোধী স্বৈরাচারী রাজনীতির আঘাতও নারী অধিকারের ওপর এসেছে।

নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্রকামী জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের পতন ঘটায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা ঘটায়।

কিন্তু রাজনীতি থেকে ধর্মভিত্তি দূর হয়নি। এবং নারী অধিকারের ওপর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণও শিথিল হয়নি বরং অব্যাহত আছে।

এই পটভূমিতে আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন সময়ের ঘটনা ও ইস্যু উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা

১. ১৯৪৭-এর বিভাগোত্তর কালে পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকারের শাসন, শোষণ, দমননীতি এবং সাম্প্রতিক দাঙ্গার সূচনা ঘটল। তখন লাখো লাখো মানুষ মারা যায়। নিঃস্ব হয় লাখো নারী-পুরুষ। নারীরা লাঞ্ছিত হয়।

এভাবে রাজনীতি নারী ও মানবতার অপমান, লাঞ্ছনা ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ১৯৪৭-এর ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর দাঙ্গাবিরোধী মিছিল হয়। নারীরা যোগ দেন। শান্তি সেনা গঠিত হয়। নারীরা যোগ দেন।

২. অবিভক্ত বাংলায় গড়ে ওঠা সুপ্রতিষ্ঠিত 'আত্মরক্ষা সমিতি'কে বেআইনি ঘোষণা দেওয়া হল ১৯৪৮-এর ৬ মে। অনিচ্ছুক বহু সংগঠক নেত্রীকে পূর্ববাংলা ছেড়ে যেতে হল, দেশত্যাগ করতে হল।

৩. রাজনৈতিক পরিবেশ সামাজিক প্রগতির পক্ষে ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল পাকিস্তান হলে মুসলিমরা হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারবেন। পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তারা পরে হতাশ হন। শিক্ষা ও সম্পদে প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা রাজনীতিবিদ 'জোবেদা খাতুন চৌধুরানী' সাক্ষাৎকারে বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন ১৯৩৫ সালে। ১৯৪৩-এ মুসলিম লীগে যোগ দেন, ১৯৫৩ পর্যন্ত থাকেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

৪. মহিলা মুসলিম লীগ সদস্যা ও নেত্রীবৃন্দ আপওয়া (১৯৪৮), পাকিস্তান উইম্যানস ন্যাশনাল গার্ড, নেভাল রিজার্ভ (১৯৪৯) গড়ে তোলেন। নারী-পুরুষ মিলিতভাবে এই ট্রেনিং নিত। মুসলিম লীগের রাজনীতি ছিল নারীর অবরোধ সৃষ্টির উদ্যোক্তা। কিন্তু মহিলা সদস্যরা এই ধারার বাইরে নারীসমাজের প্রগতির লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সমাজের সংকীর্ণমনা পশ্চাদপদতাকে লালন করতে থাকে। আপওয়া ইত্যাদি সরকারি অনুমোদনে কাজ করতে গিয়ে প্রগতির চিন্তা থাকা সত্ত্বেও প্রচুর সীমাবদ্ধতার বৃত্তে ঘুরপাক খেতে এবং সরকারি দমননীতির চাপে নিষ্পেষিত হয়।

শুধু সামাজিক নয়, মুসলিম ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে নারীকে অবরুদ্ধ রাখার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারি পদক্ষেপ শুরু হল। গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে নারীশিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করা ও শিক্ষার্থিনীদের লাঞ্ছনা করানো হত।

শুরু থেকেই (১৯৪৮) সরকারিভাবে বেসরকারি সমাজসেবী নারী প্রতিনিধিদের বিরোধিতা করা হত। ১৯৪৮ থেকে মুসলিম লীগবিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হল।

অবরোধ

১. নারী শিক্ষার উদ্যোগ ছিল সে সময়। আর এটি মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখত। গ্রামের জোতদার মহাজন ও শহরের সম্পত্তিবান ধনী শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট ছিল। ধর্মভয় চাপিয়ে দেওয়া হল গরিব সাধারণ মানুষের ওপর। ৪৭-৫৪ পর্যন্ত 'নারী শিক্ষা বিধর্মীয় বেপর্দার কাজ' বিষয়ে গ্রামে গ্রামে যে ধর্মান্ধতা চালাবার চেষ্টা করে শাসকগোষ্ঠী, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রগতিশীল সংগঠনের বির্তক সভা হত—'জোতদারদের বাড়িতে মেয়েরা কাজ করলে বেপর্দার ভয় থাকে না, যত দোষ পড়ার জন্য ঘরের বাইরে এলে?'

   নারী শিক্ষা সংকোচন ও সংস্কার এবং শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিলের প্রতিক্রিয়ায় বলা হত এইসব প্যারেড মুসলিম ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

২. ১৯৫০-এ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধায় মুসলিম লীগ সরকার। আত্মরক্ষা সমিতি নিষিদ্ধ হওয়ার পর গড়ে ওঠা প্রগতিশীল মহিলা সমিতি এই দাঙ্গায় ভেঙে

যায়। দাঙ্গা প্রতিরোধে মহিলা সমিতির সদস্যরা সক্রিয় ছিলেন।
আবারও মুসলিম প্রগতিকামীরা সংগঠিত হন।

৩. ১৯৪৮-১৯৬২ : বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে দমননীতি চলে। উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র চলে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ফলে এটা হয়। বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা বলে চালাবার ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ায় ছাত্র-জনগণ সকলেই। ভাষা আন্দোলনের পর পর্দা নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে সরকারি বাধ্যবাধকতা হ্রাস পায়।

৪. ১৯৫২-১৯৫৮ : রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা বাড়ে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়। আশা জাগে। আবার সংকট দেখা দেয়।
নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। শিক্ষানীতিতে নারীর জন্য যে ধর্মান্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৪৭ থেকে চলছিল তার পরিবর্তন ঘটেনি।

৫. ১৯৫৮-১৯৭১ : সামরিক শাসন চালু থাকে। মা ও গৃহিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলাই নারী শিক্ষানীতির অন্যতম লক্ষ্য থাকে।

৬. মূল ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পরিবর্তন ঘটেনি ১৯৪৭-২০০০-এর মধ্যে। কিছু হেরফের ঘটেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা হয়েছে। মেয়েরা কাজে বের হচ্ছে। শিক্ষার বাধা নেই। কিন্তু সর্বত্র নিরাপত্তার অভাবের দোহাই দিয়ে অবরোধের অব্যাহত ধারা চলছে। ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হলের গেট সন্ধ্যায় বন্ধ হয়ে যাওয়া ও ছাত্রীদের ফেরার সময় বাইরে যাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে সান্ধ্য আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইস্যুর মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এখন মেয়েরা সন্ধ্যার পর হলের বাইরে থাকতে পারে। ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনের নৈশ অনুষ্ঠানে (১ জানুয়ারি, ২০০০) যোগ দেওয়ার সময় বাঁধন লাঞ্ছিত হয়। এই ঘটনায় বাঁধনের সূত্র ধরে সমগ্র নারীসমাজের বিরুদ্ধে রাতে পথে বের হওয়ার বিষয়টি অনৈতিক, অযৌক্তিক এবং অনুচিত বলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে বলতে থাকে। নারী নিরাপত্তাহীনতার দোহাই দেওয়া হয়। লাঞ্ছনাকারী পুরুষদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি নেই।

এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দল নিশ্চুপ। বলা হয় এসব ঐতিহ্য, বিষয়, সমাজ, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে কিছু প্রতিবাদ করা, একটা প্রচলিত ব্যবস্থাকে আঘাত করা সম্ভব নয়। সেই আঘাত রাজনৈতিক দল দিতে চায় না।

নারী অধিকার

১. ১৯৪৭-২০০০ সময়ের বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের আইন রচিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭-এর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধারা এখনো চলছে।

১৯৪৮-এ নারী অধিকারকে সংবিধানে আইনসম্মত করার জন্য নারী আন্দোলনকে এ দেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে সমঝোতা করেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে

হয়েছিল। এরপরও প্রতিটি শাসনামলে নারী আন্দোলনের প্রগতিশীল দাবিগুলো সরকারের ও রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মভিত্তিক রাজনীতির জালে আটকে রয়েছে।

প্রথমত, কোনো সুনির্দিষ্ট নারী অধিকারই যখন নবীন পাকিস্তানে ১৯৪৮ সালে ছিল না, তখন 'মুসলিম মহিলার ব্যক্তিগত আইনের শরিয়ত বিল'—এই শিরোনামে মহিলারাই দাবি ওঠায় এবং বহু সংগ্রামের পর ১৯৫১ সালে তা কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে বারবার কথা উঠেছে পঞ্চাশোর্ধ্বে বোরকা পরা নারী ছাড়া কারো সঙ্গে উলেমারা আলোচনায় বসবেন না।

গত শতকের ষাট, সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকগুলোতে এ দেশের নারী অধিকারের দাবি এবং সংসদ, সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বিন্দুমাত্র বদলায়নি। সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রচলিত পশ্চাদপদ ধ্যানধাবণার অব্যাহত অবস্থান রয়েছে। নারীর প্রতি প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, দৃষ্টিভঙ্গিকে বজায় রাখার প্রবণতা এখনো রয়েছে। নারীর জন্য সাংবিধানিক আইনের অধিকার ও পারিবারিক আইনের অধিকার পরস্পরবিরোধী। কিন্তু কোনো সংসদেই এটা দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। বিএনপির সাবেক সাংসদ ফরিদা রহমান বহুবিবাহ বন্ধের পর্যায়ক্রমিক বিল এনেছিলেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সঙ্গে সেটি কিছুটা সমঝোতাপূর্ণ হলেও তা পাস হয়নি।

একনজরে নারীসমাজের দাবিসমূহ

- সম্পত্তিতে সমঅধিকার,
- বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার বিষয়ক আইন,
- সন্তানের অভিভাবকত্বে মা-বাবার ক্ষেত্রে সমঅধিকার,
- সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন,
- পাসপোর্টে স্বামীর সম্মতির ধারাটি বাদ দেওয়া,
- যৌতুকবিরোধী আইন বাস্তবায়িত করা,
- নারী হত্যা নির্যাতন বন্ধ করা,
- নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ (সিডও) দলিলে সরকারের পূর্ণ স্বাক্ষরের দাবি,
- ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড তথা সিভিল কোড-এর দাবি।

ফতোয়া

১. ফতোয়ার বিস্তার রোধে রাজনৈতিক উদ্যোগ নেই।

২. ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি নগ্ন হামলা এই ফতোয়া।

১৯৪৭-২০০০ সালে নানা ধরনে, নানা কৌশলে এর ভিত্তি দৃঢ় ও বিস্তৃতি হয়েছে।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, আবুল হুসেন (শিখা গোষ্ঠীর নেতা), সুফিয়া কামাল, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ মুক্তবুদ্ধির ব্যক্তিদের সংগ্রাম এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে ছিল ব্রিটিশ যুগ থেকে—তারা প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বহু আঘাত পেয়েছেন।

এখনো নানা মুক্তবুদ্ধির ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। কিন্তু রাজনীতির ব্যক্তি বা দল নিশ্চুপ।

নারীসমাজ এসব প্রশ্ন তুলে নারীর ন্যায্য অধিকারের দাবি জানিয়েছে নানা সভায়, আন্দোলনে, রাষ্ট্রের কাছে, প্রশাসনের কাছে এবং রাজনৈতিক দলের কাছে। কিন্তু সবাই এ প্রশ্নে নীরব। ধর্মানুভূতিকে আঘাত করা যাবে না রাজনৈতিক স্বার্থে, ক্ষমতা রক্ষার স্বার্থে। ভোটের প্রয়োজনে রাজনৈতিক দল নারীর স্বার্থে কিছু ঘোষণা দিলেও বাস্তবে যখন দেখা যায়, আইন বদলাতে হলে ধর্মীয় বিধিনিষেধের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগছে, বা সামাজিক রীতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগছে, দলীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে তখন নারীর প্রশ্নে রাজনৈতিক দল ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও সরকার সবাই নীরব থেকে কখনো কখনো নারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকাও গ্রহণ করেন।

রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতি একে অন্যের পরিপূরক

মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ আলোচনা করে প্রশ্ন জাগে, পারিবারিক আইন কেন মুসলিম পারিবারিক আইন বলে অভিহিত হল? এ বিষয়ে নারীসমাজ সোচ্চার থাকলেও কোনো রাজনৈতিক দল ও সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, সংবিধানে সমঅধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে পারিবারিক আইনের মাধ্যমে সম্পত্তি, বিয়ে সন্তানের অভিভাবকত্ব, সাক্ষী প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ও নারীর প্রতি অমানবিক নির্যাতনের ভিত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। জাতিসংঘ সনদের প্রতি পূর্ণ স্বাক্ষর সরকার দিচ্ছে না পারিবারিক আইন বদল করতে হবে বলে। এক্ষেত্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি একই সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতির সব ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিনিষেধের সব কিছু মেনে নেওয়া হচ্ছে না (যেমন সুদ দেওয়া-নেওয়া স্বীকৃত, মদ-নেশা-জুয়া-রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত, দুর্নীতি, অসততা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট)। কিন্তু কী কঠোরভাবেই না ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে নারীর জন্য বৈষম্যপূর্ণ নির্যাতনের সমস্ত উৎস স্বরূপ পারিবারিক আইন চালু রয়েছে!

উদাহরণ দেওয়া যায় পতিতাবৃত্তি চালু থাকার বিষয় সম্পর্কে। ধর্মীয় বিধানে পতিতাবৃত্তি ঘৃণিত, রাষ্ট্রীয় আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু আদালতে নোটারি পাবলিক দ্বারা এফিডেভিট পদ্ধতিতে, পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ও পাহারায়, ডাক্তারি পরীক্ষার ছলচাতুরী চলছে পতিতালয়ে। ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ঘৃণার আগুনে জ্বলে পতিতার বাসস্থান, বিতাড়িত হয় রাজপথে, মানুষের ঘৃণার রাজপথ থেকে পার্ক, বাসাবাড়িতে আস্তানা গাড়ে দেহ ব্যবসায়ীর অধীনে। রাষ্ট্র নিপীড়কের ভূমিকা নিচ্ছে। আইনজীবী নিপীড়নের আইনগত ভিত্তি তৈরি করে। কোনো কোনো ফেমিনিস্ট আন্দোলন পতিতা পেশার অধিকার দাবি করেছে, প্রগতিশীল মহিলা আন্দোলন বন্ধ করতে চেয়েছে এই ব্যবসার মূল উৎস। কিন্তু রাজনীতি এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। পুড়ে মরে অসহায়, কর্মহীন দরিদ্র মেয়েরা। সামাজিক-অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা

অনিচ্ছায় বাধ্য হয় পতিতা হতে। সমাজের ওপর দায় চাপিয়ে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি কেমন গাঁটছড়া বেঁধে আপস করছে সামাজিক অনাচার বজায় রাখার জন্য এবং নারীকে সর্বনাশে ঠেলে দেওয়ার জন্য, এটা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বৈরাচার বা গণতন্ত্র কোনো শাসনামলেই এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

উদাহরণ দেওয়া যায় নারী পাচার, ধর্ষণ, যৌতুক বন্ধের ত্রুটিপূর্ণ ও নারীস্বার্থবিরোধী আইনের। নারী পাচারের দালাল সাজা পাচ্ছে না। পাচারকৃত মেয়েরা নিরাপদ হেফাজতের অপরাধপূর্ণ অন্ধ কুঠুরিতে পচে মরে। ধর্ষণকারীর সাজা মোটেও হয় না। কেননা ধর্ষিতাকে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রমাণ করতে হয় যে সে ধর্ষিত হয়েছে এবং সাক্ষী আনতে হয় ধর্ষণের। কী নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনায় ভরা এই আইন। ধর্ষণের সাক্ষী থাকলে ধর্ষণ হতে পারে না। ধর্ষিতার আলামত পরীক্ষার জন্য পুলিশ ও ডাক্তার দুর্নীতির প্রশ্রয় নেয় ও মিথ্যা রিপোর্ট দেয় বা সময় পার করে দেয়। যৌতুকের লক্ষাধিক মামলা বিচারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য অপেক্ষমাণ। রীমা হত্যার মতো বহু মামলা বছরের পর বছর অজানা রহস্যের জন্য বিচারের অপেক্ষায় থাকে।

এসব ক্ষেত্রে রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি কী বলে? কিছুই না। সংসদের বিজ্ঞ গণতান্ত্রিক অধিকারে সচেতন গর্বিত সদস্য-সদস্যারা কিছুই বলেন না। এ নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না।

উদাহরণ দেওয়া যায় মহিলাদের সংরক্ষিত আসেন নির্বাচনের বিষয় থেকে। পশ্চাদপদ নারীসমাজকে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে সঠিক বিবেচনায় কর্মক্ষেত্রে, সংসদে, ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষণ পদ্ধতি বা কোটা পদ্ধতির আইন ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন পদ্ধতির বদলে মনোনয়ন পদ্ধতি নারীসমাজের মধ্যে শঙ্কা ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে নারীর পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য নয়, মূলত দলীয়স্বার্থ রক্ষার জন্য ভোট পুঁজি হিসেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে ক্ষমতাসীন দলের প্রস্তাব সিদ্ধান্ত পাসের জন্য মনোনীত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন পদ্ধতি চালু রাখা হয়েছে। নারীকে এভাবে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি।

বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। কয়েকবার সামরিক শাসন চালু হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে তার পতন ঘটেছে। স্বৈরশাসনের পরিবর্তে এখন গণতান্ত্রিক শাসক নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু স্বৈরশাসক প্রবর্তিত এবং জনগণ কর্তৃক বাতিলকৃত ধর্মবিল এখনো বাতিল করা হয়নি। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ধর্মবিল বাতিল হলেও নারীর প্রতি অবমাননাকর, নিষ্ঠুর অমানবিক পারিবারিক আইন, অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে চালু থাকা নারীর প্রতি প্রদর্শিত অবহেলা, বৈষম্য, দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাদপদতা, সামন্তযুগীয় পুরনো ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতা—এসব তো বাতিল হবে না। তবুও নারীসমাজ মনে করে, ধর্মবিল বাতিল না হলে কূপমণ্ডূক সমাজের পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় গোঁড়ামি আরো বাড়বে এবং নারীসমাজকেই তা বেশি আঘাত হানবে।

নারীসমাজকে একাই লড়াই করতে হচ্ছে

এ দেশের নারীসমাজ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে একাই লড়াই করছে। রাজনৈতিক দলের এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। অতীত ইতিহাস থেকে বলতে হয়, পাকিস্তানি শাসনামলে শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ, শাসসুন্নাহার মাহমুদ, লীলা রায়, আশালতা সেন, নেলী সেনগুপ্ত, সেলিনা বানু, আনোয়ারা খাতুন, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, দৌলতুন্নেসা, নূরজাহান মুরশিদ প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ আইনসভায় ও রাজপথে নারীর ন্যায্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় কূপমণ্ডূক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দলীয় স্বার্থে নারীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে গঠিত পাঁচ দলের সম্মিলিত বিরোধী দলের নির্বাচনী ঘোষণার ৯ দফার ৮ নং ধারাটিতে পরিবার আইন (যাতে ইসলামি বিধানের কিছুটা সংশোধনী ছিল) বাতিল করার কথা ছিল। দাবিটি জানিয়েছিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও জামায়াতে ইসলাম। আইয়ুববিরোধী সংগ্রামে ঐক্য করতে গিয়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো নারীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে আঁতাত করতে দ্বিধা করেনি। অধ্যাপক রোকেয়া রহমান কবীরের (প্রয়াত) বলিষ্ঠ উদ্যোগে বেগম সুফিয়া কামালের (প্রয়াত) নেতৃত্বে নারীসমাজের দুর্বার প্রতিবাদে সেই রাজনৈতিক অপচেষ্টা বন্ধ হয়। দুটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী আঁতাত রেখে ৮ ধারার ব্যাপারে দ্বিমত জানায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী ২০ বছরেও এ রকম উদাহরণ রয়েছে। হত্যা, নির্যাতন, যৌতুক, এসিড-ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধের বিরুদ্ধে নারীসমাজকে তীব্র লড়াই করে আইন প্রণয়নে সাফল্য লাভ করতে হয়েছে। দুঃখজনক যে, নীতি নির্ধারণীতে, আইনসভায় নারীর স্বার্থে আইন প্রণয়নের জন্য মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের, রাজনীতিজ্ঞের অভাব রয়েছে। ফলে অর্জিত আইনগুলো মারাত্মক রকমের শুভঙ্করের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে কেড়ে নেওয়ার আইন রচিত হয়েছে।

রাজনীতিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বড়ই জটিল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা, পারিবারিক, অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালনের সমস্যা, রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতা, অবহেলা, করুণার দৃষ্টি, সমাজে নারীর নিচু হেয় অবস্থান—সব মিলিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে আছে। আইনসভায় নির্বাচনের প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব থাকে রাজনৈতিক দলের হাতে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে থেকে যেন শতকরা ২০ ভাগ মহিলা প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, সেটা নারী আন্দোলনের দাবি। কিন্তু এদিকে রাজনৈতিক দলের কোনোই দৃষ্টি নেই। কেননা পুরুষ সদস্যরা এতকাল রাজনীতি করেছেন, এলাকায় প্রতাপ ক্ষমতা বিস্তার করেছেন, দলের জয় তাদের দ্বারাই হবে।

অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, দলীয় রাজনীতি করতে গিয়ে মহিলা সদস্যরা তাদের 'মহিলা' পরিচয় মুছে ফেলতে বড়ই তৎপর থাকেন। শব্দটি বড়ই হীনম্মন্যতাসূচক তাদের কাছে। সংসদে তারা মহিলাদের জন্য কিছু বলতে নারাজ, তাদের কাছে মহিলাদের জন্য কোনো 'দাবিনামা' দিতে গেলে বা কথা বলতে গেলে অত্যন্ত বিরক্ত

হন, যেমন হন অনেক পুরুষ সদস্য। রাষ্ট্রপ্রধান বা দলীয়প্রধান মহিলা হতে পারবেন কি পারবেন না, মেয়েরা মাঠে-ময়দানে অফিসে কাজ করতে পারবে কি পারবে না, পর্দার অনুশাসন মানতে বাধ্য কিনা, বহুবিবাহ বন্ধ হবে কিনা, পারিবারিক আইনে মানবাধিকার থাকবে কিনা ইত্যাদি নিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা, সামাজিক অনাচারে সম্পৃক্ত কূপমণ্ডূক অপরাধীরা, ভণ্ড প্রচারকেরা যখন সোচ্চার হয় ওয়াজ মাহফিলে, মসজিদে, মন্দিরে, গির্জায়, সভায়, সেমিনারে, থানায়, আদালতে, প্রশাসনে, পত্র-পত্রিকায়, টিভি-রেডিওতে—তখনো একমাত্র নারী সংগঠনেরই প্রতিবাদ জাগে সভায়, রাজপথে, কাগজে-কলমে, আইন-আদালতে। রাজনৈতিক দলগুলো এসব নিয়ে নিজ সংগঠনে বা জনগণের কাছে কোনো কথাই বলেন না। আসলে রাজনৈতিক দলের এ এক ধরনের অবহেলা। সমাজের পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের আপোসকামিতার মূল কারণ হচ্ছে জনগণের মূল্যবান ভোট হারানোর ভয়, এই প্রচার রাজনীতিবিদরা করেন। উল্লেখ্য, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, জনতা, যুবককে সংগঠিত আন্দোলনে নারীসমাজ আহ্বান জানালে সহযোগিতা পেয়েছে, কিন্তু তারা নিজ উদ্যোগে প্রতিবাদ করেন না। নারী আন্দোলনের ইস্যুগুলো যে সামাজিক ও জাতীয়—তা রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্মীয় গোষ্ঠী সিভিল সোসাইটি উপলব্ধি করে না।

নারীসমাজের আন্দোলন চলছে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে

নারীসমাজের সংগ্রাম থামেনি। ওয়াজ মাহফিলে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই কম। মহিলাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে মহিলা জামায়াত, মহিলা তবলিগ জাতীয় সংগঠন।

এসব চলছে ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তবলিগের মধ্যে নির্যাতত মহিলারা বেশি রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় আইনে নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না, মানুষ অমানবিক থাকছে। মেয়েদের শারীরিক নানা অসুখ হলেও সেসব মানসিক, পাগলামি ইত্যাদি বলা হয়। রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনে নারীর বাস্তব মুক্তি হচ্ছে না। ফলে তবলিগের মধ্যে অনেকেই বিকল্প মুক্তির পথ খোঁজে। কিন্তু সেই জামায়াত ও তবলিগও যখন নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবার ইহলৌকিক কোনো সন্ধান দেয় না, দেয় পারলৌকিক সন্ধান, তখন হতাশ হয়ে অনেকেই আরো পশ্চাদপদ অবস্থায় ডুবে যায়।

এ অবস্থা থেকে নারীকে মুক্তির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগঠনের সাফল্যজনক পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জীবনের বাস্তব সংকট থেকে উত্তরণের জন্য দরিদ্র কর্মজীবী নির্যাতিত মেয়েরা পারিবারে, সমাজে দল ও সংগঠনে, কল-কারখানায়, অফিসে, আদালতে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে আদায় করতে চাচ্ছে ন্যায্য অধিকার।

বেইজিং চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন, ২০০০ সালের বেইজিং + ৫ অগ্রগতি বিষয়ক জাতিসংঘের পর্যালোচনা অধিবেশন ও জাতীয় কর্মকাণ্ড, এনজিও কর্মকাণ্ড, নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে সোচ্চার। এদিকে সমাজের কূপমণ্ডূক স্বার্থন্বেষীরা 'ফতোয়া' দিয়ে নারী প্রগতির পথ বন্ধ করতে চাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন-সংগ্রাম করছে।

নারী : রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন

শওকত আরা হোসেন

বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন দুজন নারী। একজন বেগম খালেদা জিয়া যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিগত বছরগুলোর প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী; দ্বিতীয় জন শেখ হাসিনা—বিগত প্রধানমন্ত্রী, বর্তমানে প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী। দুজন মহিলারই রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশের ইতিহাস প্রায় একধরনের। দুজনেই জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন আশির দশকের মধ্য ভাগে। দুজনেই এসেছেন পরিবারের রাজনীতিসম্পৃক্ত প্রধান ব্যক্তিত্বের নৃশংস হত্যার ফলে। দুজনের মধ্যে অবশ্য একটি পার্থক্যও ছিল। শেখ হাসিনা যুক্ত পাকিস্তানের ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, বেগম খালেদা জিয়া এর পূর্বে কোনোদিনই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একেবারেই একজন কন্যা ও গৃহবধূ।

দুজন মহিলার রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগণ্য। অবশ্য কিছু সংখ্যক মহিলা ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে যুক্ত, যাদের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। অন্যদিকে এদের মাঝে এমনও কেউ-কেউ আছেন যাদের রাজনীতিতে আগমন ঘটে ষাটের দশকে। তারপরও আরো তিন দশক পেরিয়ে নব্বই দশকের মধ্যভাগেও দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি প্রায় মহিলাশূন্য।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য

রাজনীতিতে মহিলাদের সম্পৃক্ত না হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে। এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করা এ-প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে রাজনৈতিক দলগুলো মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের উৎসাহ-উদ্দীপনা কেন দিচ্ছে না, জাতীয় নির্বাচনগুলোতে সাধারণ আসনে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপস্থিতি কেন নগণ্য,

মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কী ধরনের হওয়া উচিত—এগুলো আলোচনা করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের প্রধান বিষয়বস্তু। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কিছু সারণি প্রবন্ধে দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলকে প্রধানত আলোচনায় নেয়া হয়েছে। এই দলগুলো হল আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি এবং জামাতে ইসলাম। সাধারণভাবে প্রথম তিনটি দল মধ্যপন্থী কিন্তু ডানপন্থী ঘেঁষা বলা চলে। তবে জামাত সম্পূর্ণভাবেই ধর্মভিত্তিক কট্টর ডানপন্থী দল। এছাড়া বিশ্লেষণমূলক আলোচনার জন্য প্রবন্ধটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

নারী ও রাজনৈতিক দল

প্রথমত, এ প্রবন্ধে নারী ও রাজনৈতিক দল নিয়ে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে মহিলাদের রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলে কেন সম্পৃক্তকরণ কম, সেই বিষয়ে।

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত—অর্থাৎ যে অধিকারই আলোচনা করা হোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, পুরুষের সাথে তুলনামূলক বিচারে তাতে অনেক বৈষম্য রয়েছে।[১] অথচ বাংলাদেশ সংবিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী পুরুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। রাজনৈতিক অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের অন্যতম। এছাড়া সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮ (১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) এবং ৬৫(৩) নম্বর ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মাঝে কোনো ধরনের বৈষম্য রাখা হয়নি।[২] বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে নারী অবস্থানের যেমন বৈষম্য আছে, রাজনীতিতে একই চিত্র। প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন—সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য।

রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রাধান্য ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে কার্যকর। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, প্রাচীন সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক দায়িত্বশীলতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয় নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। কিছুদিন পূর্বে ১৯৯৫-এ উইমেন ফর উইমেন-এ 'রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্যান্ডি গ্রুপ' আয়োজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মতবিনিময় সভায় নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ এবং জামাতে ইসলাম যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা নিচে আলোচনা করা হল।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল : এ দলের মতে : (১) ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণেই নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না। তাঁরা আরো মনে করে, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই একশ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। (২) এছাড়া দলীয় কর্মীরা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। (৩) নারীরা যাতে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারে সে কারণে পুরুষেরা প্রচার করে, 'ইসলামে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়।'

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : এরা মনে করেন : (১) পারিবারিক কাজে মহিলাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় এবং (২) স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ অভিভাবকদের সমর্থন না থাকার কারণে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে।

জামাতে ইসলাম : এদের মতে নারীদের আরো অধিকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। তবে পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনীতিতে নারীর আগমন জামাতে ইসলাম পছন্দ করে না। এরা মনে করে যে নারীদের প্রথম দায়িত্ব সংসারে কাজকর্ম এবং সন্তান প্রতিপালন। সন্তান যখন হবে, তখন নারীরা ঘরের কাজ কর্মের সাথে সাথে বাইরের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে।[৩] লক্ষ করা যায়, নারীরা যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না তাই নয়, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং জামাতে ইসলামের কমিটিতে নারী সদস্য নেয়াই হয় না।

এখানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা দেয়া হল।[৪]

সারণি-১

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামাতে ইসলাম	মজলিশ-ই-শুরা	১৪১	—
	মজলিশ-ই-আমলা	২৪	—

উৎস : রাজনৈতিক দলসমূহের অফিস; উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ফর উইমেন, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৬

দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী-পুরুষ সমতা/সমানাধিকার অর্জনের জন্য কোনো বাস্তবমুখী কার্যাবলি গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগ 'সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর মর্যাদা' এই শিরোনামে দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্পদ বণ্টনে সমান উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা, নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতনের পথ বন্ধকরণে যথাযথ ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের ঘোষণাপত্রে 'নারীসমাজের সার্বিক মুক্তি ও প্রগতি' এই শিরোনামে বর্ণনা করে, 'বাংলাদেশের অর্ধেক নাগরিকই নারী। প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও কুসংস্কারের নিগড়ে অবরুদ্ধ বলে তারা জাতিগঠনমূলক জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি।' বর্তমানে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের এই প্রচেষ্টাকে আরও বলিষ্ঠ ও ব্যাপক করার জন্য জাতীয়তাবাদী দল ভবিষ্যতে সর্বাত্মক ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

জাতীয় পার্টিও তার দলীয় ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করে যে, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দলীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু অন্য দুটি রাজনৈতিক দলের মতো জাতীয় পার্টিও বাস্তবসম্মত কোনো কর্মসূচি মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে প্রদান করতে পারেনি।

জামাতে ইসলাম দলীয় ঘোষণাপত্রে বর্ণনা করে যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের মূল লক্ষ্য। ঐ রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনৈতিক/রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। নারীকে বঞ্চনার হাত হতে রক্ষা করে তাদের অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইসলামী আইনের মাঝেই নারী-অধিকার ব্যাপ্ত থাকবে। জামাতে ইসলামীর ঘোষণাপত্র বিশ্লেষণেও একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, মনে হয় তাদেরও রয়েছে বাস্তবমুখী সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের অভাব। আর এ দলতো প্রথমেই ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে, রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে, নারীর অধিকার ইসলামী মতে প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৫]

অন্যান্য অনেক পেশার মতো রাজনীতিও একটি পেশা। কিন্তু রাজনীতি পেশার একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য অনেক পেশার নেই। রাজনীতির কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। একজন পেশাদার রাজনীতিবিদ যে-কোনো সময় রাজনীতির আলোচনা করতে পারেন এবং আলোচনাটি অফিস, নিজস্ব গৃহ, গৃহের বাইরে যে কোনো স্থানে হতে পারে। এককথায় রাজনীতির কর্মক্ষেত্র গোটা দেশব্যাপী। একজন কর্মজীবী মহিলার কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্র না থাকলে তিনি পুরুষের চাইতে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হন। কারণ মহিলাকে অফিস এবং পারিবারিক দুটি দায়িত্বই পালন করতে হয়। দ্বিতীয়ত, মহিলাদের মাঝে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। তৃতীয়ত,

রাজনৈতিক পেশায় যে বিশাল খরচ হয় তা অনেক মহিলাই বহন করতে অক্ষম। চতুর্থত, পেশিশক্তি রাজনীতিতে যে অশুভ ছায়া বিস্তার করছে, সে রাহুর কবল থেকে রাজনীতি মুক্ত না হলে, মহিলারা ঐ পেশায় অংশগ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন।[৬]

তবুও বলা যায়, পরিবার, রাজনৈতিক দল এবং সমাজ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা পেলে অনেক নারীই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চাইবেন। তবে নারীর প্রতি রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক কর্মতৎপরতাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

নারী ও সংরক্ষিত আসন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন হল ৩০০। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৩০টি আসন। সবমিলিয়ে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩৩০টি। এখন তা আবার ৩০০ আসনে নেমে এসেছে। তবে একক ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসনের যে নির্বাচন হয়, সেই সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো বাধা নেই।

সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করার জন্য ইতিপূর্বে ৬৫ নম্বর ধারার মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছে। ১৯৭৩-এ সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। এই আসনগুলো দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭৯-তে নারী দশকের প্রভাবে এই আসন সংখ্যা ৩০-এ বাড়ানো হয়।[৭] নিয়মানুযায়ী ১৯৮৮ সনের সংসদে সংরক্ষিত আসন ছিল না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯১ সনে পুনরায় দশ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০১ সালে সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন নারীসমাজের দাবি সরাসরি নির্বাচনের।

সারণি-২

রাজনৈতিক দলের সাংসদদের সংখ্যা

নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
১৯৭৩	১৫	আওয়ামী লীগ
১৯৭৯	৩০	বিএনপি
১৯৮৬	৩০	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮	-	—
১৯৯১	৩০	বিএনপি ২৮ + জামাত ২
১৯৯৬	৩০	আওয়ামী লীগ ২৭ + জাতীয় পার্টি ৩

সংরক্ষিত আসনে প্রচলিত ছিল পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। এই আসনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী ছিলেন জাতীয় সংসদের সদস্যগণ। কিন্তু বাস্তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীগণই নির্বাচনে জয়ী হন। ফলে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন বাংলাদেশে কোনো সময়ই হয়নি, যা হয়েছে সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ, ১৯৮৬-তে জাতীয় পার্টি, ১৯৯১-এ বিএনপি (২৮ জন বিএনপি, ২ জন জামাতে ইসলামী), এবং ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগের (২৭ জন আওয়ামী লীগ, ৩ জন জাতীয় পার্টি) মহিলাগণ এই সকল সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করেন। উপরে সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা দেয়া হল।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে মহিলাদের মধ্যেই মতভেদ আছে। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই বিজয় সূচিত হয়। নির্বাচনপদ্ধতি পরোক্ষ থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে এ আসনে মনোনীত মহিলাদের তেমন কোনো যোগাযোগ থাকে না বললেই চলে। মনোনীত মহিলারা তাঁদের নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব সম্পর্কেও খুব একটা দৃষ্টিপাত করেন না। মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকা, সাধারণ নির্বাচনী এলাকা থেকে ১০ গুণ বড়ো। কাজেই এলাকার সাংসদ বা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে যথাযথ ভূমিকা মহিলা সাংসদগণ পালন করতে অপারগ।

সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পর ২০০১ সালে মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে কি না অথবা সংরক্ষিত আসন থাকলেও নির্বাচনপদ্ধতি কী ধরনের হবে, তা নিয়ে মহিলাদের মধ্যে মতবিনিময় এবং আলোচনা হয়েছে। আলোচনা সভাগুলোতে কতকগুলো বিষয়ে একই মতের প্রতিফলন দেখা যায়। মহিলাদের মতে সংরক্ষিত ৩০টি আসনের নির্বাচনী এলাকার স্থলে ৬৪টি জেলার জন্য ৬৪টি আসন সংরক্ষিত করতে হবে। নির্বাচন পরোক্ষ না হয়ে প্রত্যক্ষ ভোটে হবে। বর্তমান পদ্ধতিতে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন/মনোনয়ন করা যায় না। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে বিভিন্ন দলের মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। ফলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় একই সাথে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যবস্থায় সকল ভোট কেন্দ্রে একই সাথে দুটি বালট বাক্স থাকবে। ভোটারগণ একই সময়ে দুটি ভোট প্রদান করবেন।[৮]

তবে এ সকল মতামতের পাশাপাশি অনেকে মনে করেন মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি। তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন না হয়ে যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়ন দেয়া হত, সেটিও একটি দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জন্য মোটেই মানসম্মত পদ্ধতি নয়। ফলে নারীসমাজের এখন প্রধান দাবি সংসদে মহিলাদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ এবং সরাসরি নির্বাচনের।

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে মনে হয়, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হয়েও নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু বাহ্য কারণবশত এখনও অবহেলিত। এই অবস্থার উন্নতির জন্য মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ সমাজ এবং রাষ্ট্র উভয়কেই করে দিতে হবে, অথবা উদ্যোগ নিতে হবে। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সাংসদ নির্বাচনী প্রচারণার জন্য তার এলাকায় বেশি পরিচিত হন। নির্বাচনের পূর্বে এলাকার উন্নয়নের জন্য তাদের অনেক কাজ করতে হয়, যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় এবং পরিশেষে ভবিষ্যতের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। কাজেই এলাকাবাসীও নিজেদের উন্নতির জন্য যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিতদের ক্ষেত্রে এসব বিষয় তেমন প্রযোজ্য ছিলনা। কাজেই দেশের সার্বিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোট হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য একটি পদ্ধতি ভবিষ্যতের জন্য বের করা উচিত।

নারী ও সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৩ থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক। পাকিস্তান আমলের চেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এবং আশির দশকের চাইতে নব্বইয়ের দশকে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনেক বেশি সংখ্যায়। তবে ৩০০ আসনের সাথে তুলনামূলক বিচারে এখনো তা অকিঞ্চিৎকর।

সারণি ৩-এ সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার দেখানো হল।[৯]

সারণি-৩

সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার

বছর	মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে মহিলা জয়লাভ করেছে	উপনির্বাচনে মহিলা জয়লাভ করেছে	মোট মহিলা জয়লাভকারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	—	—
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	১১*	২	৭	৩০	১১.২১

* শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

উৎস : নারীবার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, উইমেন ফর উইমেন; নারী ও উন্নয়ন, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩১

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬-এর নির্বাচনে নারী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল অনেক।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ৩০০টি আসনের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন। এর মাঝে ২৮১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। ৩৬ জন নারী ৪৪টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রধান প্রধান দলগুলোর মাঝে আওয়ামী লীগ এবং গণফোরাম মহিলা মনোনয়ন সবচেয়ে বেশি দেয়। আওয়ামী লীগ ৪ জন এবং গণফোরাম ৭ জন মহিলাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল।

সারণি-৪

১২ জুন, ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীদের সংখ্যা

দল	মোট মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	৩০০	৪
বিএনপি	৩০০	৩
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩
ন্যাপ মোজাফ্ফর	১২৮	১
জাসদ (ইনু)	—	১
গণফোরাম	—	৭
জাসদ (রব)	—	১
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	—	২
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন	—	১
ভাসানী ফ্রন্ট	—	১
জাতীয় জনতা পার্টি	—	৪
বাংলাদেশ পিপ্‌লস পার্টি	—	২
জনদল	—	১
স্বতন্ত্র	—	৫
মোট	১০২৮	৩৬

উৎস : নারীবার্তা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুন ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন

সারণি ৪-এ ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর সংখ্যা দেয়া হল।[১০] এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র গণফোরাম ছাড়া অন্যান্য দলগুলো নারী প্রার্থী তেমন দেয়নি। প্রধান ৪টি দলের মাঝে তিনটি দল— আওয়ামী লীগ শতকরা ১.৩ এবং অন্য দুটি দল বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি শতকরা ১ ভাগ নারীকে দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নেতিবাচক একটি দিক। নির্বাচনে নারীরা জয়লাভ করতে সক্ষম হবেন কি না, এ বিশ্বাস এখনো রাজনৈতিক দলের মাঝে গড়ে ওঠেনি। যেখানে নারী সংগঠনগুলো

শতকরা ১০ অথবা ১৫ ভাগের জন্য আন্দোলন, তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনা করছে, সেখানে শতকরা একভাগ অথবা একভাগের সামান্য কিছু বেশি নারীপ্রার্থী দেয়ার অর্থই হল নারীদের ওপর এখানো রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী হিসেবে আস্থা রাখতে পারছে না। অথচ লক্ষণীয় যে, মোট ২৫৭৪ জন পুরুষ প্রার্থীর মাঝে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৭৩০ জনের, অর্থাৎ ৬৮.৫ শতাংশের। অন্যদিকে মোট ৪৮টি নির্বাচনী এলাকার ৩০টিতে অর্থাৎ শতকরা ৬২.৬ জন নারীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কাজেই এখনো জামানত বাজেয়াপ্তের দিক থেকে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম আছেন। অন্যদিকে ঐ নির্বাচনে শেখ হাসিনা একটি কেন্দ্রে ভোট পেয়েছেন শতকরা ৯২.১৮ ভাগ।[১১]

১৯৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে ৩৬ জন নারী প্রার্থীর মাঝে ৫ জন নারী ১১টি নির্বাচনী এলাকা হতে জয়লাভ করেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম রওশন এরশাদ, আওয়ামী লীগের বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং বিএনপির বেগম খুরশীদ জাহান হক। এঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ ভোটে পুরুষপ্রার্থীদের পরাজিত করে জয়লাভ করেন। শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনটি আসনে, বেগম খালেদা জিয়া পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পাঁচটি আসনে, জাতীয় পার্টির বেগম রওশন এরশাদ চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনে জয়লাভ করেন। সারণি ৫-এ বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিবরণ দেয়া হল।[১২]

সারণি-৫

১৯৯৬-র নির্বাচনের সাধারণ আসনে বিজয়ী মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিবরণ

প্রার্থী	নির্বাচনী এলাকা	প্রাপ্ত ভোট	মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ	মোট ভোট পড়েছে %	মোট ভোট
শেখ হাসিনা	গোপালগঞ্জ-৩	১,০২,৬৮৯	৯২.১৮	৭৯.৮৩	১,৩৯,৫৩৯
	খুলনা-১	৬২,২৪৮	৫৩.৯৩	৭৯.৭৬	১,৪৪,৭১৯
	বাগেরহাট-১	৭৭,৩৩৭	৫১,৩৫	৮২.৭৬	১,৮১,৯৮৬
বেগম খালেদা জিয়া	বগুড়া-৬	১০,০৩,৭৩৯	৫৮.৪৯	৭৮.১৯	২,৯৬,৪১৭
	বগুড়া-৭	১,৭৪,১৭১	৭২,০৮	৭৯.৫০	১,৮৭,৪৪২
	ফেনী-১	৬৫,০৬৮	৫৫.৫৬	৭৪.৫০	১,৫৭,২৪৮
	লক্ষীপুর-২	৫৯,০৯১	৫১.৬৫	৬২.১৯	১,৮৩,৮৪১
	চট্টগ্রাম-১	৬৬,৩৩৬	৪৮.১৭	৭৮.৫৩	১,৭৫,৪৩
বেগম রওশন এরশাদ	ময়মনসিংহ-৪	৭২,১৩০	৩৬.৪৪	৬৫,৪৮	৩,০২,২৬৬
বেগম মতিয়া চৌধুরী	শেরপুর-২	৬৩,৫৭৪	৪১.০১	৭৩.৪৪	২,১১,০৬১
খুরশীদ জাহান হক	দিনাজপুর-৩	৫১,৮০১	৩১.০২	৭৮.৭৮	১৯৩,৩০৫

উৎস : নারীবার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত

নারীপ্রার্থীগণ প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভের ফলে নারী প্রতিনিধির শতকরা হার সপ্তম জাতীয় সংসদে ছিল ২.৩৩ ভাগ এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে শতকরা ১১.২১ ভাগ।

১৯৯৬ সালে ১৫টি আসনের উপনির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ আসন থেকে বিএনপির মমতাজ বেগম এবং পিরোজপুর-২ আসন থেকে জাতীয় পার্টির তাসমিমা হোসেন বিজয়ী হন। অবশ্য দুটি আসনই তাদের দুজনের স্বামীর ১২ জুনের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ছেড়ে দেয়া আসন। মমতাজ বেগম পেয়েছেন ৪৫,৪৪১ ভোট এবং তাসমিমা হোসেন পেয়েছেন ৩১,০০৭ ভোট।

১৯৯৬-এর জুন নির্বাচন কয়েকটি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অধ্যায় রচনা করেছে। এই নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। এর মাঝে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৮৭,৫৯,৯৯৪ এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৭৯,৫৬,৯৪০। এই নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে শতকরা ৭৩.৬১ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়েছে। ঐ নির্বাচনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলারাও ভোট প্রদান করেন এবং মহিলা ভোটাররা নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হনও পুরুষের চেয়ে বেশি সংখ্যায়। কিন্তু মহিলারা বেশি সংখ্যায় ভোট দিলেও মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি।

আসলে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দান করার সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই প্রার্থীর কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। প্রধানত এলাকাভিত্তিক প্রচুর পরিচিতি এবং জনদরদী নেতা হিসেবে পরিচিতি থাকতে হয়। এছাড়া প্রচুর অর্থের মালিক হতে হয় এবং দলীয় ফান্ডে অনেক টাকা চাঁদা দিতে হয়। জাতীয় পর্যায়ে নেতাদের সাথে যোগযোগ থাকতে হয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মীদের নিজের কাজে ব্যবহার করার মতো যোগ্যতা রাখতে হয়। অথচ এ সকল বৈশিষ্ট্য খুব কম মহিলার আছে এবং অধিকাংশ মহিলারই নেই।

সচেতন মহিলারা মনে করেন, রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছা করলে রাজনীতিতে এবং নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী বা রাজনীতিকের হার বাড়াতে পারে। যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে শর্ত বা চুক্তি করে যে, শতকরা ১০ বা ১৫ জন মহিলা দল থেকে নির্বাচন করার জন্য মনোনীত হবেন, তাহলে মহিলাপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

সপ্তম সংসদীয় নির্বাচনে নারীরা সচেতনভাবেই প্রার্থীদের ভোট দি
কোনো রাজনৈতিক দল নারীকে সংঘবদ্ধ করতে পারলে সে-দলের পক্ষেই ভ
বেশিসংখ্যক সদস্যকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে নিয়ে আসা সম্ভব হবে
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর প্রতি করণীয় বিষয় এবং এগুলোকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়, সেই পদ্ধতিগুলোও সুনির্দিষ্ট থাকা উচিত। সপ্তম সংসদীয় নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে আওয়ামী লীগ নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রক্রিয়া ও নারী নির্যাতন রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করেছিল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিএনপি নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ১৬টি ধারায় নারীউন্নয়নের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছে। এই ইশ্‌তেহারে নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। সরকারি চাকরিতে মহিলাদের সুযোগ বৃদ্ধি,

কর্মজীবী মহিলাদের আবাসিক সুযোগ সম্প্রসারণ, নির্যাতিত মহিলাদের জন্য আইনের অধিকার গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজতরকরণ, নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়নের সক্রিয় পদক্ষেপ বিএনপি গ্রহণ করবে বলে উল্লেখ করে। জাতীয় পার্টি তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে নারীশিক্ষা প্রসারের কথা ব্যক্ত করেছে এবং সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যানুপাতিক হার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানোর কথা বলেছে। জামাতে ইসলামী নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও নারী নির্যাতন রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নারীদের শরিয়তি সীমার মধ্যে থেকে জীবিকা অর্জনের কথা এই ইশ্‌তেহারে ঘোষণা করে।[১৩]

চারটি দলের জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনী ইশ্‌তেহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি দলই নারীর উন্নতির জন্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগের জন্য যে-কর্মসূচি প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে নারী যে সম্পৃক্ত হতে পারে, তা কিন্তু কোনো দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ব্যক্ত করা হয়নি।

প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে নারীদেরকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের অবস্থা এবং অবস্থানের উন্নতি করতে চেয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে লিখেছে—সংসদে মহিলা আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ (৬০টি) করা হবে। প্রতি পাঁচটি সাধারণ আসন নিয়ে একটি সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকা গঠিত হবে। এছাড়া নারী নির্যাতক, নারী ও শিশু পাচারককে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্যে জেলায় জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদকে বাস্তবায়িত করা হবে।

বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংসদের আসন সংখ্যা পাঁচশতে বৃদ্ধি করা হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে আরও অধিকভাবে সম্পৃক্ত করা হবে এবং সহজ শর্তে ঋণদানসহ আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মহিলাদের ওপর নির্যাতনরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা হবে। শিশুদের প্রতি 'হ্যাঁ বলুন' এই প্রতিশ্রুতিকে বিএনপি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেবে।

জাতীয় পার্টি নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে বলেছে মহিলা আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে জেলাভিত্তিক ৬৪টি আসনে উন্নীত করা হবে। পারিবারিক আদালতকে শক্তিশালী করা হবে এবং শিশুমৃত্যুর হার রোধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনটি দলই নারীদের কথা নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে উল্লেখ করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এসকল

প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে যে সকল পদ্ধতি এবং পদক্ষেপ প্রয়োজন, তা কোনো রাজনৈতিক দলই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেনি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার নারী সংগঠনসহ অন্যান্য সংগঠনের দাবির মুখে নব্বইয়ের অনুরূপ একটি বিল তৈরি করে সংসদে আনে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোটের অভাবে বিলটি আইনে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসনের সুযোগটিও নষ্ট হয়। আওয়ামী লীগের বিলে অবশ্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা ছিল না। সংরক্ষিত আসন না থাকার ফলে বিভিন্ন নারী সংগঠন রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট দাবি করেছিল অধিক হারে মহিলা প্রার্থীকে নির্বাচনের জন্যে মনোনয়ন দেয়ার। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলই

নিবাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে ১১ জন, বিএনপি থেকে ৫ জন এবং জাতীয় পার্টি (এরশাদ) থেকে ৩ জন মনোনয়ন পান। আওয়ামী লীগ থেকে মহিলা প্রার্থী ছিলেন শেখ হাসিনা, সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, জিনাতুন নেসা তালুকদার, নাজমা রহমান, শেগুফতা ইয়াসমীন, কামরুন নাহার পুতুল, মাহ্‌মুদা সাওগত, রাশিদা মহিউদ্দীন, সুলতানা তরুণ এবং ড. হামিদা বানু শোভা। বিএনপি থেকে খালেদা জিয়া, খুরশীদ জাহান হক, ইলেন ভুট্টো, নাবিলা চৌধুরী এবং মা মা চিং। জাতীয় পার্টি এরশাদ থেকে রওশন এরশাদ, সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, মমতাজ ইকবাল।

৩৭ জন মহিলার মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে দুজন—শেখ হাসিনা এবং ড. হামিদা বানু শোভা; বিএনপি থেকে তিন জন—বেগম খালেদা জিয়া, খুরশীদ জাহান হক এবং ইলেন ভুট্টো এবং জাতীয় পার্টি থেকে রওশন এরশাদ—মোট ৬ জন মহিলা জয়লাভ করেন।

নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের এই জয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে ইতিবাচক বলেই প্রতিপন্ন করে।

প্রকৃতপক্ষে একটি দেশের যথাযথ উন্নতির জন্য নারীকে রাজনীতিসম্পৃক্ত করতে হবে। নারীবিহীন রাজনীতি কোনো রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। তবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পথটি যথারীতি সুগম করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজনৈতিক দলের সহায়তায় এভাবেই বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসহী হবে।

অন্যদিকে জাতীয় সংসদের সাংসদগণকে যদি স্বচ্ছতা/দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতার দায়িত্ববন্ধনের পরিমণ্ডলে আনা সম্ভব হয়, তবে একমাত্র রাজনীতি-সচেতন এবং জনকল্যাণে উৎসুক ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্যরা সাংসদ হতে অনিচ্ছুক হবেন। এছাড়া বর্তমানে যে-কোনো পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এবং প্রয়োজনে পেশিশক্তি ব্যবহার

করেও পুরুষরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এর কারণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য নির্বাচনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়ে থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ সাংসদ থাকাকালে অর্জন করা সম্ভব। এই কারণগুলো দূর করে যদি সুস্থ নির্বাচনপদ্ধতি দেশে প্রবর্তন করা যায়, তাহলে সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে কোনো অসুবিধা হবে না।

নারী প্রগতির ভিন্ন দিক

সেলিনা হোসেন

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক সমাজ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবি করেছেন। তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে 'জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়ার' যে উল্লেখ ছিল তার একটি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। এই সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে আমার বিক্ষিপ্ত ভাবনার কয়েকটি দিক নিয়ে এই লেখা।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জাতীয় সংসদে ১৪২টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ পায় ৯২টি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৬টি, বিএনপি ১১৫টি। দুই নির্বাচনে কোনো দলই ১৫১টি আসন পায়নি। সুতরাং সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা এ দুই নির্বাচনে কোনো দলেরই ছিলো না। তারপরেও দুই দলই সরকার গঠন করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ৩০টি মহিলা সংরক্ষিত আসনের জন্য। যেহেতু এই ৩০টি আসনের সদস্যরা সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন, সেহেতু সর্বাধিক আসন যে দলটি পেয়েছে সে দলটি যাদের মহিলা আসনে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে, তারাই মহিলা আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। এই মহিলা আসনের সদস্যদের নিয়েই '৯১ সালে বিএনটি এবং '৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। এটি অন্যরকমও হতে পারতো। যদি ১৯৯১ সালে বিএনপি ছাড়া অন্যসব রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে বিএনপি কর্তৃক মনোনীত মহিলা আসনের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট দিতো, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ভোট পড়তো ১৫৮টি এবং পক্ষে পড়তো ১৪২টি। একই রকম ঘটনা ১৯৯৬ সালেও ঘটতে পারতো। কিন্তু এ রকম ঘটনা ঘটেনি।

তাহলে স্বীকার করতে হবে যে এই মহিলা আসনের কারণেই সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ—১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে দু'বারই ঝুলন্ত সংসদ ছিলো (Hung Parliament)। কেননা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত কোনো রাজনৈতিক দলেরই সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন (১৫১টি) ছিলো না। তবু সরকার গঠিত হয়, ঝুলন্ত সংসদের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ তার পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচিত সপ্তম জাতীয় সংসদও তার পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যরত থাকবে বলে আশা করা যায়। সবটুকুই সম্ভব হয়েছে মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকার কারণে। এদিক থেকে আমরা প্রতিবেশী ভারতের চেয়ে ভাগ্যবান, যেহেতু ভারতে সরকার গঠনে অস্থিতিশীলতা বারবার দেখা দিয়েছে এবং বারবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, মহিলাদের নির্বাচন কি সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য নাকি সংসদে মহিলাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য? নাকি নারীমুক্তির জন্য? নাকি সমাজের রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে?

সংবিধান প্রণেতারা মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার এই শুভ ফল কল্পনা করতে পেরেছিলেন কিনা কিংবা এই শুভ ফল অর্জনের জন্য মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার কথা ভেবেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে যথাযথভাবেই সন্দেহ পোষণ করা যায়।

জাতীয় সংসদে মহিলাদের নির্বাচিত হওয়া কোন মৌল কারণে প্রয়োজন, সেটি বিশেষভাবে মূল্যায়িত হওয়া দরকার।

বলেছিলাম জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার অপ্রত্যাশিত, কাকতালীয় লাভ সরকারের স্থিতিশীলতা। কিন্তু এটাই কি তাদের সংসদ সদস্য হবার একমাত্র যুক্তি? এর উত্তর, অবশ্যই না। আমার সন্দেহ আছে, সংবিধান প্রণেতারা সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষায় মহিলা সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন কিনা, মহিলারা সংসদ-সদস্য হবেন এক কারণে যে তারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং তারা সংসদে না থাকলে জনসংখ্যার এই প্রায় অর্ধেক সংসদে প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে যায়। মহিলারা সংসদে থাকবেন এ কারণে যে দেশের মহিলা সমাজ বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত এবং তাদের এই বঞ্চনা, অবহেলা এবং নিপীড়নের অবসান ঘটাতে হবে—এবং তা গণতান্ত্রিকভাবে ঘটতে হবে। মহিলারা সংসদ সদস্য হবেন এ কারণে যে মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন। এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনের যথাযথ প্রতিফলন রাষ্ট্র পরিচালনায় ও রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ঘটাতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখা হলেই সংসদে কি মহিলাদের যথাযোগ্য, কার্যকর ও সম্মানজনক প্রতিনিধিত্ব ঘটবে? প্রথমত, যদি মহিলাদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখতে হয়, তাহলে তার জনসংখ্যার অনুপাতে রাখতে হবে। অন্যকথায়, সংসদের মোট আসনের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে

হবে, কেননা, আগেই বলেছি মহিলারা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। কিন্তু সংসদের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, মহিলারা সমাজের একটি বিশেষ পশ্চাৎপদ অংশ। এ ধরনের বিশেষ পশ্চাৎপদ অংশ সমাজে আরও আছে। যদি মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয় তাহলে অন্যসব বিশেষ পশ্চাৎপদ অংশের জন্যই বা রাখা হবে না কেন? যদি এটা করতে হয়, তাহলে হয় সংসদের বর্তমান আসন সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে, নয়তো সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত সর্বজনীন আসনের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। এর কোনোটাই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না।

তৃতীয়ত, মহিলারা পুরুষদের করুণার ওপর নির্ভর করে সংসদের আসন লাভ করবেন কেন? মহিলারা নিজগুণে বহু ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এ প্রতিযোগিতা থাকা শুধু বাঞ্ছনীয় নয় আবশ্যিক। মহিলাদের নিজগুণে নিজেদের যথাযোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে হবে। যদি এ প্রতিযোগিতা না থাকে তাহলে মহিলারা নিজেদের ক্ষমতার ওপর আস্থা অর্জন করতে পারবেন না।

চতুর্থত, যদি মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে, তাহলে মহিলারা প্রধানত সংরক্ষিত আসন থেকেই সংসদ সদস্য পদ লাভ করবেন। সাধারণ আসন থেকেও কোনো কোনো মহিলা নির্বাচিত হতে পারেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ধরা যাক, সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে প্রায় অর্থেক, মনে করুন ১৪৫টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রইলো। সাধারণ আসন থেকে আরো ২০ জন মহিলা নির্বাচিত হলেন, বর্তমান সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্যের সংখ্যা সাত, আমি এই সংখ্যাকে প্রায় তিন গুণ অথবা তিনশভাগ বাড়িয়ে ধরেছি। এ রকম পরিস্থিতিতে সংসদে মোট মহিলা সদস্যদের সংখ্যা হবে ১৪৫ + ২০ = ১৬৫; এর চেয়ে বেশি সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো আসন সংরক্ষিত না থাকে, তাহলে এমনও তো হতে পারে যে সবগুলো আসন থেকে বা অধিকাংশ আসন থেকে মহিলারা নির্বাচিত হবেন, তখন সংসদে মহিলাদের সংখ্যা হবে তিনশ বা তার কাছাকাছি। এটি আপাতত অলীক মনে হবে, কিন্তু মহিলারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে এ অসম্ভবও একদিন সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকলে এমনটি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। কেউ বলতে পারেন যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো ছাড়া অন্য সব আসন থেকে এখন তো মহিলা বিজয়ী হতে পারেন। এটি বাস্তব সম্মত নয়। কেননা সংরক্ষিত আসন মহিলাদের মেরুদণ্ডহীন করে দেয় এবং মেরুদণ্ডহীন অবস্থায় তাদের পক্ষে এই অতি কাঙ্ক্ষিত অবস্থান অর্জন করা সম্ভব নয়। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মহিলাদের অবশ্যই সরে আসতে হবে। সুতরাং মহিলাদের জন্য সংসদে আসন সংরক্ষণ নয়, কিন্তু সংসদে মহিলাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কিভাবে সেটি করা যাবে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে ৩০ জন মহিলা নির্বাচিত হন। জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতেন, তাঁরা ভোট দিয়ে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সাংসদ নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত হবার পর সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কোনো পার্থক্য থাকতো না। সকল সংসদ সদস্যই একই অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পেতেন এবং একই আইন ও নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত হতেন। কিন্তু আসলে কি হতো? মহিলা আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না বলে কোনো ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতো না। সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College) হলেই আইনগতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না। জাতীয় সংসদে যে রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত আসনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক আসন লাভ করে সেই দল সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দান করে এবং যারাই এ মনোনয়ন লাভ করে, তারাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষিত হতেন। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে এমনটিই ঘটেছে।

এ ব্যবস্থার তাৎপর্য কি? এক) সংরক্ষিত মহিলা আসনে যারা নির্বাচিত হন, তাদের নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ঊর্ধ্বে বিশেষ কিছু নয়। দুই) যেহেতু মহিলা আসনে প্রার্থীদের এভাবে নির্বাচিত করা হয়, সেহেতু তাদের নির্বাচিত হবার জন্য জনগণের কাছে যেতে হয় না। ফলে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও যোগ ক্ষীণ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তিন) যেহেতু তাদের জনগণের কাছে যেতে হয় না, যেহেতু তাদের বিশেষ রাজনৈতিক পরিচিতি কিংবা কর্মময় রাজনৈতিক অতীত বা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা থাকারও প্রয়োজন হয় না; তাদের প্রয়োজন হয় কেবল একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সে দলের আস্থাভাজন হওয়া। দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো রাজনৈতিক দলের আস্থাভাজন হতে গেলে সে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা থাকার প্রয়োজন হয় না। সে রাজনৈতিক দলের প্রধানের আস্থাভাজন এবং/অথবা প্রিয়পাত্র হওয়াই মনোনয়ন লাভের জন্য যথেষ্ট।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে মহিলা আসনে নির্বাচিত কোনো সংসদ সদস্য যদি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করার প্রয়োজনীয়তা না দেখেন, কিংবা কোনো রাজনৈতিক আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজনীয়তা না দেখেন, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। মহিলা আসনে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের আনুগত্য একজন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি থাকাই তার সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা যায়। এর সবটুকুর পেছনেই সুবিধাবাদ লুকিয়ে আছে।

এই পরিস্থিতির অবসান ঘটা প্রয়োজন। মহিলাদের আরো অনেক বেশি সংখ্যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। সে অংশগ্রহণ নিষ্ক্রিয়া না হয়ে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। মহিলাদের স্পষ্ট রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের মানুষের

সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকা প্রয়োজন। দেশের মানুষের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ তাদের জনসাধারণের আরো কাছাকাছি থেকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনার যে অসীম সম্ভাবনা মহিলাদের হাতে আছে তা উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

বলেছি মহিলারা রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেন। এখন তো প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেতা দু'জনেই মহিলা। রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এসেছে কি? না, আসেনি। রাজনীতি দ্বন্দ্বময় থেকে আরো দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠছে। যেসব মূল্যবোধ দ্বারা রাজনীতি বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোর অনেকগুলো বিষয়েই গর্বিত বোধ করার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না।

তাহলে কি মহিলারা রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারেন, এই কথাটি মিথ্যে? না, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা মহিলা হলেও তাদের ঘিরে আছে পুরুষেরা। পুরুষদের পরামর্শ তাদের গ্রহণ করতে হয়, পুরুষদের আনুগত্য থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এবং রাজনীতিতে যে পুরুষের প্রাধান্য বেশি, সেদিকে লক্ষ রেখে রাজনৈতিক কৌশল ও রাষ্ট্র পরিচালনার পন্থা নির্ধারণ করতে হয়। অন্যকথায়, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতা মহিলা হলেও তাঁরা মহিলাদের যতটুকু প্রতিনিধি, তার চাইতে বেশি প্রতিনিধি পুরুষদের। তাঁরা যে ইচ্ছে করে এমনটি হয়েছেন তা নয়, পরিস্থিতি তাদের এমন হতে বাধ্য করছে। সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব যদি উল্লেখযোগ্য হারে ঘটে এবং এইসব মহিলা সদস্য যদি প্রকৃতপক্ষে এবং শতকরা একশভাগ জনগণের প্রতিনিধি হন, তাহলে রাজনৈতিক গুণগত পরিবর্তন আসা অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনটুকু আমাদের এখন খুবই প্রয়োজন। সেজন্যই সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব যথার্থ হওয়া প্রয়োজন।

১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়, তাতে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে দশ বছরের জন্য সংরক্ষিত ছিলো। ১৯৭৮ সালে সামরিক আইনের এক আদেশ বলে এ সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয় এবং মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকার মেয়াদ ৫ বছর বাড়িয়ে ১৫ বছর করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতীয় সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন সংরক্ষিত ছিলো। চতুর্থ জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত ছিলো না। ১৯৯০ সালে সংবিধান সংশোধন করা হয় এবং সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে ১৯৯০ সালে যে সংসদ বিদ্যমান ছিলো, সে সংসদের অব্যবহিত পরের সংসদ প্রথম যেদিন বসবে সে তারিখ থেকে ১০ বছর পার হওয়ার পর যে সংসদ থাকবে তা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০টি আসন মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা আগের মতোই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

এই সংশোধনকালে চতুর্থ সংসদ বিদ্যমান ছিলো। পঞ্চম সংসদ ৫ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে প্রথম বসে। তার মানে ৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১০ বছর পরে যে সংসদ বিদ্যমান থাকবে তা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে। যদি

সংবিধান সংশোধন না করা হয়, তাহলে মহিলা আসনের মেয়াদ এভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংসদে মহিলাদের জন্য কোনো সদস্যপদ সংরক্ষিত থাকবে না।

বর্তমানে সপ্তম সংসদ চলছে। এই সংসদের মেয়াদ ২০০১ সালের ১৩ জুলাই শেষ হবে। ২০০১ সালের ৪ এপ্রিল সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০ বছর শেষ হবে। কিন্তু ২০০১ সালের ৫ এপ্রিল থেকে এই সদস্যপদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। এগুলো বিলুপ্ত হবে যেদিন সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হবে, সেদিন। অর্থাৎ ২০০১ সালের ১৩ জুলাই। যদি অবশ্য কোনো কারণে ২০০১ সালের ১৩ জুলাইয়ের আগে সপ্তম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় এবং সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেয়াদ বাড়ানো না হয়, তাহলে যেদিন সংসদ ভেঙে দেওয়া হবে সেদিন থেকে মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে না। ভারতে বছর তিন আগে লোকসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য একটি বিল উত্থাপিত হয়েছিলো। আমার যতদূর মনে পড়ে, সে বিলে প্রত্যেক রাজ্যে প্রতি ৩টি আসনের মধ্যে একটি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো, কোন আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, তা নির্বাচন কমিশন স্থির করবে। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় সংরক্ষিত আসনটি পরিবর্তিত হবে। তার মানে এক নির্বাচনে যদি, ধরা যাক, ১১ সংখ্যক আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তাহলে পরের নির্বাচনে ১২ কিংবা ১৯ কিংবা ২১ সংখ্যা আসন তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

বিলটি পাস হয়নি। কোনো কোনো রাজনীতিবিদ আশঙ্কা করতে থাকেন যে, তার যে আসন থেকে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সে আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে এবং তিনি নির্বাচিত হতে পারবেন না। কেউ কেউ এমন আশঙ্কাও করেন যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে যে নির্বাচিত এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির স্ত্রী কিংবা কন্যাই মনোনয়ন লাভ করবেন এবং নির্বাচিত হবেন। এ রকম পরিস্থিতিতে যে কারণে মহিলাদের সংসদ সদস্য পদ লাভ করা প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এবং মহিলা আসন সংরক্ষণ করা প্রহসনে পরিণত হবে।

এখানে একটি মজার ব্যাপার আছে। মহিলা আসন ১০ বছর সংরক্ষিত থাকার মেয়াদ ২০০১ সালের ৪ এপ্রিল শেষ হয়ে যাবে। মনে করা যাক ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সপ্তম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হলো। তারপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠক বসলো। এরকম ক্ষেত্রে অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তা ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত মহিলা আসন অব্যাহত থাকবে। তার মানে অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভেঙে দেওয়া না হলে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মহিলা আসন সংরক্ষিত থাকবে।

কিন্তু মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার চেয়ে সংরক্ষিত না রাখার পক্ষে যুক্তি বেশি। সেই যুক্তি আমরা আগেই পর্যালোচনা করেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার পক্ষপাতী নই। অন্যদিকে আমি চাই সংসদে মহিলাদের

প্রতিনিধিত্ব বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাক। এ দু'টি লক্ষ্য অর্জন করার একটি পথ সুধীজন বিবেচনা করে দেখতে পারেন। সংবিধান সংশোধন করে যদি এমন বিধান করা হয় যে, যে সব রাজনৈতিক দল সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তারা প্রত্যেকে যতটি আসনে প্রার্থী দেবে, ততটি আসনের ন্যূনপক্ষে এক তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক আসনে অবশ্যই মহিলা প্রার্থী দিতে হবে। সেক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীরা অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার বাড়বে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা শাণিত হবে, আর পুতুল হয়ে থাকবেন না, সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হবেন।

সংযোজন

এই লেখাটি লিখেছিলাম ২০০০ সালে। বর্তমানে অষ্টম জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সরকার এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়েছে। সঙ্গত কারণে সকলের প্রত্যাশ্যা ছিল যে এই সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করবে। কিন্তু কার্যত তা হলো না। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

কিছুদিন আগে আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ এক কর্মশালায় বলেই দিয়েছেন যে সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বাড়ানো ও সরাসরি নির্বাচনের দাবি জাতীয় ইস্যু নিঃসন্দেহে। তবে বর্তমান অষ্টম সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচন সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুধীজনের সঙ্গে আলোচনার পর জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া এককভাবে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

ফলে অষ্টম সংসদ এখন নারী আসন শূন্য অবস্থায় আছে। কে না জানে যে সংসদে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব না রেখে পূর্ণাঙ্গ আইনসভা হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৯৭ সালে ঘোষিত হয়েছিল 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'। এই নীতিমালার ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।' বিগত সরকারের আমলে সংসদে বিরোধী দল অনুপস্থিত ছিল। তাই বিলটি পাস হয়নি। যথার্থ কারণেই সপ্তম সংসদেই সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান বাতিল হয়ে যায়। অথচ দেখা গেছে অন্যান্য নির্বাচনে নারী-নেতৃত্ব বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে গৃহীত নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারীদের সাফল্য এ ক্ষেত্রে আশাতীত। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে স্থানীয়

সরকারের একদম নিম্ন পর্যায়ে নারীদের জন্য সরাসরি ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে আইনসভার আসনের জন্য করা যাবে না কেন? প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কেউ নেই। প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে এটি একটি জাতীয় দাবি। কিন্তু কথা এবং কাজে মেলে না। এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের অভাব হতাশার জন্ম দেয়।

অথচ একথা অনস্বীকার্য নয় যে, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলে একজন মহিলা জনপ্রতিনিধির দায়িত্ববোধ পূর্ণতা পায়। তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। এই সচেতনতার ফলে তিনি তাঁর যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেবেন, তিনি জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেবেন তা রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন, তিনি নারীদের সমস্যাগুলো নিয়ে সংসদে আলোচনা করবেন এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্রতী হবেন। এভাবে না হলে শুধু সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন লাভ করে কারো পক্ষেই মর্যাদার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়।

অদূর ভবিষ্যতে নারী প্রগতির এই ভিন্ন যাত্রা সফল হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

সেলিনা শিরীন শিকদার

১.০ পটভূমি

উনিশ শতক বাঙালি নারী-জাগরণের যুগ। নারীর প্রতি সামাজিক অত্যাচার, বিধি-নিষেধ, প্রথা, পশ্চাৎপদতা এবং তা থেকে তার মুক্তির বিষয় নিয়ে গত শতাব্দীতে সমাজে ব্যাপক আলোচনা ও আন্দোলন শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সমাজের শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা নারীর চির অবহেলিত নির্মম-নির্দয় পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন সচেতন হন, তেমনি হন দুঃখিত ও লজ্জিত। সতীদাহ বন্ধ করা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধের পক্ষে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। সমাজ নারীশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরুষদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীর মধ্যে জেগেছে অধিকারসতর্কতা, নতুন জীবনতৃষ্ণা ও নিজের পোশাক-আশাক সম্পর্কে সচেতনতা। নারীকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এই বিপুল কর্মযজ্ঞের ফলে উনিশ শতকের শেষে এসে নারীর প্রতি পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমনকি নারীর নিজের মনোভঙ্গিতেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সামগ্রিকভাবে উনিশ শতক হয়ে ওঠে বাঙালি নারীর আত্মজাগরণ, তার বন্ধনমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এক উল্লেখযোগ্য কাল।

উনিশ শতকের বাংলায় নারীজাগরণের সূচনা হয়েছিল আর বিশ শতকে সূচিত হল বাঙালি নারীর সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। উনিশ শতকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রযাত্রার সূত্রপাত ঘটেছিল, বিশ শতকে এসে তা আরো বেগবান হয়েছে। রাজনীতিতে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমাজ সংস্কারে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান হারে নারীর অংশগ্রহণ এই শতকে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই শতকেও নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী পুরুষেরা যুক্ত থাকলেও নারীরাই তাদের নিজস্ব অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অনেক

বেশি তৎপর হয়েছেন। ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরুষের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। সমাজজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে বাঙালি নারী এই শতকে তার দক্ষতা প্রকাশ করেনি। বাঙালি নারী কোনো কাজেই যে অক্ষম বা অদক্ষ নয়, তার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ, লেখক, শিল্পী, অভিনেত্রী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, প্রশাসক, যোদ্ধা হিসেবে নারী তার কর্মক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করতে হয় নারী আন্দোলনের সক্রিয় ধারাটির কথা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই নারীআন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। কখনও তা তীব্র হয়েছে, কখনও স্তিমিত হয়ে থেকেছে। নারীআন্দোলনের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কখনও কখনও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে। বিশেষ করে দেখা গেছে সামরিক শাসনের কারণে জাতীয় রাজনীতি যখন মন্থর, তখন নারীআন্দোলন বেগবান হয়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বে সাধারণত নারী সংগঠনের শক্তি নারীবাদ সংগঠনের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমমূলক, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনেই সম্পৃক্ত থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও চিত্রটি এরকমই। এ দেশের নারীআন্দোলনে এখনও খুব শক্তিশালী কোনো ধারাবাহিকতা তৈরি হয়নি বা এমন কোনো মতাদর্শ গঠিত হয়নি, যার ভিত্তিতে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই সাথে সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতাও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে সংশয়ের জন্ম দেয়।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত গোটাদাগে বলতে গেলে ব্রিটিশ শাসনামলে। তৎকালীন নারীআন্দোলনে ব্যক্তি-নারীর ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে প্রীতিলতা, ইলা মিত্র, লীলা নাগ, কল্পনা দত্ত প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ প্রথম দিকে ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু মাস্টারদা সূর্যসেনের আদর্শের অনুসারী প্রীতিলতা নারী-পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্যের সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দুটো যুদ্ধের কথা : একটি ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে, অন্যটা পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে।

ভাষাআন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ছিল একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। এই পর্বে নারী প্রত্যক্ষভাবে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা, তথ্য, ভালোবাসা, এমনকি পাকিস্তানি সৈন্যের কাছে ধর্ষিত হয়েও বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে নারীর এই অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপটকে সাম্প্রতিককালে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা হিসেবে। আগে যেসব গবেষণা করা হয়েছে, সেখানে নারীর অংশগ্রহণের এই বিষয়গুলো উপেক্ষিত ছিল। ধরে নেওয়া হত যে জাতীয়তাবাদের যে ঐতিহাসিকতা এবং 'ধারণা' তৈরি হয়েছে, সেখানে নারী অনুপস্থিত। কিন্তু বর্তমানের গবেষকেরা এই প্রেক্ষাপটে নারীর অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যদি

বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে নারীআন্দোলন বর্তমানে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পরোপুরি একীভূত হচ্ছে না। স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে পাশপাশি এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে এর। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা থেকে নয়, বরং রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় কর্মসূচিতে এই প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে, কিংবা একে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। নারীআন্দোলন মনে করতে পারছে না যে জাতীয় মুক্তি এলেই নারীমুক্তি এসে যাবে। তাই মূলধারার রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে সংহত করতে বর্তমানে নারীআন্দোলন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২.০ ক্ষমতায়ন পদ্ধতি

ক্ষমতায়ন পদ্ধতি (Empowerment approach) হচ্ছে ক্ষমতা (Power) এবং উন্নয়নের (Development) মধ্যকার একধরনের আন্তঃসম্পর্ক, যা এ দুটি বিষয় সম্পর্কে একধরনের নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। এই ক্ষমতায়ন পদ্ধতি অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নয়, বরং নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্বকে যেমন স্বীকৃতি দেয়, সেই সঙ্গে তা নারীর নিজস্ব শক্তিবৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতারও ইঙ্গিতবহ। এই স্বনির্ভরতার মাত্রা নির্দিষ্ট হচ্ছে নারী তার জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিকল্পগুলো গ্রহণ করতে পারছে কি না এবং উৎপাদন ও সম্পদের ওপর তার অংশীদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কি না তার ওপর। অর্থাৎ নারী তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে কি না তার ওপরই নির্ভর করে নারী কতটা ক্ষমতায়নের কাছাকাছি আসতে পেরেছে।

নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত (১৯৮৫) ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন-এর আগে গঠিত DAWN (Development Alternative with Women for a New era) নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞার্থ দিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক পৃথিবী গঠন করা, যে-পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অথবা আন্তর্দেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, বর্ণ ও জেন্ডারভিত্তিক কোনো বৈষম্য থাকবে না। এই ধরনের সমতাভিত্তিক ভবিষ্যৎ পৃথিবী গড়ার দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটিও এসে যায়, যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক একটি সমাজে নারী তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম।

ক্ষমতায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণের কথা বলে থাকেন বিশেষজ্ঞগণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় জেন্ডার সম্পর্ক (Gender Relations) বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা। শ্রেণী ও জাতির মধ্যকার বৈষম্যমূলক কাঠামোর বিলুপ্তি এর লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য প্রয়োজন হয় স্থান, কাল সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বৈচিত্র্য বিবেচনায় এনে সকলপ্রকার ঔপনিবেশিক, নব্য-ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ হতে জাতীয় মুক্তি, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় কৃষিশিল্পের বিকাশ, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক কোম্পানির ওপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় রেখে সর্বজনীন

কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। একইসাথে এই কর্মপরিকল্পনায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উপাদানসমূহ সম্পৃক্ত করাও জরুরি।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপগুলোও বিবেচিত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিধিতে বিরাজমান নারীর তাৎক্ষণিক সঙ্কট বা প্রয়োজন মেটাবার দিকে লক্ষ্য রেখে। ভোটাধিকার প্রয়োগের মতো বিষয়, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বিরাজমান মজুরি-বৈষম্য, মাতৃত্বকালীন সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-বৈষম্য, বৈবাহিক আইনের ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য, নারীর ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংসদসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী অথবা দীর্ঘমেয়াদী উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধের মতো যে-সমস্ত বিষয় সাধারণ গণমানুষের পাশাপাশি নারীকেও বিপন্ন করে তোলে, সেই সমস্ত বিষয় এবং উপাদান কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়ন : বিবেচ্য বিষয়

নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিধিতে বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। জেন্ডার কর্মপরিকল্পনায় এই বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় আনা জরুরি। নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা এবং কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হচ্ছে :

ক. উন্নত এবং অনুন্নত দেশের বৈষম্যমূলক অবস্থান এবং অবস্থান থেকে উদ্ভূত ধারণাগত বৈপরীত্য অথবা ভিন্নতা;
খ. জাতীয় পরিধিতে উৎপাদন সম্পর্কের বৈষম্যমূলক প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানের তারতম্য;
গ. ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা এবং
ঘ. তুলনামূলকভাবে অনুন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থান।

মোটাদাগে বলতে গেলে উপরিউক্ত বিষয়গুলো নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সর্বজনীন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

নারীর ক্ষমতায়নের *প্রশ্নে* আরো একটি বিষয় গভীরভাবে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। হাজার বছর ধরে উৎপাদন সম্পর্কের ওপর পুরুষের আধিপত্য যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার ফলে গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য। এই পার্থক্যই একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলবার পথে বড়ো ধরনের বাধা। কেননা বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পুরুষকে দিয়েছে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ। ফলে সে পেয়ে গেছে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্ব অবসানের লক্ষ্যে

একদিকে যেমন বহু ইতিবাচক মতবাদের বিকাশ ঘটেছে, তেমনি বহু নেতিবাচক মতবাদও পেয়েছে প্রচার-প্রতিষ্ঠা। ইতিবাচক মতবাদ এবং আন্দোলন যেমন নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে ব্যাপক জনগণ, বিশেষ করে নারীসমাজের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, তেমনি নেতিবাচক প্রবণতাগুলো আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বহুলাংশে পাশ কাটিয়ে পুরুষকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে উগ্র নারীবাদী প্রচার বা আন্দোলন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

একবিংশ শতকের গোড়ায় আমরা এমন এক পৃথিবী অবলোকন করছি যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য আদান-প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভাবিত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তিত পৃথিবীর প্রতিটি বিষয়সম্ভার আমাদের গড় আয়ু, জীবনের ধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়েছে। উৎপাদন, পণ্যের বাজারজাতকরণ, কাঁচামালের উৎস ইত্যাদির ওপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য আরো কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। ফলে বিশ্বব্যবস্থার এককেন্দ্রিকতা এবং একে নিয়ন্ত্রণে রাখার যে প্রয়াস, তা জাতীয় আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে এক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এসব পরিবর্তনের ভালো দিকগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি নতুন ধরনের এক বাধ্যবাধকতা বা ব্যবস্থার দাসত্বের যুগে প্রবেশ করেছে। এসবের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের গুণগত মানকে বিবেচনায় আনতে বলেছেন বিশেষজ্ঞগণ। উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি একটি সর্বজনীন ধারণা এবং যথাযথ কর্মপরিকল্পনার মধ্যে পরিচালিত হতে পারেনি। ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে বিরাজমান বাস্তবতার নিরিখে পরিচালিত করলে এবং যে-সমস্ত উপাদান এই মুহূর্তে জাতীয় আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিধিতে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখছে, সেই সব উপাদানকে চিহ্নিত করে নারীর ক্ষমতায়নের সর্বজনীন ধারণা, কর্মপরিকল্পনা এবং আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব।

বলাবাহুল্য যে, পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, ছোটো অর্থনীতির দেশের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে ধনী দেশের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্কট ও অনিশ্চয়তার নানা দিক। পুঁজিবাদী বিশ্বের যুদ্ধ উন্মাদনা এবং আর্থ-সঙ্কটে দরিদ্র দেশের মানুষের জীবন হয়ে পড়ছে আরো অনিশ্চিত, আরো সঙ্কটাপন্ন। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরকম পরিস্থিতিতে তৃণমূল পর্যায়ের নারী ও শিশুরাই আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। অসম এই ব্যবস্থা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলন—নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন এখন পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে না পারলেও তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ক্ষমতায়নের অগ্রগতির সূচক হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

৩.০ নারীর ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বর্তমানে তৃতীয়বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন, নারীবাদী লেখক ও কর্মিগণ নারীর ক্ষমতায়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে

থাকেন। নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লৈঙ্গিক সম্পর্কের পরিবর্তন, অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারীর ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলি সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। মার্তি শেন ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে 'রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন' হিসেবে বর্ণনা করা যায়। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীর ক্ষমতাচর্চার নির্দেশক।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লৈঙ্গিক বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কি-না, তা-ই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দুটি দিক উল্লেখযোগ্য : (১) রাজনীতি কোনো সংকীর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতা-ভিত্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং তার কৌশলগত পদক্ষেপই হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন; (২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংকীর্ণ কাঠামোগত প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে একে আন্দোলন এবং সচেতনতার বৃহত্তম পরিমণ্ডলে দেখা যেতে পারে। এই আন্দোলন ও সচেতনতা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত। এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় সংসদ, স্থানীয় সরকার, নীতি নির্ধারণী অপরাপর প্রতিষ্ঠানে নারীর যথাযথ অবস্থানের বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। এ বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

নারীর ক্ষমতায়নের ধারণাটি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক। এর আগে 'উন্নয়নে নারী' (Women in Development) সম্পর্কিত চিন্তাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে ১৯৭৫-১৯৮৫ সময়পর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারীদশকে। এই কর্মসূচির সঙ্গে এসেছিল চুঁইয়ে পড়া নীতি (trickle down theory) এবং মৌলিক চাহিদা (basic needs approach) সংক্রান্ত তত্ত্ব। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন ও বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপের সঙ্গে নারীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা হয়। জোর দেয়া হয় দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামোগত উন্নয়নের বদলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পমুখী উন্নয়নের ওপর। এসব প্রক্রিয়ায়

বেসরকারি সংগঠনগুলো (এনজিও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের তৃণমূল মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে এনজিওদের তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ। যদিও ক্ষমতায়নের কার্যক্রমগুলো বহুলাংশে ক্ষমতায়নের মূল সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করার মতো সাফল্য এখনো অব্দি অর্জন করতে পারেনি, তবুও বলা যায় গৃহীত এইসব কার্যক্রম এবং সচেতনতার ফলে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি জাতীয় ইস্যু হিসেবে সামনে চলে আসতে পেরেছে।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেসব স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই তৃণমূল সংগঠনগুলো কর্তৃক গৃহীত স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৩.১ তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন

বেসরকারি বা এনজিওদের কর্মকাণ্ড

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে নাইরোবি সম্মেলনের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা স্বল্পপরিসর বিশিষ্ট এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমরা তাই এখানে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করব। এজন্যে আমরা প্রধানত বেছে নিয়েছি নারী-উন্নয়নের চারটি ক্ষেত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামীণ ঋণ ও আয়বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা কর্মসূচি এবং সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ। এসব কর্মসূচির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার

দাবি করা হয় যে এনজিওদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। এসব সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাই বেশি। এই তথ্যটি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে একটা নির্দেশক হতে পারে যে, নারী তার নিজের শরীরের ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না অথবা বিদ্যমান লৈঙ্গিক সম্পর্কের কারণে পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারে আগ্রহী নয়।

গ্রামীণ ঋণ ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা

গ্রামীণ ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে আয় সৃষ্টি বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহৎ এনজিও কর্তৃক প্রবর্তিত কর্মসূচির অন্যতম একটি পুরানো পদ্ধতি। নানা ধরনের সমালোচনা সত্ত্বেও এই

পদ্ধতিটি তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গনে প্রবেশের এখনও পর্যন্ত অন্যতম প্রশস্ত পথ।

ঋণ সংগ্রহ করতে নারীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ঋণ বিতরণকারী অনেক সংগঠনই অভিযোগ করে থাকে যে, যেহেতু পরিবারে লৈঙ্গিক বৈষম্য বিরাজমান, ফলে স্বামীরা প্রায়শই স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয় এবং তাদের ইচ্ছেমতো তা ব্যবহার করে। এ কারণে অনেকসময় নারীরা ঋণী অবস্থায় গ্রুপ ছাড়তে অথবা তার আয়বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রুপ গঠনের শুরুতেই নারীরা আধিপত্যকামী স্বামীদের চাপের মধ্যে পড়েন এবং পরেও তা অব্যাহত থাকে। তবে গ্রুপের নারী সদস্যরা সম্মিলিতভাবে স্বামীদের ওপর চাপসৃষ্টি করে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

ইদানীং আর একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। নারীকে দেয়া ঋণ অনেকটা যেন মহাজনী চরিত্র পেয়ে যাচ্ছে। এনজিওগুলোর মূল লক্ষ হওয়া উচিত যারা অপেক্ষাকৃতভাবে গরিব তাদের কাছে টাকা খাটানো। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটছে এর বিপরীত। টাকা আদায়ের প্রক্রিয়াও কখনো কখনো নির্যাতনমূলক হয়ে উঠছে। এটা একটা বড়ো সমস্যা। গ্রুপ গঠনের যে অন্যতম উদ্দেশ্য—পেশাদার মহাজনের কাছ থেকে মুক্তি অর্জন, উল্লিখিত তৎপরতা সেই প্রক্রিয়াকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করে। এছাড়া নারীরা যদি শুধুমাত্র গ্রুপের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে, তাহলে ঘরোয়া পরিসর থেকে তারা ক্রমশ দূরে সরে যাবে। অথচ এই পারিবারিক পরিমণ্ডলই হচ্ছে ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। ক্ষমতার এই পারিবারিক ভিত্তি, বলাবাহুল্য সবসময়ই সমাজে পুরুষের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় এবং ক্ষমতার বিকল্প ভিত্তি তৈরিতে বাধা দেয়।

এখানে একটি ঘটনার কথা বলি। একটি মহিলা গ্রুপকে ঋণদান সংস্থা থেকে একটা পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা নিজেদের জমি এবং অন্যের জমিতে ভাড়া হিসেবে তা ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু ঐ গ্রামের মধ্যে তারাই ছিল প্রথম পাওয়ার টিলারের অধিকারী, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা প্রচুর কাজ পেয়ে যায়। কিন্তু সে-এলাকার ধনী কৃষকেরা ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল বলে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় তারা নতুন ছটি পাওয়ার টিলার কেনে এবং ক্ষুদ্র কৃষকগোষ্ঠীকে বিভক্ত করার চেষ্টা চালায়। প্রতিটি ঋণদান কর্মসূচির কৌশল হিসেবে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। সংগঠিত গ্রুপগুলোর কর্মকাণ্ড গ্রামের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালেই আঘাত আসে। অনেকে মনে করেন যে, গতানুগতিক ক্ষমতার ভিত্তিকে বিরোধিতা করে বিকল্প ক্ষমতাবলয় তৈরির জন্য প্রান্তিক ছোটো ছোটো গ্রুপগুলোকে পারস্পরিকভাবে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, গ্রামের বিশেষ ক্ষমতা কাঠামোর ওপরই এক্ষেত্রে সফলতা আসবে কি না তা নির্ভর করে।

শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা কর্মসূচি

শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা প্রণয়ন কর্মসূচির মধ্যে স্বাক্ষরতা কর্মসূচিটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এনজিওদের সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম। এর মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, ভোটাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তা দান কর্মসূচি। তবে দেখা যায়, পাঠ্যসূচি হিসেবে এসব যুক্ত করার ফলে সম্পূর্ণ কর্মসূচিটি বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা-উপকরণ, শিক্ষালাভের উপকরণ ইত্যাদি পাওয়া যায় না বলে প্রার্থিত ফলাফলও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে।

সচেতনায়ন ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ

সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ ছিল এনজিওদের সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য কমসূচি। এই কর্মসূচি নারীকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করেছে। তবে এনজিওগুলোর মধ্যে একই ধরনের মতাদর্শগত ধারণা কাজ করলে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে দেয়া হলে, সকল গ্রুপের কার্যক্রমের মধ্যে সমভাবনার একটি ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই এর অভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, খুলনার নারীরা চিংড়ি চাষিদের বিরুদ্ধে, নোয়াখালীতে তারাই আবার ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে থাকে। অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামোকে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই সফলভাবে মোকাবেলা করছে। কিন্তু সচেতনতার দিক থেকে মতাদর্শিকভাবে একটি অখণ্ড চেতনা—নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সবাই সচেতন নয়। আসলে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচিগুলো অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যমান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং এজন্য এই সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি কখনো কখনো খণ্ডিত হয়ে পড়ে। অথচ এসব কর্মকাণ্ড হতে পারত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের চালিকাশক্তি।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাই ক্ষমতায়ন-বিরোধী সমস্যাগুলোকে প্রথমে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। পরে সেসব সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখাই হল রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বল্পমেয়াদী এসব পদক্ষেপ গ্রহণের দিকগুলো বাদে আরও কিছু এলাকা আছে যেখানে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল।

আদিবাসী নারী

বাংলাদেশে আদিবাসী নারীরা তিন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে : (ক) পরিবারের সদস্যদের দ্বারা; (খ) পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা এবং (গ) উপজাতীয় গোষ্ঠীসদস্যদের দ্বারা। বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী নারীদের স্বাক্ষরতার হার নিচু হওয়ায় তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রাও বেশি। মূলধারার শিক্ষাক্রমে এসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি সেইভাবে অন্তর্ভুক্ত

হয় না বলে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকারযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচির হার সমতল ভূমির তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলে বেশি (২০%-৬০%)। এ থেকে অনেকেই ধারণা করছেন যে, সরকার হয়তো পরিকল্পিতভাবেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে নির্মূল করার টার্গেট হিসেবে আদিবাসী নারীদেরকে ব্যবহার করছে। এই সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারের উচিত আইএলও কনভেশনের ১৬৯ ধারা এবং ১৯৮৩ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারের আলোকে যথাযথ আচরণ করা। আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দেয়া, তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচায়কে স্বীকৃতি দেয়া, সামরিক ও আধাসামরিক শক্তির দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মানবাধিকার বিরোধী সবধরনের নির্যাতন বন্ধ করার ব্যাপারেও সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন।

ছাত্র রাজনীতি

নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ছাত্র-রাজনীতিও বড়ো ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দেশব্যাপী সাড়া জাগানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে মধ্যরাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশ ঢুকে নিরীহ ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে অভূতপূর্ব প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে একটি বিশাল ও বেগবান ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলে, সেরকম আন্দোলন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষাঙ্গনে দেখা যায়নি। আন্দোলনকারীদের অন্যতম দাবি ছিল বর্তমান প্রক্টোরিয়াল আইন বাতিল করা এবং ছাত্রী নির্যাতনের জন্য দায়ী উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ। প্রথমে দ্বিধা করলেও প্রচণ্ড ছাত্র-আন্দোলনের মুখে সরকার উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগে বাধ্য করে। সূচিত হয় ছাত্র-আন্দোলনের বিজয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এই আন্দোলনের একটা বড়ো দিক হল ছাত্রীরাই এতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এর মধ্যদিয়ে ক্ষমতায়নের পথে যে তারা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শুধু শামসুন্নাহার হলের এই ঘটনা নয়, এর আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, তার প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নারীরা—বিশেষ করে ছাত্রীরা তাদের ক্ষমতায়ন চর্চার একটা ধারা গড়ে তুলছে।

৪.০ নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

মিছিল, সভা, আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ—ক্ষমতাচর্চার নির্দেশক। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী-আন্দোলন তাই অপরিহার্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৃতীয় বিশ্বের নারী আন্দোলন কোনো আরোপিত ঘটনা নয়, এর আছে নিজস্ব

ইতিহাস। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনেরও রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। এখানে নারী-আন্দোলন হয়েছে প্রধানত সাংগঠনিকভাবে, কখনো কখনো ব্যক্তি উদ্যোগে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সংগঠন একীভূত হয়ে আন্দোলন করার ফলে নারী-আন্দোলন পেয়েছে তীব্র গতি।

বাংলাদেশের নারী-আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়, রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথার মধ্য দিয়ে বলা যায় এর শুরু। নারী-আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব ছিল বেশি। এ প্রসঙ্গে আমরা ঠাকুরবাড়ির নারী থেকে শুরু করে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রীতিলতা, সুফিয়া কামাল এঁদের কথা উল্লেখ করতে পারি। আরো কিছুটা পিছিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ব্রিটিশ আমলে নারী-আন্দোলন কোনো সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে পারেনি। সেই সময়ে নারী-আন্দোলনের দুটি ধারা দেখা গেছে : প্রথমত, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে তা মিশে ছিল; দ্বিতীয়ত, সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। এই দুটি ক্ষেত্রে যেসব নারী আন্দোলন করেছেন তারা মূলত নারীর অধিকার আদায় এবং সমাজমূলক কাজেই নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। দেশপ্রেম ও নারীর অধিকার আদায়—একই সঙ্গে এ দুটি কাজে নারীরা যুক্ত ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার মিশ্রণে গড়ে ওঠে নারী-সংগঠন মহিলা পরিষদ। সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল সমকালীন নারী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। নারীদের আর একটি লক্ষ্য ছিল—সর্বত্র নারীর উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং নারীমুক্তির জন্য দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জুগিয়ে যাওয়া। এই পর্যায়ে নারী-আন্দোলন সাংগঠনিক চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয় এর ভূমিকা যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তা অনুভূত হতে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পর তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনে নারীসমাজ এনজিওদের টার্গেট গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের নানা কর্মসূচির অংশ হয়ে ওঠে। ফলে নারীদশকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারী-উন্নয়ন বিষয়ে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মহিলা পরিষদও একই সঙ্গে নারী অধিকার প্রশ্নে নারী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মূল ফোকাস ছিল নারীর শ্রেণী অবস্থানের ওপর।

নারীদশক পালনের সময়ই বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একধরনের গতিশীলতা আসে। এ সময় নারীপক্ষ, রূপান্তর, নারী প্রগতি সংঘ, নারী সংহতি এরকম অনেক ছোটো-বড়ো নারী সংগঠন গড়ে ওঠে, যারা শ্রেণীসম্পর্কের পাশাপাশি আমাদের সমাজে বিদ্যমান পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নারী সংগঠনগুলো এসময় সমাজে, পরিবারে, রাষ্ট্রে সমঅধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশেষ ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা করে। এসব ইস্যুর মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ বিরোধী আন্দোলন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন, রাষ্ট্রধর্ম বিল বিরোধী আন্দোলন, ইউনিফরম ফ্যামিলি কোডের সপক্ষে আন্দোলন ইত্যাদি। এই সময় থেকেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়মিত সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

গবেষণা সংস্থা *উইমেন ফর উইমেন* প্রতিবছর বিশেষ ইস্যু নিয়ে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সুপারিশমালা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবেই নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করে একে গতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৮৭ সালে সমমনা ১৪টি সংগঠন নিয়ে নারীর সমানাধিকারের দাবিতে গড়ে তোলা হয় 'ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ'। ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ তাদের ১৭ দফা কর্মসূচিতে উল্লেখ করে যে, নারী নির্যাতন, শোষণ ও বৈষম্য দূর করার উপযোগী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসননীতি ছাড়া নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

একানব্বইয়ের শেষ দিকে নারায়ণগঞ্জের টানবাজার পতিতাপল্লীকে কেন্দ্র করে নারী সংগঠনগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে। নারী সংগঠনের তৎপরতা সরকারি প্রশাসনকে সক্রিয় হতে বাধ্য করে। ১৯৯৪ সালে তথাকথিত ফতোয়ার বিরুদ্ধে নারী সংগঠনগুলো আবার সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে ফতোয়াবাজরা যেরকম আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সাময়িকভাবে হলেও তা থেকে তারা বিরত হয় এবং সরকারও এক্ষেত্রে ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

ফতোয়া ও নারী নির্যাতন

ফতোয়াজনিত নারী নির্যাতন সাম্প্রতিককালের বহুল আলোচিত নির্মম ঘটনাগুলোর অন্যতম। ফতোয়ার যেসব ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, সেই সব ঘটনার তিনটি দিক বেশ স্পষ্ট : সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। ফতোয়া দানকারীরা সামাজিক মূল্যবোধ ভাঙার অভিযোগে নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে নির্যাতন করার কথা বলেছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে শারীরিক সম্পর্কের বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বহুল আলোচিত নূরজাহান, কদবানু, ফিরোজার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ফতোয়ার সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মরত এনজিও এবং ও অন্যান্য সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিকারী নারী কর্মিবৃন্দ। দেখা গেছে যেসব ক্ষেত্রে নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত—অর্থাৎ ঋণ লাভ, রেশম শিল্পের জন্য তুঁত গাছের দেখাশোনা করে অর্থ আয়, এনজিওদের স্কুলে কর্মরত কিংবা শিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসা লাভের মতো অর্থনৈতিক সুবিধা পাচ্ছে, সেখানেই ফতোয়ার মাধ্যমে নারীকে নির্যাতন করা হয়েছে। ফতোয়ার রাজনৈতিক দিক হচ্ছে মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ। এক্ষেত্রেও পুরুষের তুলনায় নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা ছিল বেশি। এ কারণেই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। সরকার ও তসলিমা আদালতে গিয়েছেন এবং তসলিমাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে ফতোয়ার প্রেক্ষাপটে সক্রিয় রয়েছে মৌলবাদ। মৌলবাদকে বিকশিত করার জন্যই ফতোয়া দেয়া হয়। মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক আবার রাষ্ট্র। ফলে

বলা যায়, রাষ্ট্রীয়নীতির ছত্রছায়ায় ফতোয়া দেয়া হয়েছে। সাংবিধানিক সংশোধন, রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের স্বীকৃতি, সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা থেকেই ফতোয়া তার প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। সে জন্যই বলা যায়, ফতোয়া প্রক্রিয়া দূরীকরণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে ফতোয়া দান বাংলাদেশে আজ নিষিদ্ধ। নারী সংগঠনগুলোর তীব্র আন্দোলন ও প্রতিবাদের কারণেই ফতোয়া বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হতে পেরেছে বলে অনেকের ধারণা।

ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণ ও তার গতিপ্রকৃতি

কোনো বিধিবদ্ধ রূপ না থাকলেও প্রাচীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে যে-কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তা অনেকের মতে পূর্বের স্থানীয় সরকারের বিবর্তিত ও বিধিবদ্ধ আধুনিক রূপ। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা অধিকতর মূর্ত হয়ে ওঠে, যা শাসনকার্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাত্ত্বিকভাবে স্থানীয় সরকার স্থানীয় গণতন্ত্রের মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব, এমনকি ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না। তবে সময়ের পরিক্রমায় কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে এতে নারীদের অংশগ্রহণের পথ কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে নারী অনেকটা এগিয়ে যায়।

ভারতে স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ কাঠামোর গোড়াপত্তন ঘটে ব্রিটিশ শাসনামলে। তখন নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়, যে-নারীরা ছিলেন ধনী অভিজাত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এর পর স্থানীয় সরকারে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। সংরক্ষিত আসনে নারীরা পুরুষের ইচ্ছায় মনোনীত হতেন। মূলত রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়া তাদেরকে কার্যত পুরুষদেরই অধীন করে রাখে। এই প্রক্রিয়া পুরুষতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি দেয়নি। সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কাঠামো সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান করা হয়।

স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ দেয়নি। গ্রামপঞ্চায়েতে নিম্নবর্গের পুরুষের মতো নারীদেরও (যে-কোনো বর্ণের) রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীরা রাজনীতিতে ছিলেন অস্পৃশ্যদের মতোই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ভারতে স্থানীয় সরকারের বিধিবদ্ধ

কাঠামোর ভিত্তিমূল রচিত হয় ১৮৭০ সালে প্রণীত গ্রাম চৌকিদারি অ্যাক্টের মাধ্যমে গ্রামের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৩ থেকে ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হত গ্রামপঞ্চায়েত। সদস্যদের সকলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। পঞ্চায়েতের ওপর জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব না থাকায় এবং সদস্য নিয়োগ প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক না হওয়ার কারণে ১৯৮২ সালে লর্ড রিপনের রেজুলেশনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত 'বেঙ্গল লোকাল সেলফ্ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট ১৮৮৫'-এ তিনস্তর বিশিষ্ট যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তার সর্বনিম্ন স্তরটি ছিল ইউনিয়ন কমিটি। ইউনিয়ন কমিটির ৫ থেকে ৯ জন সদস্য ইউনিয়নে বসবাসকারী পুরুষের মধ্যে যাদের বয়স ২১ বছরের ঊর্ধ্বে, চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদান করত এবং শিক্ষিত, কেবলমাত্র তারাই নিজেদের মধ্য থেকে ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। লর্ড রিপন তার রেজুলেশনে স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক স্তরে সদস্য নির্বাচনের জন্য গণতান্ত্রিক পথ অবলম্বনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালের অ্যাক্ট এবং বিভিন্ন কমিটির—বিশেষ করে লিভেঞ্জ কমিটির রিপোর্টেও স্থানীয় সরকারে নারীদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ১৯৪৪ সালে রোলান্ড কমিটির রিপোর্টে ইউনিয়ন বোর্ডকে আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেয়ার সুপারিশ করা হলেও মহিলাদের ভোটাধিকারের সুপারিশ করা হয়নি। নারীরা নিম্নবর্ণের মানুষের মতো রাজনৈতিকভাবে অধিকারহীন থেকে যান। ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনসমূহ স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন, কিন্তু নারীদের ভোটাধিকার প্রদান কিংবা স্থানীয় সরকার কাঠামোয় তাদের প্রতিনিধিত্ব রাখার কোনো দাবি তারা জানায়নি। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে যখন স্যার সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম ভারতীয় হিসেবে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী হলেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হলেও নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন কিনা জানা যায়নি। অর্থাৎ ভারতীয়রা রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা চেয়েছে নারীদের বাদ রেখে, যা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দুজন মহিলা সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লিখিত দুজন মহিলা সদস্য মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত হতেন। পরে ১৯৮৩ সালে জারি করা ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুসারে মনোনীত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা দুই থেকে তিন জনে বৃদ্ধি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন মহিলা সদস্য নিজ নিজ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হতেন। ১৯৯৩ সালে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩' সংশোধনীর মাধ্যমে মহিলা প্রতিনিধিদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই মনোনয়ন প্রথায় মহিলা সদস্যরা নিজস্ব যোগ্যতার পরিবর্তে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে আত্মীয়তা, পরিবার, বংশের

প্রভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোনীত হতেন। পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৯২৭ জন সদস্যদের ওপর ১৯৯৬ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, মহিলা সদস্যদের ৪০ শতাংশ চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের দ্বারা, ৪৮ শতাংশ আত্মীয়দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। পরোক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চেষ্টা বা যোগ্যতার পরিবর্তে অন্যান্য নির্ধারক—বিশেষ করে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুখ্য ভূমিকা পালন করতো। ফলে মনোনীত সদস্যরা পরিষদের সভায় আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ পেতেন না। এমনকি পরিষদের সভায় উপস্থিতও থাকতেন না। যারা উপস্থিত হতেন, তারাও কোনো নীতিনির্ধারণী বা অন্য ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন না। পুরুষ সদস্যদের সিদ্ধান্তের প্রতি তারা সায় দিয়ে যেতেন। এর ফলে দেখা যায়, তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে নিজ স্বার্থে সিদ্ধান্ত কিংবা তার সুফল ভোগ করার সুযোগ মহিলা সদস্যরা পেতেন না। শুধু তাই নয়, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার কারণে পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডকে অবমূল্যায়ন করতেন। এরই প্রেক্ষাপটে মহিলা সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা ও দাবি ক্রমাগত জোরালো হতে থাকে।

গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন নারী সংগঠন, গবেষক, এনজিও এবং সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। এ ব্যাপারে যারা বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দাতাগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন। জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল থেকে নারীবর্ষ এবং ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারীদশক হিসেবে ঘোষণা দেয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার পুঁজিপ্রবাহে নারীউন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্য পাওয়ার জন্য নারীশিক্ষা এবং নারীর কর্মসংস্থানের শর্ত দুটি জুড়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগযোগ এখন আর কোনো কল্পনার ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশে আশির দশকে এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নারী বিষয়ক কর্মসূচিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পেছনেও রয়েছে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উন্নয়নচিন্তায় নারীর অন্তর্ভুক্তির দিকটি। কেননা এনজিওগুলো তহবিলের যে জোগান পায়, সেই জোগানের মধ্যে নারী বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো উল্লেখযোগ্য। এরই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে যে-কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিশনের রিপোর্টে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার সুপারিশ করা হয়। এসব প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার

(ইউনিয়ন পরিষদ) অ্যাক্ট প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে নয়টি ওয়ার্ডে ভাগ করার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন করে তিনজন মহিলা সদস্য সংশ্লিষ্ট তিনটি ওয়ার্ডের নারী ও পুরুষদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অ্যাক্ট অনুসারে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারণ সদস্য পদে এবং ১২,৮২৮ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। এ জন্যই বলা যায়, ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের তুলনায় ছিল বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সেবারই প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এ কারণে গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, যা এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে থেকে নির্বাচনে ভোট প্রদান করা কিংবা নির্বাচিত হয়ে আসাটাই নারীর চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সার্বিক শর্ত পূরণ করে না। নির্বাচিত হয়ে আসার পর কার্যকরভাবে পরিষদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কিংবা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত।

১৯৯৭ সালের নির্বাচনে সারাদেশের ৪১৯৮ ইউনিয়নের ১২,৮৯৪টি সংরক্ষিত আসনে ৪৬,০০০ মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ২২টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলা ভোটারের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। ভোটার এবং প্রার্থী হিসেবে মহিলাদের অংশগ্রহণের সংখ্যাগত পরিমাণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু অংশগ্রহণের প্রকৃতি বা গুণগত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারী প্রার্থীরা সংরক্ষিত আসনে স্বাধীন ও সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন এনজিও, যেমন গণসাহায্য সংস্থা (আধুনিক বিলুপ্ত), নিজেরা করি, প্রশিকা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে 'কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্র শিক্ষা' শিরোনামে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করে একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় এই এনজিওটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নারী প্রার্থীদের জন্য প্রচারণা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে; এমনকি নারীদের সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে পুরুষের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ করে।

নারী সদস্যদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক নারী তাদের স্বামীর ইচ্ছাপূরণ, ছেলের প্রভাব বৃদ্ধি, মেম্বার কিংবা চেয়ারম্যানের ইচ্ছায় প্রার্থী হয়েছেন। সমাজের সরদার-মাতব্বর এবং পারিবারিক বাধার কারণে অনেক নারীর পক্ষে সাধারণ আসনে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। যদিও ১১০ জন মহিলা সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছিলেন, তবু তাদের ছিল বিভিন্ন এনজিও-র সঙ্গে সম্পৃক্ততা, স্বামী কিংবা পরিবারের

প্রভাব এবং গ্রাম্য দলাদলির প্রভাব। দলাদলির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেছে টাঙ্গাইলের দেওল বাড়ি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে। ঐ ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ আসনে পর পর পাঁচবার পরাজিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ প্রার্থীর প্রতি অন্য এক পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রশিকার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত একজন মহিলাকে সাধারণ আসনে প্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু নির্বাচনে তিনি গ্রাম্য দলাদলি ও টাকার প্রভাবের কাছে পরাজিত হন। অর্থাৎ নিজস্ব যোগ্যতায় পুরুষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নারীরা অর্থনৈতিক ও চেতনাগত দিক থেকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর নয়। অনেক নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পারিবারিক বাধা ও সমাজপতিদের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সন্দ্বীপে নারী প্রগতি সংঘের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এবং সংরক্ষিত আসনে মনোনীত নারী সদস্যদের ভূমিকা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নিজের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একজন নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার প্রার্থিতা নিয়ে সমাজে বৈঠক বসে। সেখানে সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত দেন যে ঐ সাধারণ আসনে একজন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, কোনো নারী নয়। তাই উক্ত সাধারণ আসনে তিনি যেন প্রার্থী না হন। এও বলা হয় যে, তিনি যদি এ সিদ্ধান্ত না মানেন, তাহলে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে। সরাসরি একটি এনজিওর সমর্থন পাওয়ার পরও সমাজপতিদের সিদ্ধান্তের কারণে যেমন উল্লিখিত নারী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেননি, তেমনি সমাজপতি মৌলবাদীদের দেয়া ফতোয়ার কারণে সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এমনকি ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর, বেগমগঞ্জ, গোপালগঞ্জের প্রায় ১৭ হাজার মহিলা ভোটার। ১৯৬২ সালে ধর্মীয় অজুহাতে সর্দার মাতব্বরদের দেয়া ফতোয়ার কারণে কোনো কোনো স্থানে দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে মহিলা ভোটাররা ভোট প্রদান করতে পারছে না বলে জানা গেছে। 'মহিলা নেতৃত্ব ধর্মের পরিপন্থী', 'মহিলাদের ভোট প্রদান নাজায়েজ', 'পুরুষরা ভোট দিলেই চলবে' ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ফতোয়ার মাধ্যমে নারী নির্যাতন যেমন চলছে, তেমনি ঘটছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি। মেঘনা গুহঠাকুরতা ফতোয়ার ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে এর তিনটি দিক তুলে ধরেছেন। প্রথমত, সামাজিক মূল্যবোধ ভাঙার অজুহাতে নারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত, এনজিওর অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে জয়যুক্ত হয়ে নারীরা যখন স্বনির্ভর হতে থাকে তখনি ফতোয়ার মাধ্যমে তাদের সামাজিক উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা হয়; এবং সবশেষে ফতোয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি। বিরূপ ফতোয়া দিয়ে নারীদের মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বিরূপ ফতোয়ার কারণে নারীরা যখন নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে পারছেন না, প্রার্থী হতে পারছেন না, তখন সংবিধানের (অনুচ্ছেদ ৩৬ ও ১২২) সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ঘটলেও তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ দৃশ্যমান হয়নি। রাষ্ট্র সমাজের চলমান মূল্যবোধকে

এভাবেই লালন করছে। যার ফলে সরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের ওপর যতই গুরুত্ব দেয়া হোক না কেন, তা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে।

নেতিবাচক ফতোয়া, পর্দাপ্রথার কঠোরতা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে প্রায়শই বাধা সৃষ্টি করছে। পর্দাপ্রথার কঠোরতার জন্য নারীরা অন্দরমহলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভোট প্রদান কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজপতিদের চাপানো অনুশাসন নারীদের পক্ষে মেনে চলা কঠিন হয় বলেই কিছু কিছু এনজিও এর বিরুদ্ধে নারী যাতে তার লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, সেই লক্ষ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন নারী প্রগতি সংঘের কর্মীরা সন্দ্বীপ অঞ্চলে বাড়ির পুরুষ ও সমাজপতিদের সাথে আলোচনা করে মহিলাদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করেন। নিয়মিতভাবে পুরুষদের সাথে আলোচনা ও যোগাযোগের মধ্যদিয়ে সন্দ্বীপে মহিলাদের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হয়।

নির্বাচনে প্রার্থী হবার মতো নির্বাচনী প্রচারণাতে নারীর অংশগ্রহণের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয়েছে। পর্দাপ্রথার কঠোরতা, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি কারণে নারী প্রার্থীদের পক্ষে তাদের স্বামী, ভাই, ছেলে বা পুরুষ আত্মীয়রা প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করেছেন। নির্বাচনে বিবাহিত নারী প্রার্থীদের স্বাধীনভাবে বিচরণের ব্যাপারে সামাজিক বাধা প্রবলভাবে কাজ করেছে। একটি গবেষণা এলাকার নয় জন সদস্যের মধ্যে তিন জনই বাড়ির বউ হবার কারণে নিজে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, চার জন সদস্য স্বামী ও ছেলের প্রভাবের কারণে প্রচারকাজে অংশগ্রহণের প্রয়োজন মনে করেননি, দুই জন প্রচারকাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কারণ তাদের স্বামী বা অন্য কোনো নিকট পুরুষ অভিভাবক ছিল না। সন্দ্বীপ ও নেত্রকোনায় কর্মরত এনজিও মহিলা প্রার্থীদের পক্ষে পরোক্ষভাবে প্রচার কার্য চালিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য (বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর) ব্যক্তিদের সহযোগিতা নিয়েছে।

৫.০ উপসংহার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিধিতে জনগণের সুষম উন্নয়নে রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, নীতিনির্ধারণী, প্রশাসনিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। জাতীয় সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, নারী আন্দোলনে, মানবাধিকার সংগঠনের নানা কাজের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নীতি হিসেবে গৃহীত হলেও বলা প্রয়োজন যে, এ সম্পর্কিত সর্বজনীন কোনো ধারণা এখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। সাধারণ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে জাতীয় সরকার কিংবা সংস্থাগুলো এখনো তেমন সাফল্য পায়নি, যদিও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলা যায়। এর অর্থ হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত

ধারণা এবং কর্মপরিকল্পনা কোনো-না-কোনো ত্রুটির কারণে সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এখন সময় এসেছে এসব ত্রুটি চিহ্নিত ও শনাক্তকরণ করে নারীর ক্ষমতায়নের কাজটি যতটা দ্রুত সম্ভব কুসুমাস্তীর্ণ করে তোলা। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না বলে আমাদের প্রত্যাশা।

নারীর ক্ষমতায়ন

শামীমা পারভীন

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। কেবল মানবেতর অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্যই নয়, এখন সকল সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সমস্যা পরিবেশ বিপর্যয়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র্য বিমোচন বা নিরক্ষরতা—যাই হোক না কেন। নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক পর্যায়ের সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। রিওতে ধরিত্রী সম্মেলন, ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্মেলন, কায়রোতে জনসংখ্যা সম্মেলন, কোপেনহেগেনে সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন এবং বেইজিং নারী সম্মেলনে আলোচ্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বারবার এ প্রসঙ্গটিই এসেছে। কেবল বিশ্ব সম্মেলন নয়, বাংলাদেশেও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পরিসরে যে কোনো নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও দেশজুড়ে নারীহত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। নারী পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। তাই নারীর ক্ষমতায়ন কেবল সভা সেমিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না। এটিকে প্রায়োগিক করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা চিহ্নিত ক্ষমতায়নের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে।

ক্ষমতায়ন কী

ক্ষমতায়ন শব্দটি ক্ষমতার সাথে, বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। সহজভাবে বলা যায় : বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলে। এ ধরনের সম্পদকে চারভাগে ভাগ করা যায় :
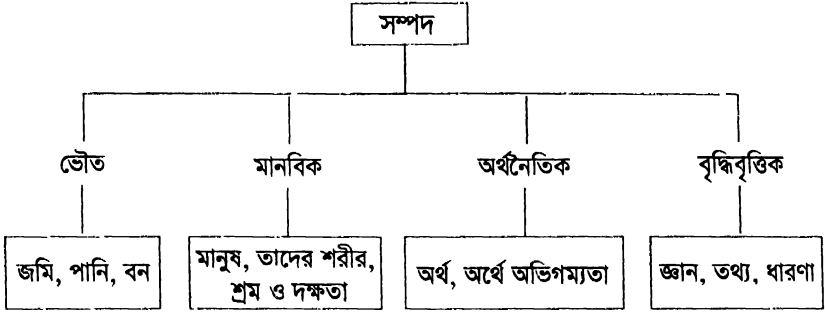
এসবের একটি বা অনেকগুলি সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়।

ক্ষমতাকে বোঝার জন্য এর অংশীদার মতাদর্শকে বোঝা প্রয়োজন। সকল ক্ষমতা কাঠামোর একটি সমর্থনকারী মতাদর্শ দরকার হয়। সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টনের বিদ্যমান ধরন বজায় রাখা এবং সকলের কাছে তা যথার্থ বলে গ্রহণীয় করার জন্য এটি প্রয়োজন হয়। মতাদর্শ বা বিশ্বাস ব্যবস্থা, যা কাঠামোকে সকলের কাছে গ্রহণীয় করে তোলে, তা সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রদত্ত ক্ষমতা কাঠামো স্থায়ী হতে পারে এবং অব্যাহত থাকতে পারে। আরো বলা যায়, ক্ষমতাকাঠামোর অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে ক্ষমতাহীনসহ এর সকল অংশের তা গ্রহণ এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে হয়ত সংঘর্ষমূলক উপায়ের মাধ্যমে এটি অর্জিত হবে। কিন্তু যখনই আধিপত্যশীল গোষ্ঠীর মতাদর্শধারীরা জয়ী হয়, তখন অসমতার জন্য একটি দার্শনিক যুক্তি তারা উত্থাপন করে এবং সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মাধ্যমে তা জোরদার করা হয়। মতাদর্শ ছাড়াও রাষ্ট্র তার প্রশাসন, আইন, সেনাবাহিনী ইত্যাদির দ্বারা সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী এবং অব্যাহত রাখে।

তবে ক্ষমতা, মতাদর্শ, এবং রাষ্ট্র কোনোকিছুই স্থির এবং একরৈখিক নয়। সবসময় তারা কম ক্ষমতাবান এবং সমাজের প্রান্তে অবস্থানরতদের কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যা থেকে বিভিন্ন মাত্রার ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি জনপ্রিয় উক্তির কথা বলা যায়—যেদিন পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিনই প্রথম নারীবাদ জন্ম নিয়েছিল। যখন এ চ্যালেঞ্জ শক্তিশালী এবং বৃহৎ আকার ধারণ করে তখনই তা একটি ক্ষমতা কাঠামোর সম্পূর্ণ রূপান্তর করতে পারে এবং তাকে পুরোপুরি ছুঁড়ে ফেলতে পারে। সেজন্য ক্ষমতায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যেখানে সমাজের ক্ষমতাহীনেরা বা কম ক্ষমতাবানেরা বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং বৈষম্য ও অধঃস্তনতার মতাদর্শ—যা এই অসম বণ্টনকে গ্রহণীয় করে—তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

নারীর ক্ষমতায়ন কী

নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, পিতৃতন্ত্র ও সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য

১. পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নারীর অধঃস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ এবং রূপান্তর করা।

২. কাঠামো, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান—যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে সমন্বিত এবং জোরদার করে তা পরিবর্তন করা। যেমন পরিবার, শ্রেণী, জাতি-বর্ণ, প্রথা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম, আইন এবং ওপর-নীচ উন্নয়ন মডেল ইত্যাদিসহ সবকিছু রূপান্তর করা।

৩. বস্তুগত সম্পদ এবং জ্ঞান সম্পদের ওপর অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষকেও ক্ষমতাবান করবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সকল প্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষকেও মুক্ত করবে। তারা নির্যাতক এবং শোষণকারীর ভূমিকা থেকে মুক্তি পাবে। বিদ্যমান সমাজে পুরুষের দায়িত্ব বলে যে সকল কাজ আছে, সে সকল কাজ থেকে মুক্তি পাবে। এতে পুরুষেরাও গৃহকাজ এবং শিশু প্রতিপালনে অংশ নেবে। বিনিময়ে নারীরাও পুরুষের কাঁধে চাপানো সনাতন দায়িত্বপালনে অংশ নেবে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে :

সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় নারীর মনে

মতাদর্শ হচ্ছে অন্যায্য ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তি, তাই সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তার মনে। নারীর নিজের সম্পর্কে, তার অধিকার, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া, জেন্ডার ও অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কীভাবে নারীর ওপর কাজ করছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া। শিশুকাল থেকে নারীর মধ্যে নীচতার যে বোধ মুদ্রিত করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেয়া; সর্বোপরি তার যে সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে শেখা যে, তাকে এবং অপর নারীদেরকে এ অধিকার আদায় করতে হবে, কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় এ ক্ষমতা দেবে না।

বাইরের শক্তির দ্বারা অবশ্যই ক্ষতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করতে হবে

ক্ষমতাহীন ও নিপীড়িতদের ক্ষমতা এবং অধিকারের দাবি জানাতে হবে। কিন্তু যে অধঃস্তন অবস্থানে নারীরা রয়েছে, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অধিকারের দাবি নাও করতে পারে। কারণ বিদ্যমান অধঃস্তনতার মতাদর্শের দ্বারা তারা প্রভাবিত। সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বাইরের শক্তির দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শক্তির নানারূপ হতে পারে। এর মানে এই নয় যে তাদেরকে নারীঅধিকার কর্মী, নারীসংগঠন বা এনজিও হতে হবে। দরিদ্র নারীদের সংগঠনও প্রভূত ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা পরিবর্তনের অন্যতম প্রতিনিধি হতে পারে।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে। ইতিহাসে আমরা দেখি যে, একজনের অবস্থানের পরিবর্তন হলেই সকল নারীর অবস্থান পরিবর্তি হয় না। সবসময়েই এমন নারীরা ছিল যারা তাদের সময়ের বাধাকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন রাজিয়া সুলতানা, রানী লক্ষ্মীবাঈ, বেগম রোকেয়া এবং আরো অনেকে। কিন্তু তাঁরা সকল নারীর জন্য স্থায়ী কোনো পরির্বতন আনতে পারেননি। এছাড়া যখন একজন বা দুজন নারীসমাজের প্রচলিত ধারা ভাঙে তখন সমাজ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু যদি একসাথে অনেকে কোনো পরিবর্তন দাবি করে, তবে সমাজের জন্য সে দাবি অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ গোষ্ঠীর ক্ষমতা সবসময় একজন ব্যক্তির ক্ষমতার চেয়ে বড়।

ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন যেখানে নারী যৌথভাবে তাদের নিজের জন্য 'সময় এবং স্থান' তৈরি করে, যেখান থেকে তারা তাদের জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে ও নয়া সচেতনতা তৈরি করতে পারে। পুরুষের কর্তৃত্ব এবং সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে এই স্থান ও সময় নারীকে পুরনো সমস্যা নতুনভাবে দেখতে, তাদের পরিবেশ ও অবস্থা বিশ্লেষণ করতে শেখায়। তারা তাদের শক্তি অনুধাবন করে, নতুন ধরনের তথ্যে ও জ্ঞানে তারা অভিগম্যতা লাভ করে এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলে।

নারীর ক্ষমতায়ন ওপর-নীচ বা একমাত্রিক প্রক্রিয়া হতে পারে না

নারীর ক্ষমতায়ন কোনো বৃত্তে সীমিত থাকতে পারে না। এটি গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে চক্রাকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। সচেতনতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ—এই পদক্ষেপ ও তার ফলাফল নারীকে উচ্চস্তরের সচেতনতা এবং কার্যকর ও সম্পাদিত কৌশলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ক্ষমতায়নচক্র পরিবর্তনের প্রতিনিধি, যৌথ নেতৃত্ব এবং পরিবেশকে সমমাত্রায় না হলেও প্রভাবিত করে। তাই ক্ষমতায়ন ওপর-নীচ বা একমাত্রিক হতে পারে না।

ক্ষমতায়ন কেবল মানসিক অবস্থার পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রকাশও থাকতে হবে। চারপাশের পৃথিবীকে স্বীকার করতে হবে, এর প্রতি সাড়া দিতে হবে। ক্ষমতায়ন মানে হচ্ছে সবসময় পছন্দ থাকা এবং পছন্দ করার ক্ষেত্রে নারীর সক্ষমতা তৈরি করা।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবে

ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। কেউ নারীর তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়, কেউবা কাঠামোগত অসমতা—যা এসকল সমস্যা তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। অনেক নারীবাদী সমাজবিদ তাই নারীর অবস্থা এবং অবস্থান এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। তারা বলেছেন, অবস্থা হচ্ছে বস্তুগত, যার মধ্যে একজন দরিদ্র নারী বসবাস করে—যেমন নিম্নমজুরি, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। অন্যদিকে অবস্থান হচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা। বেশিরভাগ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থা পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু নারীর ক্ষমতাহীনতা এবং অসমতার যে কাঠামো তা পরিবর্তনে তৎপরতা দেখা যায় না। এতে তাদের অবস্থার খানিকটা পরির্তন হলেও অবস্থান একই থেকে যায়। তাই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য হতে হবে।

রাজনৈতিক শক্তিতে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে রূপান্তর করতে পারে না

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে পরিবর্তন করতে পারবে না, যতক্ষণ না এটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত না হয়। এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত গণআন্দোলনে রূপায়িত হতে হবে, যা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং রূপান্তর করবে।

নারীর ক্ষমতায়ন বিদ্যমান ক্ষমতা ধারণারও পরিবর্তন করবে

ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্ষমতা মানে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রণ বা শোষণ নয়। পুরুষশাসিত শ্রেণীসমাজে ক্ষমতার এই প্রচলিত ধারণা তৈরি হয়েছে। এটি ধ্বংসমূলক ও নিপীড়নমূলক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা নারী-পুরুষ উভয়কেই প্রতিযোগিতা এবং দুর্নীতি করতে উৎসাহী করে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা মানে অংশগ্রহণ, আদান-প্রদান, সকল মানবের সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নয়ন।

ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত নয় যাতে এই পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ যেভাবে স্বার্থবাদী হয়ে পড়েছে এবং পরিবেশের ক্ষতি করে সম্পদ ব্যবহার করে চলেছে তেমনিভাবে নারী এবং সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হোক। নারীর

ক্ষমতায়নের দ্বারা বিশ্বকে এমন দিকে ধাবিত করা উচিত যেখানে নারী এবং সচেতন পুরুষকে নিশ্চিত করতে হবে যে সম্পদ কেবল সুষমভাবে ব্যবহৃত হবে, নিরাপদভাবে ব্যবহৃত হবে। এতে যুদ্ধ এবং নির্যাতন নির্মূল হবে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের পৃথিবী একটি পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পৃথিবীতে পরিণত হবে।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ

বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীর ক্ষমতায়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে নারীও এ মূল্যবোধ ধারণ করে এবং জীবনাচরণে তা চর্চা করে।

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধঃস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়। পুরুষ, তার সংসার ও পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূরণে তৈরি হয় বিভিন্ন মূল্যবোধ। মূল্যবোধ তৈরিতে এই প্রয়োজনপূরণই সূচক হিসেবে কাজ করে। নারী শিশুর জন্য খেলনা থেকে শুরু করে তার পোশাক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, চলাফেরার ধরন, কথা বলার ঢং, পেশা সবকিছু সম্পর্কেই মূল্যবোধ তৈরি করা হয় এই প্রয়োজনপূরণকে সামনে রেখে। পিতৃতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণে যে মূল্যবোধ তৈরি করা হয় সেখানে নারী হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং পুরুষবিনা নারীর গতি নেই। তাই জন্মমাত্রই নিকৃষ্ট ভেবে মেয়ে শিশুকে ছুঁড়ে দেয়া হয় বৈষম্যমূলক অবস্থানে। আবার এই বৈষম্যকে পাকাপোক্ত করতে এই নারী যাতে তা মেনে নেয় সেজন্য বৈষম্যের অনুকূলে তৈরি করা হয় মূল্যবোধ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানে নারীর অংশগ্রহণ অপ্রয়োজনীয় ভাবা হয়, যাতে করে নারী নেতৃত্ব প্রদানে পুরুষের মতো ভাগীদার না হতে পারে। নারী যাতে কোনোমতেই স্বাবলম্বী হতে না পারে সেজন্য নারীকে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দেয়া হয় না এবং পছন্দমত পেশা বেছে নিতে দেয়া হয় না। সেই সাথে নারীরা যাতে সম্পদশালী না হতে পারে সেজন্য যতটুকু সম্পত্তি তারা উত্তারাধিকার সূত্রে পায়, ততটুকুও গ্রহণ করা অনুচিত বলে প্রচার করা হয়। নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো মূল্যবোধ তৈরি করা হয় না। বিরাজমান মূল্যবোধ তাই নারীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে। ফলে মূল্যবোধের দুষ্টচক্রে পাক খেয়ে নারী আরো অধিকার, মর্যাদা, সম্পদ ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

পিতৃতন্ত্রের স্বপক্ষে রচিত আইন-কানুন

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমঅধিকার দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩)। কিন্তু বাস্তবে, বিশেষত পারিবারিক আইনে নারী

সমাজের জন্য যে সকল আইন কানুন রয়েছে, তাতে নারীর প্রতি অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি আইনে এ বৈষম্য ধরা পড়ে। এছাড়া যৌতুক, নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আইনও কাঠামোগতভাবে দুর্বল, ফলে তা যৌতুক ও নির্যাতন প্রতিরোধে কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ধর্ষণ আইন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, এতে নির্যাতিতের জন্য বিচার পাওয়া প্রায় দুরূহ। এ সকল আইন-কানুন নারীকে অধঃস্তন করে রাখে ও ক্ষমতাবান হতে দেয় না। বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পায় নারী, হিন্দু আইনে নারী কিছুই পায় না। এভাবে সম্পত্তি লাভে নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়। সম্পদশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা নারীর জন্য তাই দুরূহ। শর্তসাপেক্ষে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার নারীর জীবনকে বিষিয়ে তোলে। নারী নির্যাতিত হলেও তার তালাকের অধিকার নেই। আর পুরুষ এটি এত সহজে প্রয়োগ করে যে নারীকে নিঃস্ব হয়ে স্বামী সংসার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। দশ মাস দশ দিন নারীর রক্তে নারীর মাংসে যে সন্তান মাতৃগর্ভে বড় হয়ে ওঠে, নারী সে সন্তানের আইনত অভিভাবক হতে পারে না। এভাবে এ সকল আইন নারীর জীবনকে কেবল বৈষম্যের শিকার করে না, অভিশপ্তও করে। বাংলাদেশ শরিয়া ল'র দোহাই দিয়ে জাতিসংঘ সনদ সিডও দলিলে পূর্ণ সম্মতি দেয়নি। বর্তমানে সিডও দলিলের ২ নম্বর ধারা ও ১৬(১)গ ধারায় বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। উল্লেখ্য যে এ ধারাসমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিবাহের ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমান অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।

মৌলবাদ

মৌলবাদীরা ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কোনো নেতৃত্বই নারীকে মেনে নিতে পারে না। তারা সর্বত্র একজন পুরুষ এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়। তারা নিকৃষ্টতম বিদ্বেষ ও নিয়ম-কানুন দ্বারা নারী-সমাজকে পর্যুদস্ত করতে চায়। নারীরা যখনই পুরুষের আর্থিকসহ সকল প্রকার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে তখনই এরা ফতোয়ার মাধ্যমে নারীকে অবরুদ্ধ করতে ও শাস্তি দিতে চায়। বিশেষত গ্রামবাংলায় নারীরা যখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াই করছে, তখন এরা নানারকম ফতোয়া দিয়ে নারীদের নির্যাতন করছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করছে।

আধুনিক উন্নয়ন কৌশলের অনুসরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে ভিন্ন আদলে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ আধুনিকায়ন উন্নয়ন কৌশলের প্রেসক্রিপশন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে হাজির হয়। এ তত্ত্বের

মাধ্যমে বলা হয়, তৃতীয়বিশ্ব প্রথমবিশ্ব থেকে সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। এ সকল ফারাক ঘোচাতে পারলেই তৃতীয়বিশ্ব উন্নত হবে। উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি, প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল ও পরামর্শদাতা আসতে থাকে। এই উন্নয়ন কৌশল ছিল ধনী ও পুরুষ পক্ষপাতিত্বমূলক এবং পরিবেশ প্রতিকূল। এই কৌশলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মুনাফাভিত্তিক কৃষি ও শিল্পের প্রসার হয়, যা প্রধানত পুরুষকেই কাজ দেয়, প্রযুক্তির মালিক করে এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল শেখায়। কুটিরশিল্প ধ্বংসের মাধ্যমে নারীর কাজের ক্ষেত্র ধ্বংস করে দেয়, তার প্রাকৃতিক জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্র নস্যাৎ করে দেয়। কৃষি ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের পূর্বে নারী বীজ সংরক্ষণ ও নির্বাচনের কাজটি করত। এছাড়া নারীর শরীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে আধুনিকায়নের টার্গেটে পরিণত হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শিকার নারী।

বাংলাদেশে আধুনিকায়ন কৌশল এখনও অব্যাহত রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নারীর শরীর এখনও লক্ষ্যবস্তু। নারীর সস্তা শ্রমব্যবহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নয়নের সাথে নারীকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি বা তার ক্ষমতায়নের জন্য কোনো উন্নয়ন কৌশল নেয়া হয়নি।

বাজার অর্থনীতি নারীর অবস্থা দিনকে দিন অবনত করছে। একদিকে বাজারে নারী তার স্বল্প দক্ষতা ও স্বল্প পুঁজি নিয়ে টিকে থাকতে পারছে না, অন্যদিকে দারিদ্র্যের কারণে পুরুষেরা পরিবার ত্যাগ করে শহর অভিমুখী হওয়ায় নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। এ পরিবারগুলোর বেশিরভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। সেইসাথে বাজার অর্থনীতির পণ্য হিসেবে ব্যবহারের বর্ধিত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা দেশজুড়ে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাবার একটি কারণ।

পরিবেশ বিপর্যয়

বাংলাদেশে নারী, বিশেষত গ্রামীণ নারী নিত্যদিনের জীবন উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। জ্বালানি, পশুখাদ্য, শাকসবজী, ফলমূল ও ঔষধি গাছ সংগ্রহের জন্য নারী প্রকৃতির কাছে যায়। তাই পরিবেশগত বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় শিকার নারী। বন উজাড় হওয়ায়, পানির উৎস শুকিয়ে যাওয়ায় নারীকে এখন এগুলো সংগ্রহ করার জন্য বেশি কষ্ট করতে হয়। মাছ কমে যাওয়ায় নারীকে পূর্বের তুলনায় বেশি প্রোটিন ঘাটতির শিকার হতে হচ্ছে। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে বড় শিকার নারী। ১৯৯৮-এর বন্যার সময়ও দেখা গেছে দূষিত পানি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে নারী এবং চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের শিকার তারা বেশি হয়েছে। কেবল রোগব্যাধি নয় বন্যার সময় মানবিক অসহায়ত্বের কারণে নারী আশ্রয়কেন্দ্রে ধর্ষণেরও শিকার হয়েছে। ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে নারীর চাওয়া-পাওয়া আগের তুলনায় কম পূরণ হয়। নারী আরো দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়

রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারীদের দায়িত্ব প্রাপ্তি

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতৃত্বে নারী থাকলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। নারীর অধঃস্তন এবং বৈষম্যমূলক অবস্থান, দরিদ্রদের মধ্যেও নারীর দরিদ্রতর অবস্থান মুখ্য ধারার রাজনীতিতে ইতিবাচকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নারী নির্বাচিত হওয়ায় পূর্বের তুলনায় রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীদের উপস্থিতি অনেক বেশি চোখে পড়ছে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের সংস্কার নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। কিন্তু নারী সদস্যরা নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব পাননি বলে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে সিদ্ধান্তগ্রহণ, বিচারসালিশ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এতে করে সর্বত্র নারী প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে উন্নয়নে যে নতুন মাত্রা ও অগ্রগতি যুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে, তা থেকে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া এই নারীদের নির্বাচনের মাধ্যমে নারী নির্যাতন প্রতিরোধসহ নারীর ক্ষমতায়নের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। কারণ ক্ষমতা কাঠামোর এই স্তরের সাথেই জনগণের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতা কাঠামোয় অবস্থানরত একজন নারীর সাথে তাদের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের সবচেয়ে ভালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ আধিপত্যের জন্য এতদিন সে সম্ভাবনাও ছিল শূন্য। গ্রামীণ নারী হিসেবে এরা গ্রামীণ নারীদের প্রয়োজন ও অবস্থার কথা সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে। নির্বাচিত নারীরা তাই ক্ষমতা পেলে নারীর ক্ষমতায়নের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হবে।

এছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন। কারণ নিজেদের বিষয়ে কৌশলগত সিদ্ধান্তগ্রহণের স্তরে না থাকলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।

নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী আইন পরিবর্তন : সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন

জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের তিনটি ধারায় আপত্তির মধ্যে ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) ধারায় আপত্তি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ সরকার। সিডও সনদের ১৩(ক) ধারায় জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে এই অধিকার, বিশেষ করে পারিবারিক কল্যাণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে নারীর প্রতি

বৈষম্য দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর ১৬(১) (চ) ধারায় রয়েছে অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশিপ ও পোষ্য সন্তান গ্রহণ অথবা অনুরূপ ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরাজমান; সেখানে একই অধিকার ও দায়িত্ব এবং সকল ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে পুরুষ নারীর সমতা নিশ্চিত হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদের ২ নম্বর ধারা অনুমোদন করেনি; যাতে বলা হয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন আইন, বিধি, প্রথা, অভ্যাস ও দণ্ড বাতিল করা, নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করা, প্রয়োজনে আইনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর সমতা নীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যিক। ১৬(১) গ ধারায় রয়েছে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে। যে দুটি ধারায় এখনও বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি রয়েছে তা না উঠিয়ে দিলে অন্য ধারায় আপত্তি না থাকলেও নারীর বিদ্যমান অধঃস্তন অবস্থানের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। কেননা একটি ধারা আরেকটি ধারার পরিপূরক। তাই বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের দাবি হচ্ছে সকল ধারা থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করতে হবে।

সর্বজনীন পারিবারিক আইনের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের নারীসমাজের অন্যতম দাবি হল নারী-পুরুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমতার আইন চালু করা। বাংলাদেশে বসবাসকারী ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, শ্রেণী ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল নারীর পারিবারিক জীবনে সমঅধিকার, সমদায়িত্ব, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ভয়াবহ নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করা দরকার। এ দাবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমানের প্রচলিত ও কার্যকর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভরণপোষণ, বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, সন্তানের অভিভাকত্ব-তত্ত্বাবধান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আইন ও রীতির সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা অকার্যকারিতা দূর করা।

নারীসমাজের এই দাবি বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারীর অধিকার সম্পর্কিত ধারা ও সিডও সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও একসূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশের নারীসমাজ দীর্ঘদিন ধরে এই আইন বাস্তবায়নের জন্য দাবি করে আসছে। সিডও সনদের পূর্ণ বাস্তবায়নের ধাপ হিসেবে সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচার মাধ্যমে নারীর প্রতি নেতিবাচক

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আইনের চেয়ে মূল্যবোধের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর গণমাধ্যম এই মূল্যবোধ তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমে যেভাবে নারীকে প্রতিফলিত করা হয় তা অবমাননাকর, নেতিবাচক ও সনাতন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বর্তমানে যেভাবে নারীকে প্রতিফলিত করা হচ্ছে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায়

পর্ণগ্রাফির পর্যায়ে পৌঁছেছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে নারীকে গণমাধ্যমে পুরুষের অধঃস্তন হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। আর নারী এ বাধার প্রাচীর ভাঙতে চাইলে দুষ্ট, কুলটা নারী হিসেবে নাটক বা সিনেমার উপসংহারে তার শাস্তির ব্যবস্থা থাকে। গণমাধ্যমে নারীর এই চিত্র প্রতিফলনে, বিশেষত শিশুদের নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গণমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন বন্ধ করতে হবে। নারীকে মতামত প্রদানে সক্ষম মানুষ হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে ভোগ্য হিসেবে গণ্য করার জন্যই বাংলাদেশে অগুণতি নারী নির্যাতিত হচ্ছে। তাই গণমাধ্যমে এই পরিবর্তন আনাটা জরুরি।

নারীর কাজের স্বীকৃতি, সকল প্রকার কাজে অভিগম্যতা ও গৃহস্থালী কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ

পরিবার ও সমাজ নারীর কাজকে তুচ্ছ গণ্য করে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও গৃহকাজসহ নারী করে এমন অনেক কাজের স্বীকৃতি নেই। জিডিপিতে নারীর এ সকল কাজকে অন্তর্ভুক্ত না করার মাধ্যমে এই স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রমাণ মেলে। স্বীকৃতি নাই বলে নারী পুরুষের তুলনায় সময়ের দিক থেকে অধিক পরিমাণে বেশি এবং সন্তানজন্মদানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুনরুৎপাদনমূলক কাজ করলেও নারীর মর্যাদা সমাজের চোখে কম। অন্যদিকে সকল প্রকার কাজে নারীর অভিগম্যতার ক্ষেত্রে, পারিবারিক, সামাজিক এবং কোনো কোনো কাজে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ রয়েছে। নারী যে সকল প্রকার কাজ করতে পারে, সমাজ ও পরিবারের এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া দরকার, যা নারীকে মর্যাদাবান করবে। সকল ধরনের কাজে নারীর অভিগম্যতা থাকলে তার ক্ষমতাবান হবার পথ সম্প্রসারিত হবে। অন্য অনেক সমাজের মতো বাংলাদেশে গৃহস্থালী কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। এতে করে একদিকে নারীকে গৃহস্থালী কাজ এবং উৎপাদনশীল কাজের বোঝা একযোগে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অন্যদিকে গৃহস্থালী কাজের দায়িত্ব এককভাবে নারীর কাঁধে চেপে যাওয়ায় নারী অন্য অনেক কাজে যোগ দিতে পারছে না। পুরুষ গৃহস্থালী কাজে অংশ নিলে একদিকে নারীর পক্ষে বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করা সহজ হত, অন্যদিকে গৃহকাজে অংশ নিলে পুরুষ নারীর গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারত। ফলে নারী তার কাজের স্বীকৃতি অনায়াসেই পেত।

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নধারা অনুসরণ

আধুনিকায়িত উন্নয়ন কৌশলের কারণে সংঘটিত পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে এখন এমন সময় এসেছে যখন মানুষ বিকল্প উন্নয়ন কৌশলের কথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কথা ভাবলেই হবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, ন্যায্য, স্থায়ীত্বশীল বিশ্ব গড়তে হবে। আর স্থায়ীত্বশীল বিশ্ব গড়তে হলে এমন একটি স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ধারা গড়তে হবে যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হবে পরিবেশের সাথে মানুষের

একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখা এবং নারীকে এই উন্নয়ন ধারার কেন্দ্র নিয়ে আসা। নারীকে উন্নয়ন ধারার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে এই কারণে যে, ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমানেও নারী খাদ্য, পশুখাদ্য, জ্বালানি এবং আশ্রয় ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নধারা অনুসরণ করলে একদিকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে দেশ, অন্যদিকে নারী-পুরুষের সমতার পথে অগ্রগতি সাধিত হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে।

রাজনীতির গণতন্ত্রায়ন

মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ না করলেও রাজনীতির গণতন্ত্রায়নে মৌলবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়বে। রাজনীতির গণতন্ত্রায়নের ফলে সমাজের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে রাজনীতিতে নানাভাবে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে এবং রাজনীতি তখন বিশেষ কারো করতলগত হয়ে থাকবে না। মৌলবাদীদের এককেন্দ্রিক তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রবাহ থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারবে। মানুষ ধার্মিক এবং ধর্মকে ব্যবহার করে এমন স্বার্থ উদ্ধারকারীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে। ফলে ধর্ম ব্যবহারকারীদের প্রতি জনসমর্থন শূন্য হতে থাকবে। সেই সাথে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে বন্দুকের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া এদের পক্ষে কঠিন হবে। রাজনীতির গণতন্ত্রায়নে মৌলবাদীদের ক্ষয় এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে নারীদের জয় হবে।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও অভিগম্যতা কম। ফলে এ সকল নীতিনির্ধারণী স্থানে নারী সম্পর্কিত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত কমই গৃহীত হয়। নারীপ্রতিনিধিত্ব থাকে না বলে নারীদের সেখানে কিছু করার থাকে না।

শেষকথা

সাম্প্রতিক জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচকে বাংলাদেশের স্থান ১০৪টি দেশের মধ্যে ৭৭। জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচকের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী-পুরুষের সমতা-অসমতা পরিমাণ করা হয়। এই সূচক থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হচ্ছে, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি উচ্চ আয় বা প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত নয়। নারীর সুবিধার মধ্যে ও আয়ের মধ্যে যোগসূত্রের অনুপস্থিতি আরব দেশগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যায়। তাই বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধা হিসেবে কেউ দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করলে তা ধোপে টিকবে না। বরং দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার মধ্য দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্য ইতিবাচক

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে নারীপ্রতিনিধিত্ব বাড়াতে তেমনি পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বত্র মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে দারিদ্র্য, মৌলবাদ, এমনকি নারীদের অদক্ষতাও নারীর ক্ষমতায়নে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছা, অঙ্গীকার আর সুনীতির। নারীর ক্ষমতায়ন কেবল তখন মুখের বুলি হিসেবে থাকবে না, প্রায়োগিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হবে।

তথ্যসূত্র

১. *Women's Empowerment in South Asia,* Srilatha Batliwala, March 1994. FAO and ASPBAE.

২. *ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড,* বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৯৩, ঢাকা।

৩. Development and Sustainable Development, Kamla Bhasin, New Delhi, 1991.

৪. UNDP's 1994 Report on Human Development Bangladesh, *Empowerment of Women,* March, 1994, Dhaka.

৫. 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ' বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত প্রতিবেদন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ১৯৯৭।

৬. UNDP's Report on Human Development, 1997.

৭. *ভোরের কাগজ,* ২০ জুলাই ১৯৯৭, ঢাকা।

৮. *Women and Politics,* Women for Women, November, 1994.

আন্দোলন

আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা

মণি সিং

কমরেড মণি সিংহ আমৃত্যু দেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি দেখেছেন এ দেশের নারীরা কত দৃঢ় চেতনায় এবং অকুতোভয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। আন্দোলনকে দিয়েছেন গতি, আন্দোলনে সঞ্চার করেছেন প্রাণ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবন সংগ্রাম' থেকে নারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং সে প্রসঙ্গে মণি সিংহের মূল্যায়নের অংশগুলো এখানে সংকলন করা হয়েছে।

সুসং জমিদারদের আয়ের মূল ক্ষেত্র ছিল গারো পাহাড়। সমতল ভূমির আয়ের দিকে নজর অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তালুকদারি, নিষ্কর প্রভৃতির জন্য সমতল ভূমির এক বড়ো অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ব্রিটিশ আমলে গারো পাহাড় হস্তচ্যুত হওয়ায় সুসং রাজ্য অন্য দশটি জমিদারির মতো আর একটি জমিদারিতে পরিণত হল। ব্রিটিশ সরকার যখন জানতে পারল যে, গারো পাহাড়ে প্রচুর কয়লা আছে এবং অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, তখন গারো পাহাড়কে সরকারি খাসে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের তরফ থেকে জমিদারকে নোটিশ দেওয়া হল, গারো পাহাড়ের ওপর জমিদারের আইনত কোনো অধিকার নেই। ফলে মামলা বেধে গেল। মোগল আমলের সনদ ছিল, কাজেই মামলায় হাইকোর্টে জমিদাররা জয়লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকার প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করে। ভারত সরকার যখন জানতে পারল যে, জমিদাররাই জিতে যাবে, তখন 'গারো হিলস্ অ্যাক্ট' নামে ১৮৮৫ সালে একটি আইন করে গারো পাহাড়ের ওপর জমিদারদের স্বত্ব রদ করে দেয়া হল। আইন করা হল যে, এ জন্য কোনো মামলা করা যাবে না। ব্রিটিশ সরকার ক্ষতিপূরণস্বরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে 'মহারাজা' উপাধি এবং এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা জানাল। জমিদাররা বললেন, "আমাদের মহারাজা উপাধি তো আছেই, আর ক্ষতিপূরণও যৎসামান্য—আমরা কোনোটাই চাই না।" পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে তাঁদের এটা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এর ফলে সুসং রাজাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়।

প্রকাশ্যে তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ-ভক্ত, কিন্তু মনে ছিল তাঁদের ব্রিটিশ-বিরোধী আগুন। এই ক্ষত এই বংশ কোনোদিন ভুলতে পারেননি।

সুসং রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর খুব সম্ভব আসাম থেকে আমদানি করা হয়েছিল হাজং উপজাতিদের। এরা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কামাখ্যা ছিল তাদের জাগ্রত দেবতা। এদের ভাষা ঠিক বাংলা বা আসামি নয়। বলা যায় বাংলা ভাষার অপভ্রংশ। গারো পাহাড়ের পাদদেশে এদের বসানো হয়েছিল। তারা ছাড়া ডালু, কোচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি বর্ণের উপজাতি গারো পাহাড়ের পাদদেশে বাস করত। হাজংরা ছিল সৎ, সাহসী ও দুর্ধর্ষ। এদের গারো পাহাড়ের পাদদেশে বসানোর উদ্দেশ্য ছিল উভয় দিক হতে হামলা প্রতিরোধ করা।

... ...

উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক গৌরবময় কৃষক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস আছে। তার মধ্যে হাজংদের বিদ্রোহ অন্যতম। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বুদ্ধিজীবী এদের সাহায্যে ছিলেন না। উপজাতিরাই নেতা, উপজাতিরাই আন্দোলনকারী। গারো পাহাড়ের পাদদেশে ৭০ মাইল লম্বা ৫৬ মাইল প্রশস্ত এই এলাকায় দেশ ভাগাভাগির আগে পর্যন্ত কোনো বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান বাস করতেন না। বসবাসকারীরা ছিল সব উপজাতি।

... ...

টংক মানে ধার কড়ারি খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মতো ধান দিতে হবে। টংক জমির ওপর কৃষকদের কোনো স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কমলাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টংক নাম হল তা জানা যায় না—এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ঐ সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরন প্রভৃতি। ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদারি এলাকায় যে টংক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হত সাত থেকে পনের মণ। অথচ ঐ সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ঐ সময়ে ধানের দর ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হত এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল, তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টংক প্রথায় লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং জামিদাররাই টংক প্রথায় দুই লক্ষ মণ ধান আদায় করতেন। এটা ছিল জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

সুসং জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশ টাকা থেকে দুশ টাকা নজরানা দিতে হত। গরিব কৃষক ঐ নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টংক প্রথায় কোনো নজরানা লাগত না। কাজেই গরিব

কৃষকের পক্ষে টংক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টংকের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টংক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ঐ সব জমির হার নিলামে ডাক হত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশি ধান দিতে কবুল করত তাঁকেই অর্থাৎ পূর্বতন বেশি ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হত। এইভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে যায়।

আমার যতটুকু মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাকেই ভিত্তি করে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টংক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হব। কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর অভাব হবে না। কিন্তু এখানে কোনো প্রগতিশীল কর্মী নেই। কে এখানে আন্দোলন করবে? এই যে কৃষকদের আন্দোলনে এত বললাম বৃদ্ধরা বাড়িতে থাকবে আর মেয়ে-পুরুষরা সভায় আসবে। মোটকথা চারদিকে উৎসাহ-আবেগের আর সহযোগিতা-সহৃদয়তার এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল।

... ...

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের চার পাঁচ তারিখ ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিপুলসংখ্যক হাজং উপজাতি মেয়েরা পিঠে তাঁদের শিশুসন্তান বেঁধে সত্তর-আশি মাইল হেঁটে এসেছিলেন। পথে তাঁদের খাবারের অবশ্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল হাজংদের এক বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী। কিশোরগঞ্জ থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের এক বিরাট বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকা জেলা থেকেও কৃষক বাহিনী এসেছিল। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীবাহিনী ও নেতারা এসেছিলেন। এছাড়া ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী চন্দ্রিকা সিং গাড়োয়াল। তিনি ১৯৩০ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিলেন। এতে সে সময় তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় প্রথমে উক্ত দণ্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং সর্বশেষে তিনি মুক্তি পান। তাছাড়া মণিপুরের প্রখ্যাত নেতা ইরাবত সিংসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের দীর্ঘ ও সবলদেহী শিখরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা নদীতে যখন স্নান করতেন তখন ঐরূপ জোয়ান পুরুষের লম্বা লম্বা চুল দেখে দর্শকরা আশ্চর্য হত। তাছাড়া হাজার হাজার উপজাতি মেয়েদের দেখে নেত্রকোণাবাসী তো বিস্ময়ে অভিভূত। তাঁরা ভাবেন—এত অল্প সময়ে এত মেয়েদের কমিউনিস্টরা আনল কিভাবে! কমিউনিস্টদের কৃষক সংগঠনের শক্তি ও শৃঙ্খলা দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন।

... ...

১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। সুসং-দুর্গাপুরের অপর পারে বহেরাতলী গ্রাম। এ গ্রামে হাজং ও গারোদের বাস। বিরিশিরি হতে চার মাইল দূরে। বহু বছর থেকেই

এখানে একটি অস্ট্রেলিয়ান মিশন আছে। অস্ট্রেলিয়ার লোকজন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে কর্তাব্যক্তি। এখানে হাই স্কুলও আছে। যাহোক, ঐ ক্যাম্প হতে পাঁচজন পুলিশ মাইল চার দূরে হাজং বাড়িতে তল্লাশি করতে যায়। তখন হাজং মেয়েরা দা নিয়ে তাদের তাড়া করে। পুলিশরা তাদের এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে যায়। এরা আরও জানত যে, কোনো সংকেত করলে শত শত হাজং মুহূর্তে পঙ্গপালের মতো এসে উপস্থিত হবে। অতএব তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে আসে। পরে পঁচিশজন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে তারা বহেরাতলী গ্রামে যায়। ঐ গ্রাম থেকে বিশ একুশ বছর বয়সের কুমুদিনী নামে একজন বিবাহিত মেয়েকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় আমাদের জনচল্লিশ লোকের ভলান্টিয়ারের এক দল—ত্রিশজন পুরুষ ও দশজন মহিলা ঐ মাঠ দিয়ে আসছিল। কুমুদিনীকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে রাশমণি নামক একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করে। মুহূর্তে পুলিশ তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর সুরেন্দ্র নামে একজন গেলে তাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দিকে বল্লম ছুঁড়তে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ তখন নদীর দিকে যায়। শীতকালে নদীর জল অনেক দূরে সরে যায়। নদীর পাড় উঁচু, পুলিশের উদ্দেশ্য ওখান থেকে গুলি চালানো। সেই জন্য সব পুলিশ নদীর দিকে ধাওয়া করে। এদিকে দুজন পুলিশ নদীর দিকে যাওয়ার জন্য আলাদাভাবে অগ্রসর হয়। এখানে কিছু ঝোঁপ-ঝাড় ছিল। ঐ দুজন পুলিশ বরাক বাঁশের এক বেড়ায় আটকা পড়ে যায়। লতা-পাতায় ঘেরা থাকায় এখানে বেড়া আছে তা তারা বুঝতে পারেনি। ঐ উঁচু বেড়া পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় আমাদের ভলান্টিয়াররা তাদের আক্রমণ করে; ফলে ঐ দুই সশস্ত্র পুলিশ বল্লমের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অন্য পুলিশরা নদীর পাড়ে নামে বটে, কিন্তু তাদের ওপরও বল্লম এসে পড়তে থাকে। তারা মনে করেছিল যে, তারা ঘেরাও হয়ে পড়ছে। কাজেই ভয়ে বাসযোগে সবাই পলায়ন করে। এদিকে দুজন পুলিশ মরে পড়ে আছে, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

... ...

শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত হতে আগত এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নেতা কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত বিপ্লবী চিন্তাধারার কর্মীরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে মেয়েদের এক বিরাট অংশ তে-ভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু যে তাঁরা ভলান্টিয়ার ছিলেন তাই নয়, তাঁদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ও কৌশলী নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। রাজবংশী মেয়ে ভান্ডনী পুলিশের এক জমাদারের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে তাকে সারারাত এক ঘরে আটকে রাখেন। দিনাজপুরের রাণী শংকাইলের রাজবংশী কৃষকবধূ জয়মণির প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। তাঁর দলের আক্রমণে অনেক সময় পুলিশ পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি সামান্য লেখাপড়া জানতেন। এমন আর একজন নেত্রী ছিলেন দিনাজপুরের দীপপুরী। তিনি ভলান্টিয়ারদের উৎসাহ দিয়ে নিজেই লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে পুলিশকে আক্রমণ করেন। পুলিশ পিছু হটে পলায়ন করে। দিনাজপুরের আরও

অনেকের নাম করা যায়, যেমন শিখা বর্মন, মাতি বর্মনী, জয় বর্মনী। কৃষক আন্দোলনের একজন দুর্ধর্ষ নেত্রী ছিলেন সরলাদি; তিনি ছিলেন এক নমশূদ্র কৃষক রমণী। যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার গোয়াখোলা গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি। নড়াইলে যে তে-ভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কেন্দ্র ছিল বাকড়িগ্রাম। সরলাদির যেমন ছিল সাহস, তেমনি গায়ে ছিল জোর। পুরুষরাও তার নিকট হার মানত। সরলাদি আড়াইশ-তিনশ মেয়ের একটি ঝাঁটা বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। ঝাঁটার মুখে দুই-দুইবার পুলিশ বাহিনীকে মাফ চেয়ে সরে পড়তে হয়। ভলান্টিয়ার বাহিনী ঢাল-সড়কি নিয়ে পাহারা দিত। অনেক সময় পুলিশ তাঁদের ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। পুলিশ সরলাদিকে ধরবার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি চতুরতার সাথে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে চলে গিয়েছেন। সরলাদি আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী সেখানকার কৃষকরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

... ...

নেত্রকোণার সিংহের বাংলা গ্রামে আমরা জয়লাভ করতে পারিনি সত্য, কিন্তু একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে আজও ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এখানে মালিকরা ছিলেন হিন্দু ও ভাগচাষিদের অধিকাংশ ছিলেন মুসলমান। ভাগচাষিরা ছিলেন খুব গরিব। অন্যান্য জায়গার মতো এখানে পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভাগচাষীদের মনে ভীতির সঞ্চার করছিল, জেলের ভয় দেখাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের এক কর্মী নিত্যানন্দকে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করেছিল। নেতারা তখন আত্মগোপনে। নিত্যানন্দকে প্রহার করা হয়েছে এই খবর গ্রামে বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। নিত্যানন্দ ছিল এখানে একজন জনপ্রিয় কর্মী। গ্রামে সবাই ক্ষুব্ধ কিন্তু কোনো প্রতিবাদ মিছিল বের করা সম্ভব হয়নি। কারণ এখানকার সংগঠন ছিল দুর্বল। ভাগচাষীদের মেয়েরা গরিব ও পর্দানশিন। আমাদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ বা কথাবার্তা ছিল না। রাজবংশী নমশূদ্র বা হাজং মেয়েদের মতো তাঁরা বের হতেন না। কাজেই আমরা তাঁদের সাথে আলোচনা করতে পারতাম না। তাঁরা পর্দার আড়ালে থাকতেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন না। তাঁদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এলাকাটিও আমাদের জন্য ছিল অপেক্ষাকৃত নতুন।

এই সময় একদিন দুজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপির পর এক গরিব কৃষকের বাড়ির বাইরে, এক গাছতলায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল। এমন সময় ঐ বাড়ি হতে দুজন মুসলমান যুবতী বধূ দুটি দা হাতে রণমূর্তির বেশে বের হয়ে এলেন। তাঁরা সামাজিক রীতিনীতি ভুলে গেলেন। উচ্চস্বরে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় বললেন, "বান্দীর পুতরা, আমরার লুকেরে মারছস্ কেন, এই দাও দিয়া তরারে জবো কইরা ফালাইবাম!" যুবতীদের আকস্মিক এই রণমূর্তি দেখে হতচকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত এই পুলিশদ্বয় রাইফেল ফেলে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালিয়ে গেল। যুবতী দুজন এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঐ সময়ে এই এলাকার সরকারের খুব

খয়ের খাঁ এক মুন্সি ঐদিকে আসার সময় যুবতীদের দেখে বললেন, "যা, যা, তোরা বাড়ির ভেতরে আবরুর মধ্যে যা।" অনুগত মুন্সি সাহেব সরকারি বন্দুক ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে সরকারি মাল পৌঁছাবার জন্য দুই কাঁধে দুই রাইফেল নিয়ে চার মাইল দূরে থানায় উপস্থিত হল। মুন্সি ভেবেছিলেন, সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকরা ক্ষেপে ওঠে। তাঁরাও লাঠি দিয়ে আনসারদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করে। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ গুলি চালিয়ে দুজন কৃষককে আহত করল। গুলি চলছে দেখে কৃষকরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। গাড়ি চলছে দেখে গাড়ির গতি রোধ করল। এইরূপ অবস্থা দেখে দারোগা ভয় পেয়ে গেলেন। মনে করলেন আরও লোক নিশ্চয়ই এসে জুটবে। তিনি বললেন, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চল আমরা চলে যাই।" ক্ষণিকের মধ্যে তারা হাওয়া হয়ে গেল। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে বলদ দুটি খুলে গাড়িটি মাঠে ফেলে রেখে চলে গেল। কৃষকরা আওয়াজ তুলল, 'জান দিব তবু ধান দিব না।" আহত চাষী দুজনকে পিঠে বহন করে তাঁরা গ্রামে ফিরে গেলেন।

এরপর ২৬ ফেব্রুয়ারি চৈতন্যনগরে জমিদারি কাছারি দখল করা হল। কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হল। তহশিলদার ও পাঁচজন পেয়াদাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। বলা হল এখানে কেউ টংক ধান দিবে না। এর দুদিন পরে কালিকাপুরে দুই গাড়ি ধান আটক করা হল। হাজং রমণী মানিক, কলাবতীসহ প্রায় কুড়িজন মহিলা ধানের গাড়ি আটক করল। বিহারি গাড়োয়ান ইতস্তত না করে মহিলাদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে দিয়ে চলে গেছে। সরকারি কর্মচারীরা চাড়ুয়াপাড়া থেকে বিশ্বেশ্বরের একশ মণ লেভী ধান জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছিল। এই সময় পরেশ সরকারের নেতৃত্বে ভলান্টিয়াররা ধান আটক করল। বিশ্বেশ্বর বললেন, "আমার লেভী ধান দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হোক। আমি টাকা চাই না।" সরকারি কর্মচারীরা তা মানতে অস্বীকার করলেন। জঙ্গি ভলান্টিয়াররা ঐ ধান দুঃস্থ হিন্দু, মুসলমান, উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করে দিল। বিশ্বেশ্বরের এই মহানুভবতা সকলেই উত্তম কাজ হিসেবে প্রশংসা করল।

সব গ্রামে গ্রামে টংক ধান, লেভী, মহাজনের ধান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের কাছে ২৮ জানুয়ারি এক বিরাট সভা হল। তাতে টংক বন্ধ, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই প্রভৃতি আওয়াজ দেওয়া হল। ৩০ জানুয়ারি রাশিমণি ও সুরেন্দ্রের স্মরণে শহীদ দিবস ফিরে এল। চাড়ুয়াপাড়ায় জনসভা করে কর্মী ও ভলান্টিয়াররা দিকে দিকে প্রচারে বের হয়ে গেলেন। তাঁদের হাতে লাল পতাকা। ঘোষগাঁ হাটের দক্ষিণ ভালুকাপাড়া গির্জার সম্মুখে একদল সিপাই ও আনসার কয়েকজনকে গ্রেফতার করল। তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হল। কিন্তু সিপাইরা ছাড়ল না, বরং ভয় দেখাতে লাগল। সুচতুর নেতা নয়ান সরকার হাজং ভাষায় সকলকে বল্লম থেকে পতাকা খুলে নিতে বললেন। তিনি তড়িৎগতিতে রাইফেল ছিনিয়ে একজন সিপাইর বুকে বল্লম বিদ্ধ করে দিলেন। ইতোমধ্যে আর একটি বল্লমের আঘাতে আরেকজন ধরাশায়ী হল। এই সময়ে তাঁরা আর একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিল। এই অবস্থায় সিপাই ও আনসাররা অন্য উপায় না দেখে পলায়ন করল।

আগেই প্রচারিত হয়েছিল যে, হাজং কৃষকরা খুবই দুর্ধর্ষ। কখন কি করে তার ঠিক নেই। সশস্ত্র পুলিশরা তাই সবসময়ে খুব ভয়ে থাকত।

লেঙ্গুরা বাজার গারো পাহাড়ের সন্নিকটে। মঙ্গল সরকার এখানকার একজন দুর্ধর্ষ ও জঙ্গি কর্মী। তার ছিল চরিত্রবল, দুঃসাহস। সে আবার কমিউনিস্ট পার্টিরও সভ্য ও কর্মী ছিল। গ্রামের লোকেরা তার সম্পর্কে আমার কাছে নালিশ করল যে-মঙ্গল সরকার মদ খেয়ে যাকে তাকে মারধোর করে। এমনকি কর্মীরাও বাদ যায় না। এর একটি বিহিত করতে হবে। আমি মঙ্গল সরকারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—সে মদ খায় কি না? সে বলল যে মদ খায়। কারণ তাতে তার জোশ পয়দা হয়। আমি বললাম, "মদ খেয়ে মাতলামি করে অন্যদের মারধোর করা অন্যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে মদ খাওয়াকে জনসাধারণ খারাপ চোখে দেখে। এখন সংগ্রামের সময় সকল কর্মীকে জনপ্রিয় হতে হবে। এই অবস্থায় তোমার কাছে আমার প্রস্তাব হল, তোমাকে মদ ছাড়তে হবে, না হয় পার্টি ছাড়তে হবে। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল, তুমি চিন্তা করে, আমাকে জবাব দিবে।" পরের দিন মঙ্গল সরকার এসে বলল, আমি পার্টি কখনও ছাড়তে পারব না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনোদিন মদ স্পর্শ করব না।" পরে মঙ্গল সরকার তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে গিয়েছে।

১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার লেঙ্গুরা হাটের দিন প্রচারের কাজে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে অবাঙালি সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল পঁচিশ-ত্রিশজনের মত। মঙ্গল সরকারের দল যখন শ্লোগান দিল, 'টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করো,' তখন ঐ ক্যাম্পের পুলিশরা কোনোরূপ সতর্কতা ঘোষণা না করেই ভলান্টিয়ার দলের ওপর নৃশংসভাবে গুলি চালায়। ফলে মঙ্গল সরকার, অগেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এই সংবাদ যখন গ্রামে পৌঁছল তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবাল-বৃদ্ধবনিতা—যে যা হাতের কাছে পেলেন তাই নিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁরা এতখানি উত্তেজিত হয়েছিলেন, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার কোনো অবস্থা ছিল না। কিন্তু ত্রিশটি রাইফেল হতে অনবরত গুলিবর্ষণ হতে থাকল। তখন তাঁরা শুয়ে পড়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাঁদের অভিযান টিকল না। আরও ষোলজন মেয়ে-পুরুষ গুলিতে নিহত হলেন। শঙ্খমণি, রেবতি, যোগেন, স্বরাজ প্রমুখ মোট ১৯ জন শহীদ হলেন। ঐ সময়ে হাজং নেতারাও কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আমি ছিলাম নেত্রকোণায়। খবর শুনে আমি লেঙ্গুরায় উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, "সরাসরি পুলিশকে আক্রমণ করা ঠিক হবে না। রাইফেলের মুখে আমরা এইভাবে করতে গেলে আমাদের ক্ষতি হবে, পুলিশের কিছুই হবে না। কাজেই অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমাদের ওপর হামলা আসবে। পাহাড়ে আশ্রয়স্থল ঠিক করতে হবে। জঙ্গি ভলান্টিয়াররা ঐ সমস্ত স্থানে থাকবে।"

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ধরা পড়তে পড়তে খুব বেঁচে গিয়েছি। এই ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে আমাদের বাঁচানোর জন্য এক পর্দানশিন গৃহবধূর বিস্ময়কর চাতুর্যপূর্ণ উক্তি।

ঘটনাটি ছিল : আমি পাহাড় অঞ্চল হতে হাঁটাপথে নেত্রকোণা যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমি এলাকায় খুব পরিচিত তাই আমাকে বেশভূষা পরিবর্তন করতে হত। আমার পোশাক ছিল কৃষকের মতো। লুঙ্গি, আধ ময়লা শার্ট আর খালি পা। তাছাড়া ক্রেপ ও স্পিরিট গাম দিয়ে গোঁফ ও দাড়ি প্রয়োজন মতো তৈরি করে নিলাম। কেননা আমার দাড়ি রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ আমাকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হত। আমার পকেটে একটা ছোটো আয়না থাকত। এই জন্যে যে, কখন গোঁফ দাড়ি বিশৃঙ্খল হয়ে যায় তা লক্ষ করা দরকার। আমি পাহাড় অঞ্চল থেকে নেত্রকোণা যাচ্ছি, পথের দূরত্ব হচ্ছে ২৫ মাইল। আমার সঙ্গে কোনো সাথি ছিল না। আমি কিছু অন্ধকার থাকতে থাকতে ভোরে যাত্রা করলাম। সেদিন খুব বাতাস বইছিল। আমি আয়না দিয়ে দেখলাম আমার দাড়ি কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে। যে জায়গাটায় এটা দেখলাম সে স্থানটা নেত্রকোণা থেকে ৮/৯ মাইল দূরে। ইউনিয়ন হচ্ছে কালিয়ারা গাবরাগাতী। এখানে আমার একজন অনুগত টিকাদার ছিলেন। তাঁর জমি নিলাম হয়ে গিয়েছিল, তা তাঁকে পাইয়ে দিয়েছি। এটাই ছিল আনুগত্যের কারণ। আমি ভাবলাম যখন নকল দাড়ি বিশৃঙ্খল হয়েছে এখানে যাত্রাবিরতি করে সন্ধ্যার সময় নেত্রকোণার দিকে যাওয়া যাবে। এই চিন্তাটা আমার ঠিক ছিল না। কারণ, আমি মাথা ও দাড়ি গামছায় বেঁধে অনায়াসে যেতে পারতাম! এইরূপ একটি ভুল সিদ্ধান্তের ফলে আমি বিপদে পড়েছিলাম।

আমি নকল গোঁফ দাড়ি উঠিয়ে ফেলে টিকাদারের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। কিন্তু টিকাদার বাড়িতে নেই। তাঁর বড়ো দুই ভাই বাড়িতে আছেন, তাঁরা প্রথমে আমাকে চিনতে পারেননি। অবশ্য পরে চিনতে পেরে মহাযত্নে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করলেন। আমি তাঁদের বললাম সন্ধ্যার সময় আমাকে নদী পার করে দিতে হবে। তাঁরা বললেন ঠিক আছে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য রকম, সেদিন ছিল ঐ এলাকায় হাট, তাঁরা সন্ধ্যায় ফিরতে পারলেন না, অনেক রাত করে এলেন। এই রাতে ওখান থেকে যাওয়া নিরাপদ মনে করলাম না। আমি তাঁদের বললাম, এখানে আমাকে কেউ চেনে কি না? তাঁরা বললেন, না কেউ আপনাকে কোনোদিন দেখেনি, নাম মাত্র জানে। আমি বললাম, আমি খুব ভোরে চলে যেতে চাই। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে কোনো অসুবিধে নেই। তারপর বললাম, আমার বেশ পরিবর্তন করতে হবে, এটা এ ঘরে সম্ভব নয়। তাঁরা বললেন, আপনাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাব। আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম। খুব ভোরে ক্রেপ দিয়ে গোঁফ দাড়ি তৈরি করলাম। যখন গোঁফ দাড়ি শেষ করেছি এই সময়ে দফাদার ও কয়েকজন চৌকিদার তাদের বাড়িতে উপস্থিত হল। তারা বলল, এখানে মণি সিং আছেন, তিনি ফেরারি, তাঁর নামে হুলিয়া আছে, ডাকুন তাঁকে। আমি ঘরের

মধ্যে হতে সব শুনছি। আমি স্থির করলাম এদের সামনে উপস্থিত হব। এরা আমাকে কিছুতেই চিনতে পারবে না এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল। ঐরূপ বেশে সাধারণ লোকের পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

এই এলাকা আমাদের সংগঠিত এলাকা হতে অনেক দূরে, এখানে আমাদের কোনো প্রচারও ছিল না। কাজেই দফাদারের সম্মুখে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। আমি দফাদারের সামনে গেলাম। দফাদার আমাকে মোটেই চিনতে পারল না। দফাদার বলল, আপনার নাম। আমি একটি মুসলিম নাম বললাম। দফাদার জিজ্ঞাসা করল, আপনি কী করেন? আমি বললাম, আমিও একজন টিকাদার। বাড়ি জিজ্ঞাসা করল। বাড়িও একটা বলে দিলাম। এই সময়ের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে টিকাদার পত্নীর বক্তব্য। তিনি বাড়ির ভেতর হতে বলতে লাগলেন, দফাদার মিয়া এনে চিনুইন না। এইন হইতান আমার শ্যামগঞ্জের বড়গিরির ভাই, প্রভৃতি। অনর্গল এইসব গল্প বলে যেতে থাকলেন। আমি এই উত্তেজনার মুখে বিস্মিত। কি করে এই গৃহবধূ এইসব তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বলে যেতে পারলেন। কোনো রাজনৈতিক স্পর্শ এখানে নেই। আমি যে গোপনভাবে আছি তাও তিনি জানেন না। দফাদার আমার একটা সই নিয়ে চলে গেল।

... ...

এর পরের ঘটনা ঘটেছে রাণীপুর চিরাখালীতে। পাহাড়ের অতি নিকটে। আসামের গারো পাহাড়ের পাদদেশে রাণীপুরে আমাদের কমরেডরা একটি নতুন গ্রাম তৈরি করেছিল। সারি সারি ঘর, ভলান্টিয়ারদের থাকার বিরাট লম্বা ঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি। গ্রামটি বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা হয়েছিল। উঁচু বাঁশের মাথায় লাল পতাকা উড়ত। এ গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকত। পুলিশ ক্যাম্প থেকে এই গ্রাম বেশি দূরে ছিল না। তবু তারা সহজে এই গ্রাম আক্রমণ করার সাহস পায়নি। একদিন কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামের দিকে আসছিল। এটা দেখে জনা বিশ ভলান্টিয়ার তাদের প্রতিরোধ করার জন্য খোলা মাঠে এগিয়ে গেল। অপর আরেকটি দল অন্যদিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হল। খোলা মাঠ পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ অনবরত গুলি চালাতে লাগল। অপরদিকে ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে মাত্র একটি বন্দুক। কিন্তু ওটার কার্টিজও ফুটল না। অপর দলও গুলি করতে পারল না। ফলে আমাদের সাতজন কমরেড—দুবরাজ, অনন্ত, ক্ষিরোদ প্রমুখ এখানেই শহীদ হলেন। গুরুতর আহত হলেন দুজন। আমরা পূর্বেই দুজন এম.বি. ডাক্তারকে ক্যাম্পে এনে রেখেছিলাম। ওষুধপত্র সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। এঁরা আমাদের কমরেডদের ইনজেকশান দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। মোটের ওপর আমাদের মেডিক্যাল স্কোয়াডও ছিল। আহতদের মধ্যে একজনকে রাণীপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হল। অপরজনকে পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিভৃত ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি রাণীপুর হতে মাইল দুয়েক দূরে নিরাপদ ক্যাম্পে ছিলাম। আমাকে এসে ঘটনার খবর দেওয়া হল। তখনই যাব বলে খবর পাঠালাম। এইরূপ মর্মান্তিক খবর পেয়ে আমি খুবই চঞ্চল ও মর্মাহত হলাম। আমাকে কয়েকজন পথ দেখিয়ে নিয়ে

চলল। আমি মনে মনে ভাবলাম, যাঁরা আজ স্বামীহারা হয়েছে তাঁদের কী সান্ত্বনা দিব, যাঁরা আজ পুত্রহারা হয়েছে, তাঁদের অশ্রু থামাবার বা কী করব! আমি কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। ভাবলাম, এতক্ষণ কান্নাকাটি নিশ্চয়ই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু যখন গ্রামের কাছে উপস্থিত হলাম তখন কোনো শব্দ শুনলাম না; মনে করলাম, এঁরা সকলে নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানে চিরাখালীতে চলে গিয়েছে। যে ভলান্টিয়ারটি পাহারা দিচ্ছিল সে আমাকে হাসপাতালের দিকে যেতে বলল। সেখানে একজন গুরুতর আহতকে রাখা হয়েছে। আমি সেখানে গেলাম। ডাক্তাররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বললেন, 'আজ রাত হয়ে যাচ্ছে, এই কমরেডকে এখন এখান থেকে সরানো যাবে না।" কিন্তু এই গ্রামটি আজ রাতে পুলিশ আক্রমণ করতে পারে—এটা আমরা আশঙ্কা করছি। আমি ভলান্টিয়ারদের বললাম, "যাঁদের স্বামী মারা গিয়েছে তাঁদের কাছে আমাকে নিয়ে চলো।" ঐসব স্বামী-হারাদের সাথে দেখা করার জন্য তখনই রওনা হলাম। কিছুদূর যেতেই একজনের সাথে দেখা হল। আমি আশ্চর্য হলাম যে সে কাঁদছে না। মুখ গম্ভীর। আমি তাঁকে কয়েকটি কথা বললাম, সে কোনো কথা বলল না। সামনে কতকগুলো বল্লম ছিল, সেদিকে তাকিয়ে রইল। তাঁদের ভাব এই—রক্তের অবশ্য বদলা নিব। শত্রুদের কঠিন আঘাত হানতে হবে। একটু পরে দেখলাম তাঁর চক্ষু হতে জল ঝরে পড়ছে। যাদের কাছে গিয়েছি কেউই উচ্চস্বরে কাঁদেনি। একজন মাকে দেখলাম—ঘুন ঘুন করে কাঁদছে। এদের ধৈর্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আজও মারা যায়নি। যদি মরত তবে আমি সেই অবস্থায় কী করতাম জানি না। এইসব নিরক্ষর মেয়েরা আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিল। আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত আছি—এই স্পর্ধা এই নিরক্ষর মেয়েদের সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের কাছে খান খান হয়ে গেল। কতভাবে এঁরা প্রস্তুত রয়েছে—এটাই ছিল অনুধাবনের বিষয়। সংগ্রামের পূর্বে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প প্রচার করেছিলাম যে, আমাদের অনেকের মৃত্যু হতে পারে, আমাদের ঘরবাড়ি ভাঙা হতে পারে, কিন্তু আমরা সংগ্রামে অটল থাকব। যতদিন পর্যন্ত টংক ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ না হয়, সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।

এই ঘটনার পর সব ভলান্টিয়ারকে ডেকে মিটিং করলাম। আমার বক্তব্য ছিল, আমাদের কৌশলের ভুল হচ্ছে। আমরা গেরিলা কায়দায় না গিয়ে ফাঁকা মাঠে লড়তে গিয়েছি। কাজেই আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। আমরা শহীদের নামে শপথ করছি—"তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। পিছু হটব না।" পরে নেতাদের ডেকে মিটিং করলাম—এখন করা কী? সকলের ধারণা—এই রাণীপুর গ্রাম আজ রাতেই পুলিশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁদের আমরা ঠেকাতে পারব না। গ্রামসুদ্ধ লোক চিরাখালীতে নিরাপদ জায়গায় এখনই সরিয়ে নিতে হবে। প্রশ্ন উঠল, আহতকে সরানো যাবে না, কাজেই কি করা? পরিস্থিতি নাজুক এবং সঙ্কটপূর্ণ। অবশেষে ঠিক করা হল গাছের ওপর পাহারাদার থাকবে। কিন্তু রোগীর কাছে কে থাকবে? এই সময় এক বৃদ্ধ হাজং মহিলা বললেন, "আমি থাকব। আমার তিন কাল গিয়েছে, আমাকে

মেরে ফেলে ফেলুক, আমার মরণে ভয়-ডর নেই।' বৃদ্ধার এই সাহস দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম। সেইভাবে ব্যবস্থা হল। ভলান্টিয়াররা পালাক্রমে পাহারা দেবে। পুলিশ আসতে দেখলে সকলকে সতর্ক করে তাঁরাও সরে পড়বে। শুধু বৃদ্ধা ও আহত থাকবে। সুখের বিষয় পুলিশ সেই রাতে আর গ্রাম আক্রমণ করেনি। পরে পুলিশের আরও শক্তিশালী দল এসে এ গ্রাম আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। ইতোমধ্যে ডাক্তাররা এই আহতের পশ্চাদদিক থেকে গুলি বের করে ফেলেন। সে বেঁচে যায়। পরে সে সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারত। অপর আহত কমরেডরাও সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সিলেটে নানকার আন্দোলন

নানকার প্রথাকে অর্ধদাস প্রথা বা গোলামি প্রথা বললেও অত্যুক্তি হবে না। নানকার প্রজাদের সামান্য জমি ও বসতবাড়ির পরিবর্তে জমিদার বাড়িতে সারা বছর হদ বা বেগার খাটতে হত। এদের জমি বা বাড়িঘরের কোনো স্বত্ব ছিল না। সারাদিন খাটলেও তাদের খাবার বা কোনোরূপ মজুরি দেওয়া হত না। যখন তখন তাদের ডেকে এনে কাজ করানো হত। এদের চাকর এবং খানসামার কাজও করতে হত। তাছাড়া মারপিট, জুতাপেটাসহ অমানুষিক অত্যাচারের অন্ত ছিল না। লোহার শিক পুড়িয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছেঁকা বা দাগ দেওয়া হত।

... ...

রণিকেলী বিদ্রোহ (১৯৩৮-৩৯)

এই আন্দোলনের কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এই আন্দোলন কৃষকসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়। কৃষক নেতা করুণাসিন্ধু রায়ের নেতৃত্বে সিলেট জেলা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর দাবিতে সারা জেলাব্যাপী তখন সভা-সমাবেশ চলছিল। গোলাপগঞ্জ থানার আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ঢাকা-দক্ষিণ বাজার। এই এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে, রণিকেলী গ্রামের নানকার প্রজারা প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। অন্য নানকার বিদ্রোহগুলোর সাথে যেমন কোনো না কোনো স্থানীয় ঘটনা জড়িত ছিল, এই বিদ্রোহ কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এটা ছিল সংগঠিত বিদ্রোহের প্রকাশ। নানকাররা কেউ আর জমিদার বাড়িতে বেগার খাটতে গেলেন না। জমি-বাড়ির ওপর দখল রেখে বসে রইলেন। জমিদাররা কৃষকসভার কর্মীদের খুন করার ষড়যন্ত্র করল, কিন্তু এই সব পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হল। জমিদাররা মন্ত্রী-আমলা-উকিল প্রভৃতির সাথে পরামর্শ করে, নানকারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করল। আসামি খোঁজার নাম করে ব্যাপক লুটপাট-মারধোর শুরু করে দিল। অধিকাংশ নানকারদের অভিযুক্ত করা হল। জমিদার ও সরকারের মিলিত অত্যাচারে রণিকেলী গ্রামের নানকার পাড়াগুলো তছনছ হয়ে গেল। এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হল। জনমতের সাহায্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য কৃষকসভা এক অভিনব পথ

অবলম্বন করল। লাঞ্ছিতা, অপমানিতা নানকার মহিলারা এক দীর্ঘ মিছিল নিয়ে জেলা সদরে উপস্থিত হলেন। মহিলারা সংখ্যায় ছিলেন শদুই। তাঁদের প্রতিজনের হাতে জ্বালানো ছিল লণ্ঠন। লণ্ঠন নিয়ে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করে তাঁরা দিনদুপুরে জেলা প্রশাসকের বাড়ির ফটকে উপস্থিত হলেন। সমগ্র শহরে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। এই অভিনব মিছিল দেখতে সারা শহরের হাজার হাজার মানুষ জেলা প্রশাসকের বাংলোর কাছে জমায়েত হল। মহিলারা বিশাল জনতার কাছে রণিকেলী গ্রামে পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা তুলে ধরলেন। হাতে-পায়ে-মাথায় জখমের চিহ্ন দেখিয়ে সবাইকে অভিভূত করে ফেললেন। এই নির্মম অত্যাচারের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে 'অন্ধ শাসক' বলে উল্লেখ করলেন। এই অন্ধ শাসককে সত্য ঘটনাটা দেখানোর জন্যই এরকম বাতির ব্যবস্থা করেছেন বলে তাঁরা জানালেন। জেলা প্রশাসক এই মিছিলকে এড়াতে পারলেন না। বাংলোর ফটকে এসে মিছিলকারীদের সাথে তাঁকে আলাপ করতে এবং অভিযোগ শুনতে হল। প্রথম সাক্ষাতে মিছিলকারীরা একসাথে বারবার হাতের লণ্ঠন তুলে তাঁকে 'অন্ধ শাসক' বলে সম্বোধন করলেন। আলাপ-আলোচনা চলল। মিছিলকারীরা তাঁদের অভিযোগ বর্ণনা করে তড়িৎগতিতে প্রতিবিধানের দাবি করলেন, জেলা প্রশাসককে সেই প্রতিশ্রুতিই দিতে হয়। মিছিলটি সারা শহরে এবং পথে পথে মানুষের মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করে গ্রামে ফিরে যায়। এই মিছিলের ফল হয় আশাতীত। শুধু সিলেট শহরেই নয়, সারা জেলায় গ্রামে গ্রামে সর্বত্র মিছিলের খবরের সাথে রণিকেলী গ্রামের নানকার প্রজাদের ওপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কাহিনীগুলো অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা জেলায় বিভিন্নভাবে জনমত সৃষ্টি হতে থাকে।

তথ্যসূত্র

কমরেড মণি সিংহের আত্মজীবনী 'জীবন-সংগ্রাম' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ থেকে এই লেখাটি সংকলিত হয়েছে।

জীবন-সংগ্রাম, মণি সিংহ; প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৩

বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

বিশ্বজিৎ ঘোষ

ভারত উপমহাদেশে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব বিপ্লবী যোদ্ধা বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) তাঁদের অন্যতম। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে মাস্টারদা সূর্য সেনের (১৮৯৩-১৯৩৪) নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে যেসব বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, প্রীতিলতা তাতে পালন করেন সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়ে উত্তরসুরীদের কাছে তিনি রেখে গেছেন অতুল সাহস ও গভীর দেশপ্রেমের পরিচয়। একথা বাঙালি হিসেবে আমাদের জন্য পরম গৌরবের যে, বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারই উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামে ভারতের প্রথম নারী শহীদ। এদেশের রাজনীতি-সংস্কৃতি ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম তাই সর্বাগ্রে উচ্চার্য।

২

"বৃটিশ জোরপূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর রক্ত শোষণ করিয়া তাহারা দেশে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের এবং সকল অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। স্বাধীনতা লাভ করার পথে তাহারাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়। যদিও মানুষের জীবন সংহার করা অন্যায়, তবু বাধ্য হইয়া বড় বড় সরকারি কর্মচারীর ও ইংরেজদের জীবন সংহার করিতে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি। মুক্তিপথের যে-কোন বাধা বা অন্তরায় যে-কোনো উপায়ে দূর করার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

... দেশের মুক্তিসংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন

উহা পারিব না? ...নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে, আমার দেশের ভগিনীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সহস্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।"

না, কোন কল্পকাহিনী বা উপন্যাসের সংলাপ নয়, উদ্ধৃতাংশটি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে একটি অভিযানে যাবার পূর্বে একজন বীর বাঙালি নারীর আত্মদানের অঙ্গীকার মাত্র। এই বীর বাঙালি নারীর নামই প্রীতিলতা। ১৯১১ থেকে ১৯৩২—মাত্র একুশ বছরের এক জীবন—অথচ সাহস সংকল্প ও দেশপ্রেমের অঙ্গীকারে ওই ছোট জীবনটাই হয়ে উঠেছে কত বড় জীবনের প্রতিমূর্তি!

চট্টগ্রাম শহরের আসকার দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অতি সাধারণ এক পরিবারে ১৯১২ সালের ৫ মে প্রীতিলতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জনবন্ধু ওয়াদ্দেদার, আর মাতা প্রতিভা ওয়াদ্দেদার। জনবন্ধু চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে হেডক্লার্কের চাকরি করতেন। জগবন্ধু-প্রতিভার চার সন্তান—এক পুত্র, তিন কন্যা, প্রীতিলতা দ্বিতীয় সন্তান। প্রীতিলতার ডাকনাম রানী। পরিবার ও পাড়া-পরশিদের কাছে তিনি 'রানী' নামেই ছিলেন পরিচিতা। প্রীতিলতার গায়ের রঙ ছিল কালো। তাই, মা আদর করে বলতেন, আমার এই কালো মেয়েই একদিন সবার মুখ উজ্জ্বল করবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিলো। শুধু নিজের মুখ নয়, মায়ের মুখ নয়, রানী বা প্রীতিলতা উজ্জ্বল করেছিলেন সমস্ত বাঙালি নারীর মুখ।

প্রীতিলতা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী প্রীতিলতা প্রতি পরীক্ষায় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয়ে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে প্রীতিলতা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল-জীবনেই তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ-সময়েই তিনি আত্মীয়-সম্পর্কের এক বিপ্লবীর মাধ্যমে পেয়ে যান চারটি গোপন বেআইনী বই—'দেশের কথা', 'বাঘা যতীন', 'ক্ষুদিরাম' ও 'কানাই লাল'। এসব বই পড়ে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রীতিলতা আরো আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি বিপ্লবী দলে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন তাঁর বিপ্লবী আত্মীয়ের কাছে। কিন্তু বিপ্লবী দলে কোন মেয়ে সদস্য নেওয়া তখন নিষিদ্ধ ছিলো। তাই প্রীতিলতার আগ্রহ আপাতত চাপা দিয়েই রাখতে হলো।

ম্যাট্রিক পাসের পর প্রীতিলতা আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজে। এ-সময় তিনি থাকতেন কলেজ হোস্টেলে। ঢাকায় অবস্থান কালে প্রীতিলতা বিপ্লবীদের সহযোগী একাধিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এমনি একটি দলের নাম 'শ্রী-সংঘ'। শ্রী-সংঘের মহিলা শাখা 'দীপালি সংঘে'র সঙ্গে প্রীতিলতা গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হন। বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ এবং দীপালি সংঘের কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে প্রতিলতার সেই বিপ্লবী আত্মীয় এবার তাঁকে বিপ্লবী দলের সদস্য করতে

উৎসাহী হলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের নেতা সূর্য সেনের কাছে প্রীতিলতার আগ্রহের কথা জানানো হলো। প্রীতিলতার সব কথা শুনে সূর্য সেন তাঁকে বিপ্লবী দলের সদস্য করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিপ্লবী দলের সদস্য হতে পেরে প্রীতিলতার আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায়। পড়ালেখার চেয়ে এখন দেশের স্বাধীনতার জন্যই তাঁর যত চিন্তা। ইতোমধ্যে আই.এ. পরীক্ষা এসে গেল। প্রীতিলতা আই.এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য তিনি মাসিক বিশ টাকা হারে মেধা-বৃত্তি লাভ করেন। ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত পিতা জগবন্ধু মেয়েকে উচ্চতর পড়ালেখার জন্য কলকাতা পাঠানোর সাহস পেলেন। সিদ্ধান্ত হলো স্নাতক সম্মান পড়ার জন্য প্রীতিলতা কলকাতার বিখ্যাত বেথুন কলেজে ভর্তি হবেন।

১৯২৯ সালে প্রীতিলতা বেথুন কলেজে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতক সম্মান কোর্সে ভর্তি হন। বেথুন কলেজেও তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখেন। প্রথম দিকে ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সব বিষয়েই তিনি সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নের সময়েই সূর্য সেনের নেতৃত্বে সংঘটিত হলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল এবং জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন তাঁর সেই বিপ্লবী আত্মীয়, যাঁকে তিনি দাদা বলে ডাকতেন। দাদার মৃত্যুতে প্রীতিলতা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন, লেখাপড়ায় দেখা দেয় শৈথিল্য। এ-অবস্থায় পড়ালেখার চাইতে তাঁর কাছে দেশের স্বাধীনতাই প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। একই সময় অন্য একটা ঘটনাও প্রীতিলতাকে উন্মনা করে তোলে। চট্টগ্রামের এক বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ফাঁসির হুকুম নিয়ে কলকাতা কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন—একথা প্রীতিলতা তাঁর এক পিসিমার কাছে জানতে পারেন। এরপর বহুবার প্রীতিলতা রামকৃষ্ণের সঙ্গে কারাগারে দেখা করেন। নির্দিষ্ট দিনে তার ফাঁসি হয়ে যায়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুও প্রীতিলতাকে দারুণভাবে ব্যথিত করে। এসব কারণে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন প্রীতিলতা। তাঁর এ-সময়ের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত উদ্ধৃতিত্রয়ে ঃ

ক. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবনীকার পূর্ণেন্দু দস্তিদার লিখেছেন—

> বি.এ. শেষ বর্ষ থেকেই ঘটল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় দাদার শহীদ হওয়ার সংবাদ। তখন থেকে তার লেখাপড়ায় এল শৈথিল্য। এবার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর পর থেকে বি.এ. পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করে ফেলে। সে ভাবতে থাকে, মাতৃভূমির পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন করার জন্য যখন চলছে সশস্ত্র সংগ্রাম, বিপ্লবীরা পাঞ্জা ধরছে মৃত্যুর সঙ্গে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্নাতক উপাধিলাভের কি মূল্য আছে? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনে সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের শতকরা নব্বইজন নরনারীকেই ত মূর্খ রাখা হয়েছে। তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনকে শেষ করার জন্য, এই জঘন্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করার বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনই আজ মুখ্য, পরীক্ষা পাস করা এমন কিছু জরুরী নয়।

খ. কলকাতা কারাগারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার পর প্রীতিলতা তাঁর রোজনামচা-য় লেখেন—

বিপ্লবী দলের জনৈক সহযাত্রী যখন আমাকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার অপরাধে বৃটিশ আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তখন আমি এক নতুন প্রেরণার শিহরণ বোধ করলাম। ...তাঁর ফাঁসীর আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় চল্লিশ বার দেখা হয়েছে। তাঁর সুসংহত দৃষ্টি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, শিশুসুলভ সারল্য, আবেগপূর্ণ অন্তর, গভীর জ্ঞান ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আমি আমার চেয়ে আরও দশগুণ শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তার কাছ থেকে পাই। আমার জীবনাদর্শকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ দেশপ্রেমিকের সাহচর্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণের ফাঁসীর পরেই কোনো বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ জাগে।

রামকৃষ্ণর সমান ওজনের বালির বস্তা নিয়ে ফাঁসি দেবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। মঞ্চও ঠিকঠাক করা হয়। বিজলি বাতি লাগিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করা হয়। তখন বজ্রনিনাদে ঘোষিত হয় রামকৃষ্ণর কণ্ঠ—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম।'
সে কণ্ঠ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় কারাগারের দেয়ালে-দেয়ালে। হাতে হাতকড়া এবং বেড়ি পরানো অবস্থায় কালো কাপড়ের মুখোশ পরিয়ে রামকৃষ্ণকে প্লাটফরমে নিয়ে তোলা হয়। ও 'বন্দে' বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্লাটফরমের লিভার টেনে দেয়া হয়। একই সঙ্গে একটা গুলির শব্দ হয়। রামকৃষ্ণ আর নেই।
রাতের অন্ধকারেই জেলের ভেতর তড়িঘড়ি শবদাহ হয়ে যায়। এরপর থেকে প্রীতিলতা খুব নির্মোহ দৃষ্টিতে ডায়েরি লেখে। আবেগহীন সাদামাটা কথা। কোনো উচ্ছ্বাস না, যেন সৌম্য-শান্ত হয়ে গেছে ওর হৃদয়। মাঝে-মাঝে আনমনা থাকে—উদাস হয়ে যায় দৃষ্টি। কেউ বুঝতে পারে না প্রীতিলতার হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী কোথায় কীভাবে ছিঁড়ে গেছে।...
তখন প্রীতিলতার দু'কান ভরে বেজে ওঠে ট্রেনের ঝিকমিক শব্দ। ট্রেনটা চাঁদপুর পেরিয়ে চলে যায় চট্টগ্রামের দিকে। ও দেখতে পায় একজন মানুষ লাল র‍্যাপার গায়েজড়িয়ে রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছে। কুয়াশায় রোদে মাখামাখি হয়ে যায় ওর শরীর। ধূলিধূসরিত পা—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। মানুষটি চট্টগ্রামে পৌঁছুতে চায়। চট্টগ্রাম ওর প্রিয়—জায়গা—সেখানে পৌঁছুতে পারলে ওর আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু মানুষটির চট্টগ্রামে আর পৌঁছানো হয় না। অস্ত্রধারী লোকেরা ওকে পথ থেকে তুলে নিয়ে আসে—নিয়ে যায় ভিন্ন জায়গায়—পাঠিয়ে দেয় জীবনের অপর পারে। কিন্তু ওর ফেলে যাওয়া কাজটুকু শেষ করতে হবে। তাই প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামে পৌঁছুতেই হবে।

মানসিক এই বিপন্নতায় স্নাতক সম্মান পরীক্ষা না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রীতিলতা। কিন্তু বিপ্লবী দলের সাথী ও বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ইচ্ছারর বিরুদ্ধে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। সকলকে অবাক করে দিয়ে পরীক্ষায় তিনি ডিস্টিংশনসহ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেথুন কলেজে পড়ালেখার সময়েও বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রীতিলতার নিয়মিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিলো। নিষিদ্ধ ও বেআইনি বই তিনি সহপাঠীদের পড়তে দেন, বৃটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পরিচিত ও ঘনিষ্ট মেয়েদের। এ-সময় তিনি বেথুন কলেজে অধ্যায়নরত চট্টগ্রামের চারজন মেয়ে ও অন্য কয়েকজন

ছাত্রীকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন। দলের নাম রাখেন 'চক্র'। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করে দিত এই 'চক্র'। বিপ্লবী সূর্য সেনও বেথুনে প্রীতিলতাদের এই কর্মকাণ্ডের সংবাদ জানতেন। এবার তাই প্রীতিলতার উপর কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হলো। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসার সময় কলকাতার গোপন আস্তানায় তৈরি বোমার খোল নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রীতিলতাকে। বেথুনে চক্রের পাঁচজন সদস্যা ছিলেন চট্টগ্রামের। এঁরা হচ্ছেন—প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল ও কুমুদিনী রক্ষিত। প্রত্যেকে চারটি করে মোট কুড়িটি খোল তাঁরা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে চট্টগ্রাম নিয়ে এসেছিলেন। নারীরাও যে বিপ্লবী দলের সদস্যা হতে পারে, পুলিশ বিভাগ তা ধারণা করতে পারেনি। তাই প্রীতিলতারা নির্বিঘ্নেই বোমার খোলগুলো ট্রাঙ্কে করে চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক অভিযানে এই খোলে-তৈরি বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩

স্নাতক সম্মান ডিগ্রি নিয়ে ঘরের মেয়ে যখন ঘরে ফিরে এলো, জগবন্ধু তখন মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।' ম্যাট্রিক এবং আই.এ. পাসের পরও প্রীতিলতার বিয়ের জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সে-সময়ের মতো এবারও প্রীতিলতা জানিয়ে দিলেন তাঁর অনাগ্রহের কথা। দেশ যাকে ডাকে, বিয়ে দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে কে? প্রীতিলতা কঠিন সংকল্প নিয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করলেন। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে, তাই তিনি নন্দনকানন এলাকায় নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্য-ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিলেন। এই স্কুলেরই বর্তমানে নাম অপর্ণাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। স্কুলের শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গোপনে নারীদের বিপ্লবীকাজে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, উদ্বুদ্ধ করলেন নিজের স্কুলের ছাত্রীদেরও। এ-কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন কল্পনা দত্ত—যিনি বেথুন কলেজ থেকে বদলিপত্র নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন।

৪

বেথুন কলেজ থেকে চট্টগ্রামে ফিরে আসার আগেই ঘটে যায় ঐতিহাসিক সেই ঘটনা—চট্টগ্রামের নতুন পরিচয় হয় বীর চট্টলা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল। রাত দশটা। শুরু হলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল অভিযান। মূল নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন। সেদিন অবিশ্বাস্য কাজ করেছিলেন চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা। সুসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত করে সেদিন তারা যে-কাজ করেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এই অভিযানের পরই সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, মাখন ঘোষাল, হিমাংশু সেন, আনন্দ গুপ্ত, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল যেন, লোকনাথ বল—এসব নাম বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে ওঠে। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিপ্লবীদের সাহসী ভূমিকা বাংলাদেশের নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি

করে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের এই বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সংবাদ বেথুন কলেজেও এসে পৌঁছলো। সঙ্গে পৌঁছলো মাস্টারদা'র হাতে লেখা এক ইশতেহার। ওই ইশতেহার গোপন সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপিয়ে অনেক জায়গায় বিলি করলেন প্রীতিলতা। প্রীতিলতার চিত্তে তখন বিপ্লবের আগুন। ওই আগুন চট্টগ্রামে এসে অনুকূল প্ররিবেশে বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। চট্টগ্রাম শহর তখন বৃটিশের আতঙ্ক। তাই বিপ্লবীদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। এই সময়েই প্রীতিলতা হয়ে উঠলেন বিপ্লবীদের অন্যতম চালিকাশক্তি।

প্রীতিলতার এই বিপ্লবী ভূমিকা সূর্য সেনকেও বিস্মৃত করেছিল। তিনি প্রীতিলতার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হলেন। শহরের নিকটবর্তী ধলঘাটের এক বাড়িতে সূর্য সেন ও নির্মল সেনের সঙ্গে প্রীতিলতার দেখার ব্যবস্থা হলো। নির্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যার পর তিনজনের বৈঠক বসলো পূর্ব-নির্ধারিত বাড়িতে। কিন্তু প্রতিবেশী এক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পুলিশ এসে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। নির্মল সেনের গুলির আঘাতে পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন মারা গেল। নির্মল সেন পরে পুলিশের গুলিতে মারা গেলেও সূর্য সেন ও প্রীতিলতা কোনক্রমে পালিয়ে অন্য এক গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করেন। সেখান থেকে প্রীতিলতা চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে পুনরায় স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে নির্মল সেনের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন। তাই লেখাপড়া বা শিক্ষকতা কোনো কিছুতেই মন নেই তাঁর। দেশের স্বাধীনতার জন্য সূর্য সেনের 'রিপাবলিকান আর্মির পক্ষ হয়ে বৃটিশবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতেই তিনি এখন বেশি উৎসাহী। অল্প কিছুদিনের মধেই প্রীতিলতা পেয়ে গেলেন এমন এক কঠিন অথচ রোমাঞ্চকর দায়িত্ব।

৫

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল অস্ত্রাগার দখলের সময় সূর্য সেনের পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব (বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্লাব) আক্রমণ করে সন্ধ্যায় সমবেত ইংরেজদের হত্যা করা। ওই ক্লাবের দরজায় লেখা ছিল 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ'। সূর্য সেনের বিপ্লবীরা এই ক্লাব আক্রমণ করতে পারে ভেবে তা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে ইংরেজরা পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবকে 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' নাম দিয়ে সেখানেই সমবেত হতে আরম্ভ করে। সূর্য সেন ওই ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ধলঘাটের বাড়িতে গোপন বৈঠকের পর প্রীতিলতার সাহসের পরিচয় পেয়ে, তাঁর উপরই এ দায়িত্ব প্রদান করলেন সূর্য সেন। চট্টগ্রাম শহর থেকে চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে কাট্টলী গ্রামে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ আরম্ভ হলো। কাট্টলীতে এসে সূর্য সেন নিজেই সবকিছু তদারক করতে লাগলেন। দিন তিনেক পর প্রীতিলতাকে আনা হলো কাট্টলীতে। সিদ্ধান্ত হলো ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাত দশটায় অভিযান পরিচালিত হবে। অভিযানের নেতৃত্বে দেবেন প্রীতিলতা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন

আরো পাঁচজন বিপ্লবী। এঁরা হচ্ছেন—শক্তি চক্রবর্তী, কালী দে, প্রফুল্ল দাস, সুশীল দে এবং মহেন্দ্র চৌধুরী।

প্রীতিলতার মনে অপূর্ব উন্মাদনা। সূর্য সেন তাকে পাঠাচ্ছেন কঠিন এক অভিযানে নেতৃত্ব দিতে। দু'দিন পূর্বে দেশবাসীর উদ্দেশে সে তৈরি করে রাখে বিপ্লবী এক আবেদন। মাস্টারদা'কে সেটা দেখায় প্রীতিলতা। আবেদনটা দেখে খুশি হলেন সূর্য সেন। তিনি ঠিক করলেন, ঘটনার পর দিন প্রীতিলতার ছবিসহ তা ছাপিয়ে বিলি করা হবে সারা বাংলায়।

ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের কল্পচোখে প্রীতিলতার সেদিনের চিত্ত-চাঞ্চল্য, সংকল্প ও রোমাঞ্চানুভূতি ধরা দিয়েছে এভাবে—"নির্ধারিত দিন এসে পড়ে। প্রীতিলতার সঙ্গে আছে আরো পাঁচজন বিপ্লবী সাথি। সময় রাত দশটা। খাকি সামরিক পোশাক পরে নেয় প্রীতিলতা। কোমরে চামড়ার কটিবন্ধে গুলিভরা রিভলবার ও চামড়ার খাপে গুর্খা ভোজালি। পায়ে মোজা ও বাদামি রঙের ক্যানভাসের রবার সোল জুতো। মাথার লম্বা চুল সুসংবদ্ধ করে তার ওপর বাঁধা হয়েছে সামরিক কায়দায় পাগড়ি। এখন আর মনেই হয় না যে ও একটি মেয়ে। পোশাক পরা হয়ে গেলে প্রীতিলতা সন্তর্পণে বাকি কাজটুকু শেষ করে। বিপ্লবীদের নিয়ম অনুযায়ী পকেটে ঢোকায় বিশেষ মোড়ক। ধরা পড়ে গেলে দলের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এবং যাতে কোনো অসম্মান না হতে হয় সেজন্য এই স্বেচ্ছামৃত্যুর ব্যবস্থা। সামরিক পোশাকের বাম দিকের বুক পকেটে রাখে রামকৃষ্ণর ছবি—মনে-মনে বলে, তুমি তো আমার সঙ্গেই আছ। যদি তেমন পরিস্থিতি হয় আমি তোমার কাছে পৌঁছে যাব কৃষ্ণ। আমাদের জন্য পরজন্মই ভাল। আর এক জীবনে আমরা মুক্ত স্বাধীন দেশের মানুষ হবো।"

৬

১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রাত দশটায় প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে অনেক ইংরেজ হতাহত হলো, অনেকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলো। মাত্র কয়েক মিনিটের অভিযান। কিছু সময়ের মধ্যেই প্রীতিলতা হুইসেল বাজিয়ে বিপ্লবীদের সমবেত করে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। সকলে যাতে নিরাপদে চলে যেতে পারেন, তাই তিনি থাকলেন সবার পেছনে। বিপ্লবীদের আক্রমণের সময় এক ইংরেজ যুবক ক্লাবের পশ্চিম পাশের নালায় পড়ে আত্মরক্ষা করেছিল। তার সঙ্গে ছিল রিভলবার। বিপ্লবীরা চলে যাবার সময় সে প্রীতিলতাকে দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়লো। রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সামরিক পোশাক পরা বীরকন্যা প্রীতিলতা। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে পকেট থেকে পটাশিয়াম সায়ানাইডের পুড়িয়াটি মুখে পুরে দিলেন। নিথর হয়ে গেল বাংলার এক মহীয়সী বীর নারীর দেহ, বীর চট্টলার সবুজ মাটি আর বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি রক্তিম হলো বাংলার প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের বুকের তাজা রক্তস্রোতে।

৭

পুলিশ এসে প্রীতিলতার নিথর দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল। পোস্টমর্টেমের সময় তারা বুঝতে পারলো এই বিপ্লবী পুরুষ নয়, নারী। প্রীতিলতার দেহ তল্লাসি করে সেদিন যেসব জিনিস পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে—১. মাথার পাগড়ি (পাগড়ি খোলার পর তাঁর দীর্ঘ চুল দেখে পুলিশ হতভম্ব হয়ে যায়), ২. পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবের একটি গ্লাস, ৩. একটি হুইসেল, ৪. প্রীতিলতার ফটোসহ ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেনের সই করা লালরঙের একটি ইশেতেহার এবং ৫. প্রীতিলতার স্বহস্ত-লিখিত একটি বিবৃতি (এই বিবৃতিরই অংশবিশেষ আমরা বর্তমান আলোচনার সূচনাসূত্রে উদ্ধৃত করেছি)।

৮

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাংলার প্রথম নারী শহীদ। বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা চির-উজ্জ্বল। এই বীর নারী মুক্তিসংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করে গেছেন, তা আজকের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য এক অতুল গৌরবের বিষয়। প্রীতিলতার এই মনোভাব আমাদের জন্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, তিনি নিজেকে নারী না ভেবে মানুষ ভেবেছেন। তাঁর অন্তিম বিবৃতিতে এ-সত্যই তিনি প্রকাশ করেছেন। দেশের কাছে, দেশের স্বাধীনতার কাছে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন; নিজের স্বার্থ তাই তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। প্রীতিলতা, প্রকৃত প্রস্তাবেই, বাংলাদেশের সংগ্রামী নারীসমাজের জন্য এক অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র

অজয় রায়, *বীরকন্যা প্রীতিলতা* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৫)
পূর্ণেন্দু দাস্তিদার, *বীর-কন্যা প্রীতিলতা* (ঢাকা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭০)
—*স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম* (ঢাকা : প্রকাশ ভবন, ১৯৬৭)
নরহরি কবিরাজ, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা* (কলকাতা : মনীষা, পঞ্চম সং. ১৯৮৬)
বাংলা একাডেমী, *চরিতাভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)
সুপ্রকাশ রায়, *বিদ্রোহী ভারত* (কলকাতা : বুক ওয়ার্লড, দ্বি. সং. ১৯৯৯)

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনে নারীসমাজের সাহসী ভূমিকা

হেনা দাস

গত শতকের ত্রিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তীব্রতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশের ধারায় গোটা উপমহাদেশে বিশেষভাবে অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য মেহনতি শ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই সারা বাংলার জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষকদের নিজস্ব গণসংগঠন। যদিও বহু আগে থেকেই জমিদারদের মাত্রাহীন জুলুম, অত্যাচার ও সঠিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ঠুর নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও লড়াই সংগ্রামের অনেক ঘটনা ঘটে এসেছে, তবুও ত্রিশের দশকের শেষভাগেই কৃষক সমিতির নেতৃত্বে জমিদারিপ্রথাসহ সকল সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে কৃষকদের ব্যাপক সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়।

চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডব, বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ইংরেজ শাসনের চরম ব্যর্থতা ও দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম যেমন আরও নতুন মাত্রা ও ব্যাপ্তি লাভ করে, তেমনি এই সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় শ্রমিক কৃষকসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের আন্দোলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে এমনি এক পর্যায়ে অবিভক্ত বাংলায় কৃষকদের ঐতিহাসিক সাড়া-জাগানো তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। জমিদারিপ্রথার অধীনে যে বর্গাচাষ বা আধিপ্রথা চালু হয়, তাতে ফসল উৎপাদনের জন্য লাঙ্গল, বীজ, বলদসহ উৎপাদনের সমস্ত খরচ বহন করতে হত চাষিকেই। তারাই পরিশ্রম করে ফসল ফলাত কিন্তু ফসলের অর্ধেক দিয়ে দিতে হত জমিদার, জোতদারকে। তারা পেত বাকি অর্ধেক। এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরে কৃষক সভার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভায়। দাবি হল : (১) ফসলের একভাগ পাবে জমির মালিক, দুইভাগ দিতে হবে ভাগচাষি অর্থাৎ বর্গাদারকে, (২) জমিতে ভাগচাষিদের দখলিস্বত্ব দিতে হবে, (৩) মনকড়া ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ নেই, (৪) ভাগচাষিদের গোলায়

ধান তুলতে হবে। তেভাগার দাবিতে এই আন্দোলন ৪৬-এর ডিসেম্বরে শুরু হয়ে ৪৭ সাল জুড়ে চলতে থাকে। দেখতে দেখতে সারা বাংলায় এই তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং মোট ১৯টি জেলায় তা সবচাইতে জঙ্গিরূপ ধারণ করে। এই ১৯টি জেলার মধ্যে ১০টি হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশের সাবেক জেলা। আন্দোলনের শ্লোগান ছিল— "ইনক্লাব জিন্দাবাদ, নিজ খোলানে ধান তোল, আধির বদলে তেভাগা চাই।"

তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এ আন্দোলনে ব্যাপক নারীসমাজের বীরত্বপূর্ণ জঙ্গি অংশগ্রহণ। শুধু তেভাগা আন্দোলনেই নয় তার পাশাপাশি সমসাময়িক আরও দুটো ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে মৈমনসিংহ অঞ্চলে ধানকড়ারি খাজনাপ্রথা বাতিলের দাবিতে টংক আন্দোলনে এবং সিলেটে মধ্যযুগীয় বর্বর দাসপ্রথার অনুরূপ নান্‌কার প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনেও নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। টংক ও নান্‌কার আন্দোলন অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলন হলেও সারা বাংলার মূল আন্দোলন তেভাগা থেকে এ দুটো আন্দোলনকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। কাজেই তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে টংক ও নান্‌কার আন্দোলনে নারীসমাজ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা অপরিহার্যভাবেই আলোচনায় আসবে। প্রথমে এসব আন্দোলনে নারীর ভূমিকার স্বরূপটি বোঝার জন্য কিছু ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যেসব জেলায় জোতদাররা ভাগ-চাষিদের সাথে প্রায় দাসের মতো ব্যবহার করত এবং শোষণ ও অত্যাচার ছিল সীমাহীন, সেইসব জেলাতেই তেভাগা আন্দোলন সবচাইতে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এর মধ্যে দিনাজপুর জেলার বিশেষভাবে তৎকালীন ঠাকুরগাঁ মহকুমায় এই আন্দোলন সর্বাধিক ব্যাপকতা লাভ করে। এটাই ছিল তেভাগা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। দিনাজপুর জেলার আন্দোলনে কৃষক রমণীদের অভূতপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা লক্ষ করা যায়।

এই জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ মহকুমার আটোয়ারি থানায় ফুলঝরি নামে এক জোতদারের জমিতে প্রথমে তেভাগার ধান কাটা শুরু হয়। স্বেচ্ছাসেবক কৃষকরা লালঝাণ্ডা নিয়ে দল বেঁধে ধান কাটে আর গ্রামের বাকি নারী-পুরুষ থাকে পাহারায়। পরদিনই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গ্রামে এসে ৩২ জন কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং ধান কাটায় বাধা দেয়। এ সময় জমির পাহারার কাজে নিয়োজিত সেখানকার নারী বাহিনীর নেত্রী দীপেশ্বরী সিং লাঠি তুলে পুলিশকে ধাওয়া করলে পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকরাও তার সাথে সাথে এগিয়ে যায় এবং এই সংঘর্ষ প্রতিরোধের মুখে পুলিশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই দীপেশ্বরী সিংয়ের নেতৃত্বেই নারীবাহিনী দুর্ভিক্ষের সময় জোতদারদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে তাদের লুকিয়ে রাখা ধান উদ্ধার করে এবং ন্যায্যদরে গ্রামবাসীর কাছে বিক্রি করে। বিধবা রাজবংশী তরুণী দীপেশ্বরী সিংয়ের বীরত্বের কাহিনী কৃষকদের মাঝে প্রচারিত হলে তাদের মধ্যেও দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এভাবে একজন বীর কৃষক নারী কেবল যে নারীসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন ও তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন তাই নয়, গোটা কৃষক সমাজকেই উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গি গ্রামে পুলিশ ধান কাটা বন্ধ করতে এলে রোহিণী ও জয়মণি—এই দুজন কৃষক রমণীর নেতৃত্বে লাঠিধারী নারী বাহিনী পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বেশ কয়েকটা বন্দুক ভেঙে দেয়।

তেভাগা আন্দোলনের সবচাইতে বেদনাদায়ক বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল দিনাজপুরের খাঁপুর গ্রামে। এখানে একই সময়ে পুলিশের গুলিতে ২২ জন কৃষক শহীদ হন। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন নারীনেত্রী। ৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি আত্মগোপনে থাকা কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য তিন লরি পুলিশ আসে। কৃষক মেয়েরা শাঁখ ও কামার ঘণ্টা বাজিয়ে সারা গ্রামের কৃষকদের সতর্ক করে দেয়। এই সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথে কৃষকরা নেতাদের গ্রেপ্তারের হাত থেকে রক্ষার জন্য গাছ কেটে গর্ত খুঁড়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। পুলিশ ৫ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে ফিরে যাবার সময় ব্যারিকেডের মুখে গাড়িসহ আট্‌কা পড়ে। পুলিশ তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হয়। তাদের চারদিক থেকে হাজার হাজার কৃষক নারী-পুরুষ ঘিরে ফেলে ও কৃষক নেতাদের মুক্তির দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে। সবার সামনে এগিয়ে গেলেন দুই সন্তানের মা যশোদা রাণী সরকার। যশোদার স্বামী তখন মাথায় হুলিয়া নিয়ে আত্মগোপনে। যশোদার সাথে এগিয়ে যায় বিশাল নারীবাহিনী। তারা সমস্বরে নেতাদের ছেড়ে দেবার দাবি জানাতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ঝাঁটা। কিন্তু পুলিশ মুক্তি না দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে থাকে। ঘটনাস্থলেই ১৪ জন মারা যান। পরে গুলিবিদ্ধ আরও ৮ জন হাসপাতালে মারা যান। এই ২২ জন বীর শহীদের মধ্যে বীর নারীনেত্রী যশোদা, কামরাণী ও কৌশল্যা ছিলেন। যশোদার দেহের ওপর দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ট্রাক চালিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরদিন ঠুমনিয়াতে ৪ জন কৃষক হত্যা করার পর কৃষক নেতা ডোমাসিংকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ গ্রামে ঢোকে। তখন মেয়েরা শাঁখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে বিপদ সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেয়। সতর্কধ্বনি শোনার সাথে সাথে শত শত কৃষক ডোমাসিংকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচাতে তার বাড়ির সামনে জড়ো হয়। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুকুরচাঁদ শুধু একটা লাঠি সম্বল করে পুলিশের দিকে ছুটে যান, তার স্ত্রীও পেছনে যান। কিন্তু পুলিশের নিষ্ঠুর গুলিবর্ষণে সুকুরচাঁদ ও তার স্ত্রী সুরমাসিং ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

রাণী শংকাইলে পুলিশ এসে বহু কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ট্রাকে তোলার পর তরুণী কৃষক বধূ ভান্ডানী বর্মনের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রাক ঘিরে ফেলে। পুলিশ মেয়েদের লক্ষ করে অশ্লীল উক্তি করলে ভাণ্ডানী দারোগার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে গামছা দিয়ে হাত বেঁধে ধরে আটকে রাখে। পরে কমিউনিস্ট নেতা ও তেভাগা সংগঠক গুরুদাস তালুকদারের নির্দেশে পুলিশদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন পুলিশের বিশাল বাহিনী গ্রামে এসে প্রচণ্ড মারধর করে নারী পুরুষ সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

৪৭-এর জানুয়ারি মাসে একদিন রাত্রিবেলা দিনাজপুরের চিরিরবন্দর গ্রামে সমিরুদ্দিন নামে এক ক্ষেতমজুরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বোন বাধা দেয়। ভাইয়ের গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে পুলিশ বেয়নেটের খোঁচায় বোনের

পা জখম করে দেয়। সেদিন সমিরুদ্দিনসহ আরো দুজন কৃষককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ, সুন্দরদিঘী, পঞ্চগড় বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুন্দরদিঘীর এক রাজবংশী বিধবা বুড়িমা কৃষক মেয়েদের নিয়ে এক ঐতিহাসিক সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার নাম পুণ্যেশ্বরী দেবী। তিনি জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের মা তথা বুড়ি নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেবীগঞ্জে যখন পুলিশি নির্যাতন ও জোতদারের সন্ত্রাসে কৃষকদের মনোবল প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং পুরুষরা দোদুল্যচিত্ত, তখন বুড়িমাই গাইন হাতে কৃষক মেয়েদের মিছিল নিয়ে "জান দিব তবু ধান দিব না"—এই আওয়াজ তুলে ধান কাটতে শুরু করেন। বুড়িমা গ্রামের মেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে কৃষক কর্মীদের সভা চলাকালে যদি কোনো জোতদারের দালালকে দেখা যেত সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা জায়গামতো খবর পৌঁছে দিত যাতে কৃষক নেতারা লুকিয়ে পড়তে পারে। একদিন বুড়িমা সন্ধ্যোর সময় পাটখড়ি জ্বালিয়ে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল দূরে দুজন চৌকিদারসহ পুলিশ। বুড়িমা চিৎকার করে উঠলেন—'পালা, পালা, পুলিশ আসছে'। চৌকিদার দুজন বুড়িমার মুখ চেপে ধরে। কিন্তু তার আগেই বুড়িমার কাজ হাসিল হয়ে যায়। "মেয়েদের তাড়া খেয়ে পুলিশের পলায়ন, কৃষক মেয়েদের হাতের রামদাই সমস্ত পুলিশের যম"—ইত্যাদি শিরোনামে সংবাদপত্রে সেখানকার তেভাগা আন্দোলনে কৃষক মেয়েদের বীরত্বের কথা প্রকাশিত হয়। ৪৭-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সংবাদে লেখা হল—'সুন্দরদিঘীতে পুলিশের আক্রমণের পাল্টা জবাবে জলপাইগুড়ির কৃষক মেয়েরা ধৃত স্বামী পুত্রের স্থান দখল করিয়া মাঠের ফসল ঘরে আনিলেন। নেতৃত্ব দিলেন কমরেড বিদ্যার স্ত্রী নগরী, খগেন বর্মন ও পোহালুর স্ত্রীরা, যাত্রা ও সুখারুর বৃদ্ধা মায়েরা—সবার আগে বুড়িমা। সেই সাথে ছিলেন জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং তার নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত, শিখা নন্দী, দিদি তিলকতারিণী দেবীর মতো নারীরা।" পুলিশি অত্যাচার যখন চরমে তখন এই বুড়িমার নেতৃত্বে মাকড়ি, উজানী, বিদ্যা প্রমুখ কৃষক নেত্রী আরো মেয়েদের নিয়ে ছাম গাইন হাতে পুলিশের মোকাবেলা করেছে। যে সব জায়গায় তেভাগা কার্যকর হয়েছে সেখানে মেয়েরা উপস্থিত হয়ে ধান ভাগ করা থেকে গোলায় তোলা পর্যন্ত সব কাজই করেছে। ৪৭-এর এপ্রিল মাসে চখাইশেখের গ্রামে জোতদারের ষড়যন্ত্রের ফলে পুলিশের গুলিতে একজন কৃষক মহিলাও শহীদ হন। পঞ্চগড়ে শিখানন্দী, তিলকতারিণী দেবী এরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে হেঁটে গিয়ে নেতাদের খবর পৌঁছে দিতেন। কর্মীদের ভাত রেঁধে খাওয়ানো, লুকিয়ে রাখা, পালাতে সাহায্য করা, পুলিশি তাণ্ডবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করা, ১৪৪ ধারা অমান্য করে লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে সভা মিছিল করা—কোনো কিছুতেই ওরা পিছপা হননি। পুলিশ যখন কৃষক নেতাদের ধরতে এল তখন শিখা নন্দী, তিলকতারিণী দেবী এবং আরো মেয়ে এমন রুখে দাঁড়ায় যে পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মাধব দত্ত নামে এক কৃষক নেতা যখন জোতদারের দালালদের

আক্রমণে আহত হয়েছিল, তখন এই মেয়েরাই সমস্ত শাসানি ও হুমকি সত্ত্বেও তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বোদার পাঁচপীরে। একবার স্বয়ং মহকুমা প্রশাসক জিপে চড়ে পুলিশ নিয়ে গ্রামে ঢুকতে চাইলে কৃষককর্মী লাল্টুর বৌ তার মহিলা বাহিনী নিয়ে পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। ফলে মহকুমা প্রশাসক ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় তেভাগা আন্দোলন তথা কৃষক আন্দোলনের একজন দুর্ধর্ষ নেত্রী ছিলেন সরলাদি। তিনি ছিলেন একজন নমশূদ্র কৃষক রমণী। তার সাহস ও শারীরিক শক্তির কাছে পুরুষেরাও হার মানত। নড়াইলে তেভাগা আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল বাকড়ীগ্রামে। সরলাদি এই এলাকায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ২৫০/৩০০ মেয়েকে নিয়ে একটি জঙ্গি ঝাঁটা বাহিনী গঠন করেন। মেয়েদের হাতের ঝাঁটাই ছিল মূল অস্ত্র। সরলাদির ঝাঁটা বাহিনীর ঝাঁটার মুখে দুই দুইবার পুলিশ বাহিনীকে ক্ষমা চেয়ে সরে পড়তে হয়েছে। সে সময় হাজার হাজার কৃষকের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লাঠি, ঢাল-সড়কি নিয়ে টহল দিত। কৃষক মেয়েরাও গাইন, বঁটি ও ঝাঁটা নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করত। অনেক সময় পুলিশ তাদের ব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। পুলিশ সরলাদিকে গ্রেপ্তারের জন্য বহুবার চেষ্টা করেছে কিন্তু প্রতিবারই তিনি অত্যন্ত চতুর কৌশলে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

নেত্রকোণার সিংহের বাংলা গ্রামে জমির মালিকরা ছিলেন হিন্দু ও ভাগচাষিদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সেখানেও তেভাগা আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল ও কৃষককর্মীদের মারধর করে ভীতির সঞ্চার করছিল। ভাগচাষিদের মেয়েরা গরিব ও পর্দানশিন। রাজবংশী, নমশূদ্র বা হাজং মেয়েদের মতো তারা ঘর থেকে বের হতে পারতেন না এবং পুরুষ নেতাকর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করারও সুযোগ তাদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানেই এমন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল যাতে বোঝা যায় আন্দোলনের ঢেউ অন্তঃপুরের পাঁচিল ভেদ করে পর্দানশিন মুসলিম মেয়েদের হৃদয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল। একদিন দুজন সশস্ত্র পুলিশ খুব দাপাদাপির পর এক গরিব কৃষকের বাড়ির বাইরে এক গাছতলায় বসে বিড়ি টানছিল। এমন সময় ঐ বাড়ি থেকে দুজন মুসলমান যুবতী বধূ দুটি দা হাতে নিয়ে রণমূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে এলেন। তারা সামাজিক রীতি-নীতি ও পর্দার বিধিনিষেধের কথা ভুলে গেলেন। আঞ্চলিক ভাষায় চিৎকার করে বললেন, "বান্দীর পুতরা, আমরার লুকোর মারছস কেন, এই দাও দিয়া তরারে জবো কইরা ফালাইবাম।" যুবতীদের এই আকস্মিক রণমূর্তি দেখে পুলিশ দুজন স্তম্ভিত ও ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে রাইফেল ফেলেই যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তেভাগা আন্দোলন যে ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রায় সব কটি জেলাতেই নারীদের এ ধরনের ব্যাপক অংশগ্রহণ, বীরত্বপূর্ণ লড়াই, নেতৃত্বের ভূমিকা, আত্মদান ও অসাধারণ ত্যাগ তিতিক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। নারীদের এই ভূমিকা ছিল তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য,

যে বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক টংক ও নান্‌কার আন্দোলনেও প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের এই আন্দোলনগুলো ছিল পরস্পরের পরিপূরক। আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। তা হল—এই আন্দোলনগুলো ইংরেজ আমলের শেষ দিকে শুরু হলেও দেশ ত্যাগের পর পূর্বপাকিস্তানের মাটিতে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক জিগির ও কঠোর দমননীতির মধ্যেই তেভাগা, টংক, নান্‌কার আন্দোলন ৪৮, ৪৯ ও ৫০ পর্যন্ত তীব্র জঙ্গি আকার নিয়ে অব্যাহত ছিল।

এবার টংক ও নান্‌কার আন্দোলনে নারীদের সাহসী ভূমিকার কিছু তথ্য তুলে ধরা যাক। মৈমনসিংয়ের টংক আন্দোলনে অসাধারণ বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজং মহিলা রাসমণি। দুঃসাহসী দৃঢ়চেতা এক ভূমিহীন নিঃস্ব কৃষক রমণী ছিলেন রাসমণি। টংক প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে তিনি এক বিশাল নারীবাহিনী সংগঠিত করেন। তিনি জমিদারি শোষণে জর্জরিত হাজং মেয়েদের ওপর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। প্রত্যেকটি লড়াইয়ে রাসমণি থাকতেন সামনের কাতারে। দেশভাগ তথা ইংরেজ শাসন অবসানের অল্প কিছুদিন আগে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কৃষক আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য মরণকামড় দেয়। ব্রিটিশ ইস্টার্ন ফৌজ গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে কৃষকদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়ে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে বর্বর পশুর মতো আক্রমণ চালায় নারী বাহিনীর ওপর। ব্রিটিশ ফৌজ এক হাজং তরুণীর শ্লীলতাহানি করায় উত্তেজিত হাজং নরনারী তীর, ধনুক, বল্লম নিয়ে এগিয়ে যায় সশস্ত্র ফৌজের দিকে। রাসমণি আর সুরেন দুই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ২৫ জন সৈন্যের সাথে মাত্র ৩৫ জন হাজং নারী ও পুরুষের বাহিনী দুঘণ্টা ধরে তীব্র যুদ্ধ চালায়, রাসমণি তার দায়ের আঘাতে দুজন সৈন্যকে হত্যা করেন। কিন্তু সৈন্যদের দশটি বুলেটে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বীরের মতো আত্মদান করেন শহীদ রাসমণি। দেশভাগের পর টংক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন শঙ্খমণি, রেবতী, নীলমণি, পদ্মমণির মতো বীর নারীসহ দেড়শো হাজং নারী-পুরুষ। টংক আন্দোলনে নারীদের আরও অনেক বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনী রয়েছে। চৈতন্য নগরে জমিদারি কাছারি দখল করে কাগজপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তহশিলদার ও পেয়াদাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়, টংক ধান দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার দুদিন পর কালিকাপুরে দুইগাড়ি ধান আটক করা হল। হাজং রমণী মানিক, কলাবতীসহ প্রায় কুড়িজন মহিলা ধানের গাড়ি আটক করে। বিহারি গাড়োয়ান নির্দ্বিধায় মহিলাদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলে দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনায় বোঝা যায় পুরুষ কৃষকদের পাশাপাশি কিভাবে নারী কৃষকেরাও সাহসে, শক্তিতে ও কৌশলে কর্তৃত্বের আসনটি দখল করে নিয়েছিল।

সিলেটে মধ্যযুগীয় নান্‌কার প্রথা তথা একধরনের দাসপ্রথা ছিল তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নিকৃষ্টতম একটি অমানবিক প্রথা। এই প্রথায় নান্‌কার মহিলারা ছিলেন সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত। তাই তাদের মধ্যে জমিদার-বিরোধি ঘৃণা ও ক্ষোভ ছিল খুবই প্রবল। এ কারণেই নান্‌কার মেয়েরা নান্‌কার

আন্দোলনে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তেভাগা ও টংক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান, আদিবাসী সাঁওতাল, রাজবংশী, হাজং, ডালু, গারো, বানাই প্রভৃতি নির্যাতিত কৃষকসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করলেও এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন আদিবাসী উপজাতি ও নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষকরা। নারীসমাজের ভূমিকাতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। অন্যদিকে নান্‌কার আন্দোলন হিন্দ-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হলেও নান্‌কারদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান, অর্থাৎ মুসলমানরাই ছিলেন এ আন্দোলনের মূল শক্তি। তাই নান্‌কার মেয়েদের সাহসী ভূমিকায় মুসলিম মেয়েদেরই উজ্জ্বলমুখ ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। চরম শোষণ, দারিদ্র্য ও জমিদারের নিষ্ঠুর দাসত্ব অনিবার্যভাবে তাদের সামাজিক পর্দাপ্রথাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাই দলে দলে মুসলিম মেয়েরা পায়ে হেঁটে মিছিল করেছেন। পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মিছিল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছেন। শ.হরে বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে বীর নান্‌কার নেত্রী কালইবিবি গ্রাম্যভাষায় অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়েছেন, কালইবিবির নেতৃত্বে নান্‌কার মেয়েরা দা, বঁটি, ঝাঁটা যা আছে তাই দিয়ে পুলিশি আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। নান্‌কার মেয়েদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কিছু ঘটনা এখন উল্লেখ করা হচ্ছে।

একদিন দারোগা সশস্ত্র পুলিশসহ নন্দীরপল গ্রামে এসে প্রত্যেক বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং একটি বাড়ি থেকে নান্‌কার আন্দোলনের অন্যতম নেতা নঈমউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। তখন গ্রামে কোনো পুরুষ ছিল না। নঈমউল্লার গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে নান্‌কার মেয়েরা সবাই মিলে পুলিশকে ধাওয়া করেন। হঠাৎ একজন নান্‌কার রমণী দারোগার জামার কলার ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার ওপর চড়ে বসেন। এরকম আকস্মিক ঘটনায় পুলিশ হতভম্ব হয়ে নঈমউল্লাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়েদের আক্রমণের হাত থেকে দারোগাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যায়। পুলিশের সাথে শুরু হয় নান্‌কার মেয়েদের ধস্তাধস্তি। একজন নান্‌কার মেয়ে পুলিশের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে দারোগার মাথায় আঘাত করেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। কাজেই বেগতিক অবস্থা দেখে পুলিশ কোনোরকমে মেয়েদের হাত থেকে দারোগাকে উদ্ধার করে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। যে নান্‌কার মহিলা পুলিশি হামলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন বীর নেত্রী কালইবিবি। দারোগাকে আক্রমণ করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং এর জন্যও অনেক অত্যাচার ও জুলুম তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি, অসীম সাহস ও সংগ্রামী মনোবলের জন্য তিনি সবার কাছে এক অসাধারণ মহিলা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

একদিন পুলিশ বাহিনী নন্দীরপল গ্রামে এসে নান্‌কারদের বাড়িঘর তছনছ করে। সেদিন নান্‌কার মহিলা তাহমিনা একাই ঝাঁটা হাতে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। ঝাঁটার আঘাতে পুলিশ আহত হয় এবং আহত পুলিশকে

নিয়ে গোটা পুলিশ বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার কারণে পুলিশ তাহমিনাকে পরে গ্রেফতার করে তার ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালায়। তার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়। তাহমিনা কোর্টে দাঁড়িয়ে পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী, বিশেষ করে তার ওপর পুলিশ যে অত্যাচার করেছিল তার বিবরণ বর্ণনা করেন এবং তার কাজকে তিনি ন্যায্য বলে দাবি করেন। আদালতে তার বক্তব্য পেশের পর সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯-এর ১৭ আগস্ট দুই শতাধিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নান্‌কার আন্দোলনের মূলকেন্দ্র লাউতা বাহাদুরপুর আসে। এই এলাকার কৃষক আন্দোলনের লোকজনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের কাছে মুসলিম লীগ কর্মী ও পুলিশের লোক মিথ্যা রিপোর্ট পাঠায় যে কৃষক সমিতি সানেশ্বর এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেছে। সেই অজুহাতেই ১৮ আগস্ট ভোরবেলা কিছুটা অন্ধকার থাকতেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সানেশ্বর গ্রামে আসে এবং প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজা ও বেড়া ভেঙে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে প্রচণ্ড মারধর করতে শুরু করে। মেয়েদের ধর্ষণও করা হয়। পুলিশের এ ধরনের বর্বর অত্যাচারে সানেশ্বর গ্রামের কৃষকরা চিৎকার করতে শুরু করে। চিৎকার শুনে আশেপাশের গ্রামের কৃষকেরা দলে দলে সানেশ্বর গ্রামের দিকে ছুটে যায়। তখন পুলিশ বাহিনী বিশাল জনতার ওপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হয় এবং পরে জেলখানায় আহতদের মধ্যে আরও একজন মারা যায়। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, গ্রেপ্তারকৃতদের প্রচণ্ড মারধর করে। মারধরের ফলে গ্রেপ্তারকৃত তিনজন নারী নেত্রী অপর্ণা পাল, অসিতা পাল ও সুষমা দে আহত হন। অপর্ণা পাল তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মারধর করার ফলে ঘটনাস্থলেই তার গর্ভপাত হয়।

তেভাগা, টংক ও নান্‌কার আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় :

১. ব্যাপকভাবে নারীদের অংশগ্রহণ;
২. নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন (ঝাঁটা বাহিনী, লাঠি বাহিনী, নারী বাহিনী);
৩. পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে নারীদের দৃঢ় প্রতিরোধ লড়াই;
৪. নারীদের পাল্টা আক্রমণে পুলিশ সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত ও পরাজিত, গ্রেপ্তারের হাত থেকে সহকর্মীকে উদ্ধার;
৫. নারীদের নিজস্ব হাতিয়ার—দা, বঁটি, ঝাঁটা, লাঠি প্রভৃতি শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার;
৬. নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নানা কৌশল নির্ধারণ ও কৌশলসমূহের প্রয়োগ, যেমন—শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিয়ে শত্রুর আগমনবার্তা সম্পর্কে সবাইকে সঙ্কেত প্রদান, গোপনে নেতা কর্মীদের পালিয়ে যাওয়া ও লুকিয়ে রাখার কৌশল;
৭. কৃষকদের মাঝ থেকে শক্তিশালী ও সাহসী নারী নেতৃত্বের বিকাশ;
৮. পুরুষের অনুপস্থিতিতে নারীদের ঐক্যবদ্ধ একক ভূমিকা, গ্রেপ্তারের হাত থেকে সহকর্মীকে রক্ষা করা;

৯. নারীদের বীরোচিত আত্মদান;
১০. সামগ্রিকভাবে সংগ্রামী নারীসমাজের অতুলনীয় সাহস, দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য;
১১. নেপথ্যে থেকে কৃষককর্মীদের ভাত রেঁধে খাওয়ানো, পালাতে ও লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করা, অসুখে সেবাযত্ন প্রভৃতি কাজে অসংখ্য নারীর ঝুঁকিপূর্ণ অংশগ্রহণ।

যে কৃষকসমাজ যুগ যুগ ধরে আর্থ-সামাজিক শোষণ নিপীড়ন দারিদ্র্য, ব্যাধি, নিরক্ষরতা, শারীরিক-মানসিক পুষ্টিহীনতায় এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, যে সমাজে কৃষক মেয়েরা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি পশ্চাদপদ ও অসচেতন ছিল, সেই কৃষকসমাজ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কিভাবে তেভাগা, টংক ও নান্‌কার আন্দোলনে বারুদের আগুনের মতো জ্বলে উঠল, কিভাবে এসব আন্দোলনে নারীদের মহাজাগরণ ঘটল তা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

প্রথমত, ত্রিশের দশকের শুরুতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলেও এই সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়ে। এ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ নারীসমাজের চেতনাকেও প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

দ্বিতীয়ত, ত্রিশের দশকের শেষভাগে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে কৃষক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও জমিদারিপ্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক মেয়েদের চেতনা অনেকখানি আলোচিত হয়।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে কৃষক আন্দোলন সম্পৃক্ত হওয়ায় কৃষক রমণীদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতাও সৃষ্টি হয়। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তদানীন্তন সিলেট জেলাভুক্ত মৌলবীবাজার মহকুমার ভানুবিল অঞ্চলের মণিপুরী কৃষকদের আন্দোলন। ত্রিশের দশকে উত্তাল স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় সে এলাকার অত্যাচারী জমিদার ও নায়েবের বিরুদ্ধে মণিপুরী কৃষকদের শক্তিশালী আন্দোলন। সামাজিকভাবে অগ্রসর মণিপুরী কৃষক মেয়েরা এই আন্দোলন সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। জমিদার যখন হাতি দিয়ে প্রজাদের ঘরবাড়ি ভেঙে সব জায়গাজমি নিজ দখলে নিয়ে আসে, তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মণিপুরী প্রজারা। জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতানেত্রীরা সে সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দমনপীড়নের পথ ধরল। স্থানীয় মণিপুরী নেতা বৈকুণ্ঠ শর্মাসহ সব রাজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর মণিপুরী মেয়েরা সেই শূন্যতা পূরণের জন্য এগিয়ে এলেন। বৈকুণ্ঠ শর্মার বীর যুবতী কন্যা লীলাবতী শর্মা তখন নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব সংগ্রামী কৃষকের তিনি হয়ে উঠেছিলেন অবিসংবাদিত নেত্রী।

চতুর্থত, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন বিকাশের সাথে সাথে কমিউনিস্ট নারী নেত্রীদের উদ্যোগে ১৯৪৩-এ সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল নারীদের গণসংগঠন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।' সার্বক্ষণিক কমিউনিস্ট নারী নেত্রী ও কর্মীরা ছড়িয়ে পড়লেন গ্রামেগঞ্জে কৃষক মেয়েদের মাঝে। কৃষক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা নারী আন্দোলনের মন্ত্রে কৃষক মেয়েদের উজ্জীবিত করলেন, তাদেরকে সংগঠিত করলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে। কৃষক মেয়েদের মাঝ থেকে মৈমনসিংয়ের রাসমণি, নড়াইলের সরলাদি, দিনাজপুরের যশোদা রাণী, সিলেটের কালইবিবির মতো অনেকে নিজেরাই নারী নেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে তারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, খাদ্য আন্দোলন, যুদ্ধের বিপদ ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নারী জাতির আত্মরক্ষা, রিলিফ সংগ্রহ, রিলিফ বণ্টন প্রভৃতি কাজে এগিয়ে এলেন।

পঞ্চমত, ৪৬-এ তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত সঠিক সময়ে। দীর্ঘ দিনের অন্যায় শোষণমূলক বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভাগচাষিদের বিক্ষোভ তখন তুঙ্গে। ক্ষেতের পাকা সোনালি ফসল তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তিনভাগের দুইভাগ ফসল তারা নিজের খোলানে তুলবে, তাদের ভাতের অভাব কিছুটা দূর হবে। অন্যদিকে ৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলোর স্মৃতি তখনও তাদের মনে জ্বলজ্বল করছে। ঘরে ধান, চাল বা ভাতের ব্যবস্থা না থাকলে কি জ্বালা সেটা মেয়েরাই সবচাইতে ভালো বুঝতে পারে। সন্তানকে খেতে দিতে না পারার যন্ত্রণা মায়ের চাইতে বেশি আর কে উপলব্ধি করবে। কাজেই তেভাগার ডাকে নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠল পুরুষের পাশাপাশি।

একইভাবে টংক প্রথা ও নান্‌কার প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েরা যারা ছিল সবচাইতে নির্যাতিত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ।

ষষ্ঠত, তেভাগা, টংক ও নান্‌কার আন্দোলনে পুরুষ কমিউনিস্ট নেতাদের পাশাপাশি বহু মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট নারী-নেত্রী গ্রামের কৃষক নারী-পুরুষের সাথে একাত্ম হয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন রাজশাহীর নাচোল এলাকার কৃষকদের কিংবদন্তীতুল্য প্রিয় 'রাণীমা'—বীর নারীনেত্রী ইলা মিত্র। নাচোলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তিনি তার স্বামী রমেন মিত্রের সাথে চলে যান নাচোলে। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সাঁওতালসহ রাজবংশী, শাহাতো, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত ভাগচাষি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তেভাগার দাবিতে তখন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ইলা মিত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হয়ে দাঁড়ালেন ; অসাধারণ মনোবল ও ত্যাগ স্বীকারের দৃঢ়তা নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কৃষকের সাথে মিশে গিয়ে তিনি যেভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তা পুরুষ ভাগচাষিদের যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে তেমনি নারীদেরও প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে। দেশভাগের পর ৪৮-এর মে মাস থেকেই নাচোল এলাকায় শুরু হয় জোতদার-পুলিশের মিলিত উৎপীড়ন। ৪৯-এর শেষ দিকে গোটা এলাকা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কৃষকরা নিজ উদ্যোগে তেভাগার নীতি কার্যকর করতে থাকায়

জোতদার-জমিদাররা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ৫০-এর ৫ জানুয়ারি একদল পুলিশ কেন্দুয়াখেচুয়া গ্রামে এসে কৃষকদের মারধর করতে থাকে। এই খবর পেয়ে চণ্ডীপুর গ্রাম থেকে দলে দলে বিক্ষুব্ধ কৃষকরা তীর, ধনুক, বল্লমে সুসজ্জিত হয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ঐ দিন যে সংঘর্ষ বাঁধে তাতে উত্তেজিত কৃষকদের হাতে ৩ জন পুলিশ মৃত্যুবরণ করে। ইলা মিত্র, রমেন মিত্র এই হত্যার বিরুদ্ধে থাকলেও তাদের ওপর এর দায় চাপানো হয়। হুলিয়া মাথায় নিয়ে ইলা মিত্র দলবলসহ পালাবার চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যান। নাচোল থানা, নবাবগঞ্জ থানা ও পরে রাজশাহী জেলে তাঁর ওপর যে বিরামহীনভাবে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়—তার বিবরণ পরবর্তীকালে জানা যায় কোর্টে ইলা মিত্রের জবানবন্দী থেকে। ইলা মিত্রকে প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে তা কমিয়ে দশ বছরের কারাদণ্ড বহাল রাখা হয়। অত্যাচারে পিষ্ট দেহ নিয়ে তিনি যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন তার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে ৫৪ সালে ভারতে চিকিৎসার জন্য তিনি প্যারোলে মুক্তি পান। ইলা মিত্র বাধ্য হলেন ভারতের নাগরিক হয়ে যেতে। কিন্তু আজও তিনি বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে বিশেষভাবে নাচোল এলাকার কিষান-কিষানীদের কাছে বীর নেত্রী হিসেবে পরম শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে আছেন।

শহর থেকে গ্রামে গিয়ে দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কমিউনিস্ট নারী নেত্রী রাণী দাশগুপ্ত, বীণা গুহ, অলকা মজুমদার প্রমুখ। এ ছাড়া তৎকালীন জলপাইগুড়ির কিছু অংশ, বর্তমান বাংলাদেশভুক্ত পঞ্চগড়, সুন্দরদিঘীতে তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বদানে সহযোগিতা করেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত, শিখা নন্দী, তিলকতারিণী দেবী প্রমুখ।

মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় সারাভারত কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে নারীনেত্রী যুঁইফুল রায় ও জ্যোৎস্না নিয়োগী অন্যান্য নারী নেত্রীদের নিয়ে কৃষক আন্দোলনের এলাকায় গিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক মেয়েদের মাঝে কাজ করেন। দেশ বিভাগের পর সীমান্তবর্তী এলাকা জুড়ে যখন টংক আন্দোলন চলছিল এবং সেই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য পুলিশ বাহিনী গ্রামে গ্রামে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, গুলি, হত্যা, ধর্ষণ চালিয়ে বেপরোয়া তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছিল, তখন জ্যোৎস্না নিয়োগী ঐ এলাকায় থেকে অসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের সাথে কৃষক মেয়েদের মাঝে কাজ চালিয়ে যান। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন শেষ রাতে যখন তিনি হারু চক্রবর্তীসহ শেরপুরের দিকে আসছিলেন তখন তারা দুজনেই পথে গ্রেপ্তার হয়ে যান। ১৯৫৩-তে জ্যোৎস্না নিয়োগী মুক্তি পান।

টংক আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ১৯৫০-এর শুরুতে সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী হাজং এলাকায় গিয়ে টংক আন্দোলনে যোগ দেন সুনামগঞ্জ শহরের কমিউনিস্ট নেত্রী অনিমা সিংহ। তিনি সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর জীবন যাপন করে হাজং মেয়েদের মাঝে কাজ করছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস থাকার পরই সেখানকার মূল কমিউনিস্ট সংগঠক রবিদাস পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর পুলিশি তাণ্ডবের মুখে তিনি সেখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হন।

সিলেটে নান্‌কার আন্দোলন চলাকালে ঐ এলাকায় গিয়ে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন কমিউনিস্ট নারী নেত্রী বিলঙ্গময়ী কর, অপর্ণা পাল, অসিতা পাল, সুষমা দে ও হেনা দাস। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে অপর্ণা পাল, অসিতা পাল ও সুষমা দে প্রচণ্ড পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন এবং আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যান।

এমনিভাবে সারা দেশেই তেভাগা, টংক ও নান্‌কার আন্দোলনের সংগঠিত এলাকায় গিয়ে শহরের কমিউনিস্ট নারীনেত্রীরা কৃষক মেয়েদের সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সবশেষে আর একটি উপাদানের কথা উল্লেখ করছি, যা ঐতিহাসিক এসব আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণকে অনিবার্য করে তুলেছিল। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তীব্র তাগিদ থেকে নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝেই শ্রেণীচেতনা বিকাশের ধারা এ সময় জোরদার হয়। কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট নেতাদের নিঃস্বার্থ সাহসী ভূমিকা, ত্যাগ তিতিক্ষা, লালঝাণ্ডার রাজনৈতিক লক্ষ্য আদর্শ ও কর্মসূচি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃষকদের শ্রেণীচেতনাকে আরও শাণিত করে তুলেছিল। পুরুষদের পাশাপাশি বহু কৃষক রমণী কমিউনিস্ট নারী সদস্যের নাম পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠমণি, দীপেশ্বরী, জয়মণি, রোহিণী, ভান্ডানী, ফুলেশ্বরী, ভূতেশ্বরী, মালো, স্বরাজনন্দিনী প্রমুখ তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী।

তেভাগা আন্দোলন ও সমসাময়িক অন্যান্য কৃষক আন্দোলনে শ্রেণী অবস্থানটি ছিল খুবই স্পষ্ট। একদিকে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থক হিন্দু-মুসলিম শোষক জোতদার জমিদারদের অটুট ঐক্য এবং এই শোষকদের স্বার্থরক্ষায় ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার পুলিশ বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে সংগ্রামী কৃষকের বিরুদ্ধে। আর পাকিস্তান আমলে ভূস্বামীদের স্বার্থের বাহক পাকিস্তান সরকারও একইভাবে জোতদার-জমিদারের পক্ষ নিয়ে কৃষক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য পুলিশ বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছে। অন্যদিকে শোষিত হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী কৃষক, ক্ষেতমজুর, নান্‌কার এরা আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল এক অভূতপূর্ব লৌহদৃঢ় ঐক্য। নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ, আত্মত্যাগ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই ঐক্য লাভ করেছিল পূর্ণতা।

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ দিবসকে কেন্দ্র করে যখন ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ব্রিটিশের বিভেদনীতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে উস্কে দিচ্ছিল, তার ঠিক চার মাসের মধ্যেই শুরু হয়েছিল তেভাগা আন্দোলন। শোষিতের অভিন্ন স্বার্থে এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান কৃষকের যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক অজেয় দুর্গে পরিণত হয়েছিল, হিন্দু-মুসলমান কৃষক নারীদের ঐক্য ছিল এই দুর্গের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

১৯৪৭-এর জানুয়ারি একই দিনে পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন ক্ষেতমজুর সমিরুদ্দিন ও গরিব সাঁওতাল আধিয়ার শিবরাম। সমিরুদ্দিনকে পুলিশ হত্যা করার সাথে সাথে শিবরাম প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে তীর-ধনুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন পুলিশের ওপর। কিন্তু শিবরামও গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহীদ

সমিরুদ্দিন ও শিবরামের মিলিত রক্তস্রোত সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতীক হয়ে হিন্দু-মুসলিম ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের সংগ্রামী ঐক্যকে আরও শাণিত করে তুলেছিল। একই সাথে সমিরুদ্দিনের বোন ও হিন্দু আধিয়ারের বৌ, মেয়ে, বেয়নেটের আঘাতে আহত হয়ে হিন্দু-মুসলিম নারীদের ঐক্যের ভিতকে মজবুত করে তুলেছিল। এই ঐক্য কেবল আনুষ্ঠানিক ঐক্য নয়, এ ছিল প্রাণের সাথে প্রাণের বন্ধন, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মিলন।

১৯৫০-এ টংক প্রথা ও নান্‌কার প্রথা উচ্ছেদের আইন পাসের মাধ্যমে আন্দোলনের তাৎক্ষণিক বিজয় হলেও তেভাগার দাবি তখন আদায় করা যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সাড়া জাগানো তেভাগা আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যাবে না। বরং এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও অবদান সুবিশাল ও বহুমাত্রিক। বাংলার প্রখ্যাত কৃষকনেতা বিনয় কোঙার তেভাগা আন্দোলনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"তাৎক্ষণিক ফলের বিচারে তেভাগা আদায় করা যায়নি কিন্তু কৃষক আন্দোলনের বহতার বিচারে এ আন্দোলন বিফলে যায়নি। ... তেভাগা আদায় হয়নি। কিন্তু কৃষকদের আর পুরনো গোলামির জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়নি।" সর্বভারতীয় কৃষকনেতা মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল 'তেভাগার লড়াই' প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বাংলাদেশের কৃষকসত্তার ইতিহাসে এটাই ছিল তখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন। তার নাম ও ছাপ আজও ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে রয়ে গেছে। এই আন্দোলনের দাবিকে ভিত্তি করে পরে আইন রচনাও করা হয়েছে। এই দাবিতে সংগঠিত এলাকায় ভাগ আদায়ও হয়েছে।" উল্লেখ্য যে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটি আইন পাস হয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনে নারী-পুরুষের চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অবস্থানকে পাল্টে দিয়ে নিজেদের পশ্চাদপদ অবস্থা কাটিয়ে নারীসমাজ কিভাবে সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে এক মহাজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন, এর মূল উৎস কি ছিল সে সম্পর্কে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত নারীনেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, " ... প্রথম সুন্দরদিঘীতে গেলাম বুড়িমা পুণ্যেশ্বরী বর্মণের বাড়ি। দিন কয়েক পরে ফিরে এলাম আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা নিয়ে, পুঁথিপত্রে যার হদিশ মেলেনি। আমাদের রয়েছে শিক্ষাদীক্ষা, বুড়িমারা নিরক্ষরা, আমরা ফর্সা জামা-কাপড় পরি—বুড়িমার সম্বল একটিমাত্র ময়লা ফোতা, আমাদের ঘরে কিছু খাবার-দাবার—বুড়িমাদের একবেলা খাওয়া, তেলশূন্য পেলকা শাক সহযোগে—নিরাভরণ ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা, কাঁচা কুয়ো, নিষ্প্রদীপ রাত্রি। পাঠশালা নেই, ডাক্তার নেই, গ্রামটুকুর বাইরে আরো একটি আলো ঝলমল জায়গা আছে—তার বার্তাও অজানা। কিন্তু এ সব কিছুর উপরে রয়েছে—আশ্চর্য এক প্রাণ, অদ্ভুত দরদে-ভরা এক মন, পার্টির ছেলেদের জন্য ভালোবাসা—যা কর্মীদের হাজারটা বিপদের সময়ে তাদের রক্ষা করেছে, সাহায্য করেছে।"

অভূতপূর্ব নারী জাগরণই তেভাগা সংগ্রামের শক্তির মূল উৎস ছিল—এই সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে চমৎকার ভাবে শ্রদ্ধেয় গোলাম কুদ্দুসের লেখায় (বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তেভাগা সংগ্রাম)। তিনি লিখেছেন—"আমার স্মৃতিতে ভেসে এল পঞ্চাশ বছর আগেকার

এক নিভৃত পল্লীর নিশুতি রাত। শীতের ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কৃষকের জীর্ণ কুটিরকেও মনে হচ্ছে মনোরম। ক্ষুদ্র আঙ্গিনার এক পাশে ক্ষুদ্র একটি ধানের পুঁজ। তার প্রায় গা-ঘেঁষে কঞ্চির বেড়া দেওয়া একচালা ঘরে খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপছি। সামান্য একটু শব্দে উৎকীর্ণ হলাম। উঠে বসলাম। কী অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। ধানের গাদায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তিসম কৃষক রমণী। মাথা তুলে মৃদুস্বরে শুধু বলল, মা-লক্ষ্মী। মা-লক্ষ্মী।

"সেই মুহূর্তে ফেলে আসা অতীত থেকে আমার কানে ভেসে এল, ফসল দাও। ফ্যান দাও। সেই মুহূর্তে পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের লক্ষ লক্ষ মৃত মানুষের হাত যেন ছুঁয়ে গেল ওই ধানের পালা।"

"ভারতীয় শাস্ত্রে নারী আদ্যাশক্তি। তাকে সেই জ্যোৎস্নাময় রজনীতে দেখেছিলাম এবং বুঝেছিলাম তেভাগা সংগ্রামের শক্তির মূল উৎস কোথায়। কৃষক যদি হয় অন্নদাতা, কৃষক-বধূ অন্নপূর্ণা। তার হাতেই ভাতের হাঁড়ি। সে জানে কত ধানে কত চাল। ঘরে ধান-চাল না থাকলে কী হয়। স্বামী মরে, পুত্র কন্যা মরে, নিজেকেও মারতে হয়। কেন যে তেভাগা সংগ্রামে কৃষক নারীরা তাদের পুরুষদের পেছনে ফেলে নিজেরা সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। মশালের মতো জ্বলে উঠেছিল ঠাকুরগাঁও রাজবংশী ভান্ডনী, দীপেশ্বরী খাঁপুরের, শহীদ যশোদা বর্মণী, হাজং বীরাঙ্গনা রাসিমণি, শঙ্খমণি, রেবতী, নড়াইলের দুর্ধর্ষ নেত্রী সরলা এবং তাঁর তিনশ মেয়ের বিখ্যাত 'ঝাঁটা বাহিনী।'

মুসলিম কৃষক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "মুসলিম লীগের প্রভাব কাটিয়ে তারা যে একটু বিলম্বিত লয়ে চলবেন এ তো স্বাভাবিক"। ...তেভাগা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই এই যে যাদের হাতে ভাতের হাঁড়ি, সেই মুসলিম মেয়েরাও কিন্তু একইভাবে সাড়া দিতে শুরু করেছিল।"

একথা আজ দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহ্য, অবদান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আগামী দিনেও শোষিত মানুষের শোষণমুক্তি ও মানবমুক্তির পথকে আলোকিত করবে। আলোচিত করবে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির পথকে, পথের নিশানা দেখাবে মুক্তি পিয়াসী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কৃষক জনতা, মেহনতি মানুষকে। শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে বর্তমান প্রজন্মের অভিযাত্রীদের কাছে আহ্বান জানাই—তেভাগা সংগ্রামের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে এগিয়ে যান।

তথ্যসূত্র

১. জীবন সংগ্রাম, মণি সিংহ
২. সংগ্রাম মুখর দিনগুলি, বারীন দত্ত
৩. বাংলার নারী সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, অদিতি ফাল্গুনী
৪. পশ্চিবঙ্গ, তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪

ইলা মিত্র ও নাচোলের কৃষকবিদ্রোহ

মেসবাহ্ কামাল
ঈশানী চক্রবর্তী

জনগণের আন্দোলন যেমনভাবে তার নেতৃত্বকে তৈরি করে, তেমনিভাবে নেতৃত্বের ভূমিকা নির্ধারণ করে আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতার সোপান। আবার অন্যদিকে সমসাময়িক ইতিহাসের কাঠামো যেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির ভূমিকাকে, তেমনিভাবে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকাও বিকশিত করতে পারে জনগণের আন্দোলনকে, দ্রুততর করতে পারে পরিবর্তনের গতিবেগ। নাচোলের সাঁওতাল ও বাঙালি কৃষকদের মিলিত সংগ্রাম তৈরি করেছে তার নেতৃত্বকে যার পুরোভাগে ছিলেন রমেন্দ্রনাথ মিত্র, ইলা মিত্র, মাতলা মাঝি, শেখ আজাহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী, বৃন্দাবন সাহা প্রমুখ। তেমনি এই নেতৃত্বের এবং তাদের ঊর্ধ্বতন পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকা নির্ধারণ করেছে এই বিদ্রোহের ফলাফল। এদের মধ্যে অনেকানেক কারণ মিলিয়ে বিশেষত ইলা মিত্রের ভূমিকা হয়ে উঠেছিল অনেকটা নির্ধারক—যার প্রতিফলন পাওয়া যায় সাঁওতাল কৃষকের কাছে তার 'রাণী মা' হয়ে ওঠার মধ্যে। নাচেল ও তার পার্শ্ববর্তী থানাগুলোতে তাই আজো শোনা যায় অক্ষয় লোকগীতি—

"লীলা মৈত্রী নারী
আইন করল জারী
আধি জমি তেকুটি ভাগ
জিন হলো সাত আড়িরে ভাই
জিন হলো সাত আড়ি।"

বস্তুত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ আর ইলা মিত্রের নাম এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে ইলা মিত্র হয়ে উঠেছেন ঐ বিদ্রোহের মূর্ত প্রতিনিধি। তাঁর ভূমিকা নিশ্চিতভাবেই অনেকাংশে নির্ধারণ করেছে নাচোলে কৃষক জাগরণের অবয়ব।

খণ্ডিত বাংলার সকল অংশের সচেতন মানুষের কাছে ১৯৫০-এর দশকে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ও ইলা মিত্রের নাম ছিল অত্যন্ত সুপরিচিত। পরবর্তীকালে ব্যাপকতর পরিধির অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিড়ে এবং শ্রেণীজনিত কারণে নাচোলে কৃষক অভ্যুত্থান জনস্মৃতি থেকে প্রায় অপসারিত হলেও ১৯৯৬ সালে সাড়ম্বরে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের ফলে তেভাগা আন্দোলন বিস্মৃত থেকে আপাতত রক্ষা পেয়েছে। তবে ইলা মিত্রের নাম বাংলার সকল অংশের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সক্রিয়তাবাদী এবং উদারনৈতিক চেতনার মানুষের কাছে বরাবরই অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। এদের সকলের কাছে ইলা মিত্র আজো অনুপ্রেরণার অভিন্ন উৎস এবং আদর্শনিষ্ঠার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ এদের অনেকেই, বিশেষত পরবর্তী প্রজন্মের কর্মীরা, আজো জানেন না যে নাচোলে কৃষক প্রতিরোধের চরিত্র কি ছিল অথবা ইলা মিত্রের ভূমিকা কতটা বিস্তৃত।

এই বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিলেন সাঁওতাল কৃষকেরা। তবে তাদের পাশাপাশি রাজবংশী, ওঁরাও, মুড়িয়াল সর্দার, মাহাতো ইত্যাদি অন্যান্য আদিবাসী এবং বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরাও এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। রাজশাহী জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ছিল এই বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক।

নেতৃত্বকারী সাঁওতালদের মধ্য থেকে যে নামটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে হয়, সেটি হল মাতলা মাঝি। এছাড়া অন্যান্য আদিবাসী কর্মীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন মংলা মাঝি, টুটু হেমরম, চিতোর মাঝি, সাগারাম মাঝি, শুক্র মাডাং, চুতার মাঝি, সুখবিলাস বর্মন, ভগিরথ কর্মকার প্রমুখ।

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ ছিল তেভাগা আন্দোনের একটা পরিবর্ধিত অংশ এবং তেভাগা আন্দোলন ছিল ফসলের অর্ধাংশের (নাচোলের ক্ষেত্রে একতৃতীয়াংশের) বদলে দুইতৃতীয়াংশ লাভের জন্য ভাগচাষিদের আন্দোলন। অর্থনীতির পরিভাষায় বলতে গেলে এটা ছিল ভূস্বামীকে দেয় খাজনার পরিমাণ অর্ধাংশ থেকে একতৃতীয়াংশে কমিয়ে আনার জন্য ভাগচাষিদের সংগ্রাম। এ আন্দোলন জমির ওপর কৃষকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছিল না নিঃসন্দেহে, বরং এটা ছিল খাজনা কমানোর একটি অর্থনীতিবাদী আন্দোলন, কিন্তু অন্যান্য অনেক জেলার মতো রাজশাহীর নাচোলে এই আন্দোলন শ্রেণী-সংগ্রামের চরিত্র অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

পটভূমি

নাচোল থানাটি বরাবরই চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাথে যুক্ত এবং ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পূর্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ছিল মালদহ জেলার অন্তর্ভূক্ত। এই চাঁপাইনবাবগঞ্জে কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা প্রথম কখন শুরু হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনোকিছু জানা যায়নি। তবে শেখ আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে ১৯৩০-এর দশকে কমিউনিস্টরা নবাবগঞ্জের কোনো কোনো এলাকায় তৎপর ছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাই স্কুলের শিক্ষক কামার পাড়ার ফনিভূষণ মাস্টার, শিবগঞ্জের অজয় ঘোষ, কৃষ্ণগোবিন্দপুর মাইনর স্কুলের শিক্ষক রামচন্দ্রপুরের রমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ছিলেন এ ব্যাপারে অগ্রণী।

১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাদ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে সামনে নিয়ে কমিউনিস্টরা নাচোল পার্শ্ববর্তী রামচন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ এলাকায় ভালো একটি অবস্থান গড়ে তোলে। নবাবগঞ্জের পার্টি সেক্রেটারি ছিলেন শিবগঞ্জের মানিক ঝাঁও। পার্টির মধ্যে অপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন অজয় ঘোষ। মানিক ঝাঁও এলাকায় অনুপস্থিত থাকলে তার দায়িত্ব তখন অজয় ঘোষই পালন করতেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কর্মী হিসেবে তখন বেরিয়ে এসেছেন শেখ আজাহার হোসেন, পাতানু, নকুল কর্মকার, ওয়াজেদ মোড়ল প্রমুখ। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে সামনে রেখে তারা তখন বিভিন্ন গ্রামে সভা করেছেন, মিছিল করেছেন, এমনকি এক পর্যায়ে তারা প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও তিন-চারশ নারীকে একত্রে মিছিলে শামিল করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য এরপর নারীদের মিছিলে অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ নিয়ে সমাজপতিরা বিরূপ মন্তব্য করতে থাকলে তাদের আর মিছিলে নামানো হয়নি। তবে জমিদারবিরোধী আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে সংস্কৃতির আঞ্চলিক উপাদান হিসেবে গম্ভীরা, আলকাপের গান ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। গায়ক ছিলেন শোয়েব সরকার, ভোলা সরকার, ইয়াসীন সরকার, যতীন কর্মকার, নিতাই কর্মকার, সতীশ ঢোল, শেখ আজাহার প্রমুখ। পার্টির বক্তব্য বা রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে গান লিখে সেগুলো গাওয়া হত।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা রমেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯৪৫ সালে কলকাতায় ইলা মিত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইলা মিত্র ছিলেন পূর্ব থেকেই পার্টির সাথে সম্পর্কিত এবং শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুরে আসার কিছু পরেই তিনি কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ দেন এবং রাজনীতিতেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। সে সময় চড়াগাঙ, তাঁতীপাড়া, শিবগঞ্জ, রামচন্দ্রপুর বেহারাপাড়া, ধুমিহাটপুর, মহারাজপুরসহ আশেপাশের অন্যান্য গ্রাম ও এলাকাগুলোতে জমিদার ও জোতদারদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই সময় জিতেন, নিয়াজ বিশ্বাস, হেফাজ মাস্টার, শোয়েব সরকার প্রমুখ অনেক নতুন কর্মী পার্টির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত হন।

কমিউনিস্ট পার্টি নাচোল এলাকায় তৎপরতা শুরু করে ১৯৩৭-৩৮ সালে। নাচোল সংগঠন গড়ে তোলা ছিল কার্যক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য তাদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফসল। প্রথমে কমিউনিস্টরা নাচোলের সাঁওতালদের আস্থা অর্জন করেন, তারপর মূল আন্দোলন শুরু হয়।

ইলা সেন থেকে ইলা মিত্র : কলকাতা থেকে রামচন্দ্রপুর

ইলা মিত্রের পৈতৃক পদবী ছিল 'সেন'। অর্থাৎ বিবাহ পূর্বকালে তিনি ছিলেন ইলা সেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বেঙ্গলের ডেপুটি এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। তাঁর আদি নিবাস ছিল তদানীন্তন যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার

বাগুটিয়া গ্রামে; তবে কর্মোপলক্ষে জীবনের অধিকাংশ সময়টাই কেটেছে কলকাতায়। ইলা মিত্রের জন্মও সেখানেই, ১৯২৫-এর ১৮ অক্টোবর তারিখে। তাঁর মায়ের নাম ছিল মনোরমা সেন। তিন বোন ও তিন ভাইয়ের মধ্যে ইলাই ছিলেন সবার বড়। তাঁর পড়ালেখার হাতেখড়ি ঘটেছিল সে সময়ের নামকরা মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেথুন স্কুলে। ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে লেটার নিয়ে মেট্রিকুলেশন পাস করেন এবং ১৯৪২-এ একই কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন প্রথম বিভাগে। এর পরে একই কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে বি.এ. অনার্স পাস করেন। এর প্রায় ১৪ বছর পর নির্মম পুলিশি নির্যাতন ও কারাভোগ শেষে কলকাতায় ফিরে অদম্য মনোবলের জোরে ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন ইলা। শৈশবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কৃতি ক্রীড়াবিদ হিসেবে। ১৯৩৬ থেকে ৩৮ পর্যন্ত একটানা তিন বছর তদানীন্তন বাংলা প্রদেশের জুনিয়র এ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন। এ্যাথলেটিক্স ছাড়াও বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেকনিকোয়েট ও সাঁতারেও ছিলেন তিনি পারদর্শী। "ভারতের এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রেকর্ড ভেঙে শীর্ণকায়া কালো বাঙালি মেয়ের হাস্যপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল ছবি তখন কাগজে কাগজে শোভা পেত।" সে সময় এ্যাথলেটিক্সে বাঙালি মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রায় ছিল না বললেই চলে, কিন্তু ব্যতিক্রমী ইলা মিত্র ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের রেকর্ড ভেঙে ১০০ মিটার দৌড়ে সর্বভারতীয় চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জন করেন। এরই সুবাদে ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকেও অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সে বছর অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আজকের দিনে খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণটা সাধারণ ব্যাপার হলেও, সে সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের পদচারণা ছিল নেহাতই সামান্য, হাতে-গোনা কয়েকজনের মাত্র। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় নানাবিধ প্রথা আর সংস্কার-কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে এসে এসব ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন ছিল অদম্য মনোবল আর সাহসের। ইলা সেনের ক্ষেত্রে তার অভাব হয়নি।

পড়াশুনা ও খেলাধুলার পাশাপাশি ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। জানা যায় তিনি ১৯৪১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গীভূত সংগঠন 'গার্লস স্টোরস কমিটি'র কাজে যুক্ত হন। মার্কসবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা এ সময়ই শুরু করেন এবং এভাবেই ধীরে ধীরে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। কেন আকৃষ্ট হন, এর উত্তরে তিনি নিজেই বলেন যে, "কারণ ওরা (কমিউনিস্টরা) সমাজকে পরিবর্তন করতে চায়, অন্যদিকে মানুষের সেবাও করতে চায়। এই দুটো দিকই আমাকে খুব আকৃষ্ট করে।" ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রবল জেয়ার আই.এ ক্লাসের ছাত্রী ইলা সেনের মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ তাঁকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে। বাংলার প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীরা

সেকালে যুক্ত হতেন 'ছাত্র ফেডারেশনে'র সাথে। ইলা সেনও কলেজ জীবনের গোড়াতেই ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন। ১৯৪৩ সালে বেথুন কলেজে বি.এ পড়ার সময়ই ইলা সেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য হন। উল্লেখ্য যে, এই সমিতির জন্ম হয়েছিল একটি বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববর্তী লাইন পরিত্যাগ করে এই বিশ্বযুদ্ধকে 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর জনযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ২২ জুলাই ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে, সে বছরই মেয়েদের মধ্যে পার্টি কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে পার্টির প্রাদেশিক মহিলা ফ্রন্ট গঠিত হয়। অতঃপর মহিলা ফ্রন্ট কর্তৃক সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানাবিধ যুদ্ধাকালীন সংকট থেকে মেয়েদের আত্মরক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীসমাজের মুক্তির প্রশ্নটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য ছিল :

১. দেশ রক্ষা।
২. জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।
৩. দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ও নারীদের মর্যাদার সাথে বাঁচতে সাহায্য করা।
৪. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হওয়া।

কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে শ্রমিক ও কৃষক পরিবারের নির্যাতিত মেয়েদের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তসহ সকল শ্রেণীর মেয়েদেরই সমাবেশ ঘটেছিল। বস্তুত গোড়া থেকেই সমাজের সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক নারীদের একটা 'প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে গড়ে উঠেছিল এই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। কেন্দ্রীয় কোনো সমিতি গড়ে ওঠার আগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, জেলায় গ্রামে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

অতঃপর ১৯৪২'র এপ্রিল মাসে এলা রীডকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে সমিতির একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সকিনা বেগম, রেনু চক্রবর্তী, সুধা রায়, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুননেসা আহমেদ, বিয়াট্রিকা টেরান, অপর্ণা সেন, ফুলরেনু দত্ত প্রমুখ। পরের বছর (১৯৪৩) সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এ ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন নেলী সেনগুপ্তা, জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী, মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আর্যবালা দেবী, রানী মহলানবীশ প্রমুখ খ্যাতনামা মহিলা। অল্প সময়ের মধ্যেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলায় মেয়েদের সর্ববৃহৎ গণ সংগঠনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২২,০০০। পরের বছর তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৩,০০০-এ। ১৯৪৬-৪৭-এ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত সমিতির তৃতীয় সম্মেলনের এই সংখ্যা ৫০,০০০-এ উন্নীত হয়েছিল বলে জানা যায়। অর্থাৎ ৪৭-এ দেশবিভাগের পূর্ববর্তীকালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

সংগঠনটির কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্ব থেকেই এর সাথে ইলা সেনের সংশ্লিষ্টতা ছিল ব্যাপক। ১৯৪৩ সালে প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বিল বা রাও বিলের বিপক্ষে মৌলবাদী ও রক্ষণশীলরা সোচ্চার হয়ে উঠলে নারী অধিকারের বিবেচনা থেকে ঐ বিলের পক্ষে জনমত সংগঠিত করার কাজে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আন্দোলন জোরদার করে এবং ইলা সেন তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। নারীর অধিকার সম্পর্কিত সংশোধনী আইন সম্পর্কে রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় ইলা সেনের জোরালো বক্তব্য রাখার সংবাদ আমরা পাই। '৫০-এর মন্বন্তরের সময়ে বুভুক্ষু জনতাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একদিকে খাদ্য আন্দোলন, ভুখা মিছিল ও লঙ্গরখানা পরিচালনার কাজ করেছে, অন্যদিকে খাদ্যাভাব, কাপড়ের সংকট, মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং বিশেষত নারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে অসহায় মেয়েদের বাঁচাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ইলা সেনও ছিলেন এসব কর্মকাণ্ডের অংশীদার। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "৪৩ সালে মন্বন্তর হল, ৫০ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা গেল। তখন সবাইকে দেখছি না খাওয়া। চাল পাওয়া যাচ্ছিল না, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক মরে পড়ে আছে এই রকম অবস্থা ছিল। আমাদের সব বাড়িতে এসে বলেছে, উনিশ-কুড়ি দিন খাইনি। একটু চাল দিন, একটু ফ্যান দিন। হয়তো ভাত বা ফ্যান দিলাম, এতদিন পেটে কিছু পড়েনি ফলে খাওয়ার সাথে সাথেই মরে গিয়েছে। এর ফলে আমার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালেই। তারা পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুলে খিচুড়ি রান্না করে এসব অভুক্ত লোককে খাওয়াত। আমি তখন কলেজ, খেলাধুলা সব বাদ দিয়ে তাদের সাথে যোগ দিলাম, খিঁচুড়ি রান্না করে খাওয়াতে লাগলাম।" বস্তুত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ইত্যাকার কর্মকাণ্ডে উদ্যোগী ভূমিকা রাখার সুবাদেই ইলা মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির নারী সংগঠকদের দৃষ্টি কাড়েন এবং বিশেষত কমলা মুখ্যোপাধ্যায় ও মনিকুন্তলা সেনের সুপারিশে ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন।

পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টতার সুবাদেই ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট সংগঠক রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর রমেন্দ্রনাথের কাজের সূত্র ধরে ইলা মিত্রকেও চলে আসতে হয় রমেন্দ্রনাথের দেশের বাড়ি রামচন্দ্রপুরে। এভাবে কলকাতা থেকে স্থানান্তরের ফলে কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজকর্মের সাথে তাঁর বিচ্ছিন্নতা আসে; রামচন্দ্রপুরে শুরু হয় জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী, ব্রিটিশ আমলের গ্রাজুয়েট, এ্যাথলেটিক্সে বাংলা চ্যাম্পিয়ন ইলা সেন বিয়ের সুবাদে ইলা মিত্র হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রভাবশালী ভূস্বামী পরিবারের বধূ হয়ে এসে শ্বশুরবাড়ির সামন্ত সংস্কৃতির বেড়াজালে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষায়, "শ্বশ্রুমাতার কাছে নানা আজব কাহিনী শুনে শুনে আমি তখন তাঁদের

পরিবারের বধূ হবার উপযুক্ততা অর্জনের পাঠ নিচ্ছি। কোনো এককালে তিনি একবার স্টিমারে কোম্পানির বাষ্পীয় জলযানে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। তার ফলে তল্লাট জুড়ে রটে গেল জমিদার গিন্নিদের বদন দেখা যায় না কথাটা ফাঁকা—কারণ তাদের অনেকেই স্টীমারে সেই মুখ দেখে ফেলেছেন। আমার জ্যেষ্ঠ ক্ষোভ ও উষ্মায় টং হয়ে গেলেন। তিনি আদেশ জারি করলেন আর কোনো দিন ঘরের বউ যেন সাধারণ মানুষের পাইকারি যাতায়াতের স্টিমারে না ওঠে। তারপর যতবার শাশুড়ি ঠাকুরাণী বাপের বাড়ি গেছেন তাঁকে নৌকায় যেতে হয়েছে। তাতেও একটা বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। জলের ঢেউয়ে নৌকার দোলায় ভারি ভয় লাগে। সে জন্যেই হুকুম ছিল নৌকা হাঁটু জলে চালাতে হবে এবং নৌকার আগে আগে বাড়ির একজন জোয়ান পাহারাদার হেঁটে হেঁটে বউকে অভয় দেবে। এখানে এমন জল নেই যে মানুষ ডুবে মরতে পারে।"

এই অবরুদ্ধ অবস্থার আরেকটি চিত্র পাওয়া যায় 'সাপ্তাহিক দেশবার্তায়' প্রকাশিত তার একটি সাক্ষাৎকার থেকে। সেখানে তিনি বলেছেন : "এমনকি আমার শাশুড়ি ... গঙ্গাস্নানে যেতেন পাল্‌কি চড়ে এবং সেই পাল্‌কিই গঙ্গায় ডুবিয়ে তাকে স্নান করানো হত। গঙ্গায় নামার তার কোনো সুযোগ ছিল না। বাড়ির পুরুষ আত্মীয়স্বজন এবং চাকর-বাকরদের সাথে কথা বলাও বারণ ছিল।" কিন্তু শ্বশুরবাড়ির এই অবরোধকে ইলা মিত্র ভাঙতে প্রত্যয়ী হন রাজনীতির তাগিদ থেকে। অবশ্য স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণাও তাঁকে একাজে সাহায্য করেছে।

তিনি রামচন্দ্রপুরে আসার কিছুকালের মধ্যেই রমেন মিত্রের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও আলাপচারিতা শুরু করেন রাজনীতিক সূত্রেই। তবে শাশুড়ির নজর এড়ানোর জন্য প্রথম পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় সীমিতভাবে কাজকর্ম করার। সেজন্য খুব সীমিত সংখ্যক সংগঠকের সাথেই তিনি তখন কথাবার্তা বলতেন। নিয়াজ বিশ্বাস আমাদের জানিয়েছেন যে রমেন্দ্রনাথের ছাত্র ও পড়শি হিসেবে তাদের পরিবারে নিয়াজ বিশ্বাসের প্রবেশাধিকার ছিল এবং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইলা তার সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক আলোচনার মাঝখানে কখনো শাশুড়ি-ঠাকুরণ এসে পড়লে তারা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাতেন। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিভেদ তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না আর শ্রেণী প্রশ্নকে তিনি ইতোমধ্যেই অতিক্রম করে এসেছিলেন। যে কারণে গ্রামের সব মেয়েদের সাথেই তিনি সমানভাবে মিশতে পারতেন। মেয়েদের নিয়ে যদিও অন্তত প্রথম পর্যায়ে মিটিং তিনি করেননি, তবে জানা যায় তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই মেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরত এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা হত। এ জাতীয় মেলামেশার মধ্যে দিয়ে, টুক্‌রো টুক্‌রো কথা এবং অবিন্যস্ত আলোচনা থেকেই তারা নতুন এক জগতের সন্ধান পেতে শুরু করেছিল।

কমিউনিস্ট সংগঠক ওয়াজেদ আলী মন্ডলের ছেলে হেফাজ উদ্দিন মাস্টার তার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, ইলা মিত্র অত্যন্ত মিশুক ছিলেন এবং তিনি রামচন্দ্রপুরে আসার সাথে সাথে এলাকায় একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তার ভাষায় : "উনি ছিলেন

হিন্দু আর আমরা ছিলাম মুসলমান। কিন্তু উনার সাথে যখন মিশতাম, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা ব্যবধান, ঐ ব্যবধানটা উনি বুঝতে দিতেন না।" এ বিষয়ে তিনি তার আর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। ঐ সময় তার ভাইয়ের ছেলে জামালের (যিনি পরে রাজশাহী বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছিলেন) জন্ম হলে ইলা মিত্র আঁতুর ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। হিন্দু ঘরের মেয়ে মুসলমানের আঁতুর ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে কোলে নেয়া—সে সময় এ ছিল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হেফাজ মাস্টারের ভাষায়, "এমন কে বেকুব লোক আছে যে তাঁকে ভালো না বেসে পারে?" এভাবে তার ব্যবহার দিয়ে ইলা মিত্র সে সময় গ্রামের সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। ফলে, পরে রাজনীতির প্রয়োজনে যখন স্থানে স্থানে ঘুরতে হয়েছে তখন যাতায়াতের খরচ বা 'কোথায় খাবে' এমন চিন্তা ইলা মিত্র বা রমেন্দ্রনাথকে কখনো করতে হয়নি। যেখানেই গিয়েছেন গ্রামের মানুষ তাদের যা আছে তাই তাদেরকে খাইয়েছেন নির্দ্বিধায়, এবং যে গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে গেছেন, সে হয়তোবা পয়সা নেয়নি অথবা স্থানীয় সংগঠকরা সে খরচ বহন করেছে।

যাহোক, জানা যায় ১৯৪৬ সালে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জেলায়, কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তখন দাঙ্গা প্রতিরোধের জোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট সংগঠকদের অনেকেই নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম হাসনাবাদে যেয়ে সেখানে সেবা ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নেন। শ্বশুরবাড়ির বিধি ও নিষেধ এড়িয়ে ইলা মিত্রও হাসনাবাদে যান। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করেন। এই '৪৬-এই সারা বাংলা জুড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ। মালদহ জেলার একাংশে এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তাছাড়া জেলার সর্বত্রই জমিদারি উচ্ছেদ ও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন চলছিল পূর্ব থেকেই। মালদহ জেলা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের কাছ থেকে সংগ্রামী কৃষকদের আন্দোলনের বিবরণ শুনতে শুনতে, এক সময়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ইলা মিত্র ক্রমশই একাত্মা হতে থাকেন এসব আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের সাথে। বিত্তশালী হিন্দু পরিবারের চিরায়ত রক্ষণশীলতার বিধি নিষেধ অতিক্রম করে ক্রমেই বেরিয়ে আসতে থাকেন সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠক রূপে।

ইলা মিত্রের ব্যক্তি জীবনের এই ধারা বদলের পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে চলছিল রূপান্তরের পর্ব; যার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ১৯৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ করল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। সে সময় অনেক হিন্দু পরিবার দেশত্যাগ করলেও রমেন্দ্রনাথেরা পুরো পরিবারসহ রয়ে গেলেন রামচন্দ্রপুরেই। নতুন রাষ্ট্রের নতুন কিছু একটা করার তাগিদ যখন ইলা মিত্র অন্তর থেকে অনুভব করছেন সে সময় গ্রামের সকলে মিলে দাবি জানাল তাদের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ভার বৌঠানকে নিতে হবে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম কৃষ্ণগোবিন্দপুরের জমিদার পরিবারের আলতাফ মিয়ার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানেই একটা ঘরের ব্যবস্থা করে মেয়েদের স্কুল খোলা হল। মাত্র

তিন জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হল নতুন স্কুল, ইলা মিত্র তার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। পরিবার থেকে স্কুল পরিচালনা ও পড়াবার অনুমতি দেয়া হলেও, বাড়ি থেকে স্কুল পর্যন্ত হাঁটা পথে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্বের এই পথটুকু তাকে যাতায়াত করতে হত গরুর গাড়িতে। তারপরেও জানা যায় বাড়ির বৌ-এর ইজ্জত চলে গেল এই মানসিক চাপে স্কুলে যাবার প্রথম দিনটিতে তার শাশুড়ি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এরও প্রায় তিন মাস পরে পায়ে হেঁটে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা উন্নীত হয়েছিল পঞ্চাশে।

মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার এই কাজে পরিবারিক বাধার চেয়েও তাঁকে আরো অনেক বেশি করে মুখোমুখি হতে হয়েছিল সামাজিক বাধার। বিশেষত মুসলিম মেয়েরা ঘরের বাইরে যেয়ে শিক্ষা নিচ্ছে, রক্ষণশীল উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজ এটা সহজে মেনে নিতে পারেনি। নারী শিক্ষার সূত্রে মেয়েদের বেপর্দা করা হচ্ছে, ভঙ্গ করা হচ্ছে শরিয়তি আইন। এই অভিযোগ আনা হতে লাগল ইলা মিত্র এবং তার পরিচালিত স্কুলের বিরুদ্ধে। অভিযোগের হোতা ছিলেন মূলত জমিদার, জোতদার ভূস্বামী ও ধর্মীয় নেতাসহ সম্পত্তিবান উচ্চ কোটির লোকেরা। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী শিক্ষা বন্ধের এই পাঁয়তারায় গরিব কৃষক, নিম্নবিত্ত মুসলমানেরা' কিন্তু তেমন আলোড়িত হননি। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা ইতোমধ্যেই বুঝতে শুরু করেছেন; কেননা তারা নিজেরা নিরক্ষর বলে জোতদার, জমিদাররা অন্যায়ভাবে তাদের ঠকিয়ে জমিজমা বা প্রাপ্য ঋণের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে টিপসই নিয়ে নিত। এ জাতীয় ঘটনা সে সময় প্রায়শই ঘটত; সুতরাং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা তারা নিজেরা অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। গোটা ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে তাই ধনী ও গরিবের শ্রেণীস্বার্থের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল। যা হোক, দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাত তীব্র হয়ে উঠলে তা নিষ্পত্তির স্বার্থে সে সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গণজমায়েতের আকারে বেশ কয়েকটি বিশাল বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরকম একটি সভায় নারী শিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখে ওয়াজেদ মোড়ল বলেছিলেন—"মেয়েরা লেখাপড়ার জন্য স্কুলে এলেই বুঝি শরিয়ত বিরোধী কাজ হয়? আর জোতদারের বাড়িতে কাজ করলে বেপর্দা হয় না? ধনীরা যখন মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে তখন শরিয়ত বিরোধী কাজ হয় না? প্রত্যেক ধনী বাড়িতে মেয়েরা যে বাদীগিরি করতে বাধ্য হচ্ছে তাতে শরিয়ত নষ্ট হচ্ছে না? দূর-দূরান্ত থেকে তারা যখন ধনীদের পরিবারগুলোর জন্য পানি বয়ে আনে তাতে ধর্ম যায় না অথচ পেটের দায়ে, পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তারা যখন লেখাপড়া শিখতে যায় তখনই ধর্ম যায়।" এ জাতীয় বক্তব্য প্রতিক্রিয়াশীলদের শিবিরে শক্ত আঘাত হানে, তখন গরিব গ্রামবাসীরা কমিউনিস্ট কর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিকল্প যুক্তিতে আক্রমণ চালায়। তারা বলে শরিয়তে সুদ খাওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও ধনী জোতদার মহাজনেরা সুদ খাচ্ছে, অথচ তাতে জাত যাচ্ছে না, জাত যাচ্ছে মেয়েরা পড়ালেখা শিখলে। সুদবিরোধী এই বক্তব্য ধর্মীয় নেতাসহ সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এবং তারা তাদের পক্ষে এসে দাঁড়ায়। এভাবে ইলা মিত্রের উদ্যোগে

গ্রামে যে নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে ধনী-গরিবের দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে, বিত্তবানদের মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে এবং সাধারণ মানুষও তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি অর্জন করতে থাকে। এ কথা উল্লেখ্য যে, স্থানান্তর ঘটলেও মেয়েদের এই স্কুলটি আজও বিদ্যমান এবং এখন এটি হাইস্কুল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

স্কুল শিক্ষকতার পাশাপাশি ইলা মিত্র রাজনীতিতে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন প্রত্যক্ষভাবে। দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠকে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও তিনি ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। এই পর্বে তার সাহসিকতার বহু বিবরণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, যা আজো উপকথা হয়ে জনশ্রুতিতে বেঁচে আছে। এরকম একটি ঘটনার কথা নিয়াজ বিশ্বাস তার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির কোনো একজন সংগঠক রমেন-ইলাদের বাড়িতে আত্মগোপনাবস্থায় ছিলেন। কিন্তু পার্টির স্থানীয় কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি জড়িয়ে যান, ফলে পুলিশের কানে খবর পৌঁছায়। রাত প্রায় ১২/১টার দিকে জনা পঁচিশেক পুলিশ এসে ঘেরাও করে রমেন-ইলাদের বাড়ি। কিন্তু জানা যায়, ইলা মিত্র ভোর না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির ভিতরে তাদের ঢুকতে দেননি। বাধ্য হয়ে পুলিশ ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করে। ইলা অবশ্য তাঁকে তাঁর ভাই পরিচয় দিয়ে গ্রেপ্তার এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকায় তা ব্যর্থ হয়।

ইলা মিত্রের সাহসিকতার আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায় হেফাজ মাস্টার ও নিয়াজ বিশ্বাসের মুখে। তাঁর আত্মরক্ষার একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ কর্মীই আন্ডারগ্রাউন্ডে, কমিউনিস্ট পার্টিও নিষিদ্ধ ঘোষিত। ইলা মিত্রের রাজনৈতিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের নজর পড়ে তাঁর ওপর। 'ইনফরমেশনে'র ভিত্তিতে পুলিশ একদিন ইলা মিত্রদের বাড়ি ঘেরাও করে, তাকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে। ইলা মিত্র তখন বাড়িতে ছিলেন ঠিকই; ফলে গ্রেপ্তার প্রায় অবধারিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে ইলা মিত্র সদ্যপ্রসূতি বড় বৌদির আঁতুর ঘরে আশ্রয় নেন। পুলিশ যখন বাড়ির অপরাংশে তল্লাশি করছে, তখন তিনি তার এক ভাগনীকে দ্রুত কুয়ায় জল তোলার বালতি নামাতে ইশারা করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁদের বাড়ির উঠানে অবস্থিত ছিল কুয়াটি। পুলিশ আঁতুর ঘরের দিকে আসার আগেই তিনি পানি তোলার ঐ বালতিতে করে কুয়ার ভিতরে নেমে আত্মগোপন করেন। পুলিশ গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও ইলা মিত্রের হদিস না পেয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন ভেবে রামচন্দ্রপুর হাটের দিকে চলে যায় খুঁজতে। এই ফাঁকে কুয়া থেকে উঠে, দ্রুত পুরনো কাপড় পরে, সাধারণ মেয়ের বেশ ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পুলিশ হাট থেকে আবারো বাড়িতে ফিরে আসে, ইলা মিত্র বাড়িতেই আছে এরকম খবরের ভিত্তিতে। কিন্তু হতাশ হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয় আবারও। তার এই আত্মরক্ষার ঘটনাটির কথা স্মরণ করে হেফাজ আলী মাস্টার বলেন, "এভাবে আত্মরক্ষা কোনো মেয়ে কেন, পুরুষের পক্ষেও ছিল দুঃসাধ্য।"

এভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ইলা মিত্রের যুক্ততা ক্রমেই যখন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, এমন একটি সময়ে ১৯৪৮-র মে 'ডে' প্রোগ্রামের প্রাক্কালে একদিন পুলিশ রমেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে তাদের রামচন্দ্রপুর হাটের বাড়ি ঘেরাও করে। এই পুলিশদের মধ্যে থেকেই একজন ইলা মিত্রকে আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয় বলে জানায়। এর পরপরই ইলা মিত্র নাচোলে চলে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৪৭-এ দেশ ভাগের পরপর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের ওপর পুলিশ ও প্রশাসনের মাত্রাতিরিক্ত বাধারোপ ও বিবর্তনমূলক নীতি গ্রহণের ফলে কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রকাশ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে পাতানু, নকুল কর্মকার, ওয়াজেদ মোড়ল প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে যান; আরো অনেকে বাধ্য হয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে। রমেন্দ্রনাথ মিত্রও এসময় রামচন্দ্রপুর থেকে নাচোলে গিয়ে আত্মগোপন করে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। প্রথমে রমেন মিত্র এবং তারপরে ইলা মিত্রের প্রস্থানের ফলে রামচন্দ্রপুর, কৃষ্ণগোবিন্দপুর, ধুমিহাটপাড়া, লাল পাড়াসহ আশেপাশের গ্রামগুলোর পার্টি কর্মীদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি আসে। নিয়াজ বিশ্বাস তার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি এবং অন্যান্য কেউ কেউ আত্মগোপনে যেতে রাজি হননি; তবে একাংশ নাচোলে আত্মগোপন করে কাজ করতে পিছপা হননি। এদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন—আজাহার হোসেন, আতাউর রহমান, শহীদ বিশ্বাস, অজয় ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া রমেন মিত্র তো ছিলেনই, পরে তাদের সাথে যুক্ত হলেন ইলা মিত্রও।

সংগঠন ও আন্দোলনের বিকাশ

দেশবিভাগের পূর্ববর্তীকালেই নাচোল থানার অধিকাংশ এলাকাতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তবে মূল এলাকাগুলো ছিল চন্ডীপুর, কৃষ্টপুর, কেন্দুয়া, ঘাসুড়া, শিবনগর, মান্দা, গোলাপাড়া, মল্লিকপুর, কালুপুর ও মহীপুর। মূল আন্দোলনে যাবার আগে প্রচার-আন্দোলনের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন। সুপরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইজারাদারদের বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করা হয়েছিলো এবং পরবর্তী ভাগে তোলা হয়েছিল তেভাগার দাবি। এ ব্যাপারে ত্রিশ দশকের গোড়ার দিক থেকে কাজ শুরু করেছেন এমন সংগঠকদের ভূমিকাতো ছিলই, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল ইলা মিত্রের ভূমিকা। ইলা মিত্র কলকাতা শহরের শিক্ষিত রমণী, তার ওপর জোতদারের স্ত্রী, আবার জোতদারি প্রথা উচ্ছেদ করার সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া পড়ে সর্বত্র, সাধারণ মানুষ আবেগ ও আশায় উদ্বেল হলেন, ত্রাসে আতঙ্কিত হল স্থিতাবস্থার পক্ষের শক্তি।

কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তির সংবাদ পেয়ে প্রশাসনযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রামে পুলিশ আসতে শুরু করে, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে গ্রামগুলোর ওপর। ফলে আন্দোলনের সংগঠকদের সাবধান হবার প্রয়োজন হয়।

তবে জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে ওঠায় নেতৃবৃন্দের পক্ষে আত্মগোপন করে চলাফেরা করতে বা তৎপরতা অব্যাহত রাখতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি।

কৃষক সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তখন কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শেখানো হত পুলিশের মুখোমুখি হলে তাদের মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই সরে পড়ার এবং সম্ভাব্য পুলিশি আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পথগুলি কী কী হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে শেখানো হত দক্ষতার সাথে তীর চালানোর পদ্ধতি। এছাড়া উদ্যমী কৃষকদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং সরকারি বাহিনী সমূহের অনুকরণে তাদের মার্চ করার প্রশিক্ষণও দেয়া হত, আর এ ব্যাপারটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন আজাহার হোসেন। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চন্ডীপুরের হরমা মাঝি, তারা চাঁদ, ভগিরথ ও মাতলা মাঝি, পলাশ বন্দরের হড়েক ও ঝড়ু, নাপিতপাড়ার উদয় ও চুরকা, কেন্দুয়ার সোনা ও চুনু, রায়তারার মারাঙ্গ, বিষপুকুরের জয়চাঁদ ও মেঘু, জগদলের ডুলু, ধরমশ্যামপুরের বেনী রায় ও বিষ্ণু রায়, তেলাঙ্গাপাড়ার সংকর প্রমুখ। কমিউনিস্ট ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত মাতলা মাঝির বাড়িটি পাহারা দেবার জন্য প্রত্যেক রাতে এলাকার প্রতিটি গ্রাম থেকে দুজন করে স্বেচ্ছাসেবক আসতেন এবং সমস্ত রাত পাহারা দিতেন। সাধারণভাবে বন্দুক চালানোর ট্রেনিং তখন দেয়া হয়নি, তবে সংগঠনের এখতিয়ারে গোটা-কতক বন্দুক ছিল। রমেন মিত্র ও নওগাঁর নামকানঝিগড়ার অনিমেশ লাহিড়ী ছিলেন সামন্ত পরিবারের সন্তান এবং তাদের পারিবারিক বন্দুকগুলোকে কখনও কখনও পার্টির কাজে ব্যবহারের জন্য আনা হত।

শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে পার্টির বন্ধুদেরকে একত্রিত করার কাজে নাচোল এলাকায় একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োগ ঐ সময় ঘটানো হয়েছিল। গাঁয়ের সীমানায় সবচেয়ে উঁচু যে তালগাছ, সেই তালগাছের মাথায় বাঁধা হত একটি বিরাট লম্বা বাঁশ। আর একত্রিত হবার নির্দেশের স্মারক হিসেবে ঐ বাঁশের আগায় উড়িয়ে দেয়া হত লাল পতাকা। ঐ পতাকা যখনই উড়ত তখনই আশেপাশের পাঁচ-ছয় মাইল এলাকার মানুষ বুঝে নিতেন যে পার্টি তাদের ডাক দিয়েছে। আর লাল পতাকা ওড়ার সাথে সাথে সাঁওতাল পল্লীতে বেজে উঠত মাদলের দ্রাম-দ্রাম-দ্রিম শব্দ। ঐ শব্দের তরঙ্গ সংকেত ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ত এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়।

তেভাগা দাবি উত্থাপনের একেবারে গোড়াতে, প্রচার আন্দোলনের পর্যায়ে নাচোল, শিবগঞ্জ ও গোদাগাড়ির বিভিন্ন এলাকায় ঘরোয়া সভা, জনসভা, গণজমায়েত বা পথসভার আয়োজন করা হয়। ছোটোখাটো অসংখ্য মিছিলের পাশাপাশি সংগঠিত করা হয় বড় বড় বেশ কতক মিছিল। বিশেষত নাচোল ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে যখন সুদীর্ঘ মিছিলগুলো সম্মুখ ভাগে এগুতো তখন অনেক সময় ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ত। আর যাত্রীরা অবাক হয়ে বা উৎসাহ ভরে তা প্রত্যক্ষ করতেন।

সাত আড়ি জিন, তেভাগার দাবি ও পুলিশ হত্যার ঘটনা

ঘরোয়া বৈঠক, জনসভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জমিদার ও জোতদারের শোষণ ও নির্যাতনকে প্রতিরোধ করার একটি মানসিক প্রস্তুতি যখন গড়ে ওঠে, সেরকম একটি সময়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেন। দাবি উত্থাপন করা হয় 'সাত আড়ি জিন' ও ফসলের তেভাগার। সাত আড়ি কথাটি আঞ্চলিকভাবে ব্যবহৃত বিধায় তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি ধান কাটা ও মাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত। বরেন্দ্র এলাকায় প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বিশ আড়ি (কাঠা/ধামা) ধান কাটা ও মাড়ানোর জন্য নিযুক্ত দিনমজুর পেতেন তিন আড়ি ধান। কৃষক সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে ঐ হারকে তিন থেকে বাড়িয়ে সাত আড়ি করতে হবে। তাদের এই দাবি অযৌক্তিক ছিল না। কেননা একেতো বরেন্দ্র এলাকায় কৃষককে তখন উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগই ভূস্বামীকে দিতে হত—উপরন্তু ভূস্বামী ফসল উৎপাদনের কোনো খরচ বহন করতেন না। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভাব অত্যন্ত জেঁকে বসে থাকায় সেখানে প্রচুর জমি কতিপয়ের হাতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। অর্থাৎ ঐ এলাকার জোতদাররা ছিলেন বড় বড় জোতের অধিকারী। একেকজন জোতদার বা জমিদার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে অংশগ্রহণ না করেই (এমনকি কোনো কোনো স্থানের জোতদাররা যে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন তা পর্যাপ্তভাবে না করেই) হাজার হাজার মন বা নিদেনপক্ষে শত শত মন ধান লাভ করতেন বছরে। কাজেই নীতিগত প্রশ্নের বিভিন্ন বিষয়কে বাদ দিলেও কেবল এসব বিবেচনা থেকে ক্ষুদ্র বর্গাচাষিরা বা ধান কাটা ও মাড়ানোর কাজে নিযুক্তিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ঐ দাবিকে কোনোভাবেই অসংগত বলা যায় না। কৃষক সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উত্থাপিত ঐ দাবি এলাকায় কৃষক ক্ষেতমজুররা খুব আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছিলেন।

সাত আড়ি জিন ও তেভাগার দাবিকে কেন্দ্র করে নাচোলের আন্দোলন একটি সংগঠিত রূপ ধারণ করায় এবং এতদিন ঘরে প্রচলিত বণ্টন ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলার উপক্রম করায় জমিদার। জোতদাররা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং আন্দোলনকে দমন করার স্বার্থে পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। ফলে তৎপর হয়ে উঠল পুলিশ। ইলা মিত্রের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ১৯৪৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিক থেকেই পুলিশ তৎপর ছিল। আন্দোলন-সংগঠনে যারা নেতৃত্ব প্রদান করছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশ বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে হামলা শুরু করে। সন্ধান না পেলেই চলত সাধারণ কৃষকদের ওপর নির্যাতন। তবে 'সালামি' পেলে সেদিনের মতো গ্রাম ছেড়ে চলে যেত। অর্থাৎ শুরু হয়েছিল পুলিশের মাধ্যমে আর এক নতুন ধরনের শোষণ। ক্রমাগত এ অত্যাচারে মানুষ আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ফলে শ্লোগান উঠল "দালালকে হালাল করো"। প্রস্তুতি শুরু হল পুলিশকে প্রতিরোধের। তাছাড়া পার্টির পক্ষ থেকে নাচোলকে মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ততদিনে গৃহীত হয়ে গেছে। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয় পুলিশ হত্যার ঘটনা।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ৫-০১-৫০ তারিখে সকাল প্রায় নয়টার দিকে নাচোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা একটি গরুর গাড়িতে করে তিনজন কনস্টেবলসহ ঘাসুরা গ্রামে উপস্থিত হন এবং জনৈক অক্ষয় পণ্ডিতের খোলানের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পান যে দুজন কৃষক, বাদান ও ফেলু ধান সরাচ্ছে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঐ দুজনকে গ্রেফতার করে এবং তাদেরসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে ঘাসুরা প্রাইমারি স্কুলে উপস্থিত হয়ে উৎপাদিত ফসলের অবৈধ ভাগাভাগি বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। গ্রামে পুলিশের আগমন এবং কতিপয় কৃষককে আটক করার সংবাদ আশেপাশে ছড়িয়ে যায়। ফলে বিপদ সংকেতের স্মারক হিসেবে গ্রামের সীমানাবর্তী তাল গাছের মাথায় টানানো পার্টির লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয় এবং সাঁওতালি নাকাড়া বেজে ওঠে। ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নারী পুরুষ তীর-ধনুক লাঠি-সোটা নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হন। ক্রুদ্ধ কৃষকদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পুলিশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গুলি চালায়। ফলে একজন সাঁওতাল কৃষক অকুস্থলেই নিহত হন। এরপর জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং দারোগাসহ পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেন। শুরু হয় গণপিটুনি এবং একপর্যায়ে দারোগাসহ সব কজন পুলিশই নিহত হন। নিহত দারোগার নাম ছিল তফিজউদ্দিন মোল্লা এবং কনস্টেবলরা ছিলেন শাহাদাত আলম, নওয়াজেস আলী ও তপেশ চন্দ্র আচার্য। এদের মৃতদেহ পরে মরাপুকুর ও শ্যামপুর নামক দুটি স্থানে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হয়। এছাড়া পুলিশ ডেকে এনেছে সন্দেহে উত্তেজিত কৃষকেরা খাদ্য বিভাগের 'প্রকিউরমেন্ট' সাব-ইন্সপেক্টর আফজাল হোসেন ও পরিমাপক সফল খানকে জনৈক সাঁওতালের ঘরে আটক রাখেন। মাটির ঘরের অশক্ত জানালা কোনোভাবে ভেঙে এরা রাতের বেলা পালিয়ে যান এবং কোনোক্রমে প্রাণ রক্ষা করেন।

দারোগা ও পুলিশদের যখন আঘাত ও হত্যা করা হয় তখন দারোগাকে বহনকারী গো-শকটের চালক লালুনাথ কর্মকার প্রাণভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। তিনিই পরে থানায় যেয়ে খবর দেন। থানা থেকে সাথে সাথে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে খবর পাঠানো হয়। অনতিবিলম্বে নাচোলে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ও আনসার পাঠানো হয়। এরা অপরাধী নির্ধারণ বা কোনোরকম বিচারের আদৌ অপেক্ষা না করেই বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। গোটা এলাকায় প্রতিটি কৃষক বাড়ির মধ্যে ঢুকে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে বেধড়ক মারপিট করে এবং অধিকাংশ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, বহু নারীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মত্ততায় মত্ত পুলিশ ও আনসার বাহিনীর হাতে প্রচুর সংখ্যক সাঁওতাল নিহত হন। বাকিরা পরিবার পরিজন নিয়ে বা তাদের ফেলে রেখে ঘর-বাড়ি, গরু-ছাগল, ধান-চাল ও অন্যান্য সম্পদ ফেলে রেখেই প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। সারা এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এক নিদারুণ ত্রাসের রাজত্ব।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ মিত্র ওরফে হাবু বাবু ছিলেন কলকাতায় একটি মিটিংয়ে। মাতলা মাঝি নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে

ভারতে চলে যেতে সমর্থ হন। ইলা মিত্র সাঁওতাল রমণীর ছদ্মবেশে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় রহনপুর রেল স্টেশনে ধরা পড়েন। তার সাথে ধরা পড়েন বৃন্দাবন সাহা। আজাহার হোসেন ও অনিমেষ লাহিড়ী কয়েকদিন পর আজাহার হোসেনের বাড়ি রামচন্দ্রপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ট্রেনযোগে পলায়নপর বেশকিছু সাঁওতালকে রাজশাহীর কাছাকাছি এক জায়গা থেকে ৮ জানুয়ারি পুলিশ গ্রেফতার করে। বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্নভাবে গ্রেফতার করা হয় আরো অসংখ্য সাঁওতাল কৃষককে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাব-জেল পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় কয়েক দফায় কয়েদিদেরকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

সে সময় যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পাওয়া যায় কেস চলাকালীন Examination of Accused নামক ফর্মে বৃন্দাবন সাহা কর্তৃক লিখিত বক্তব্য থেকে। তিনি লেখেন, "নাচোল থানায় আমাকে খুব মারপিট করা হয়। ৮ তারিখে ডান হাতের আঙুলের মধ্যে একটা লোহার পিন পুঁতে দেওয়া হয়। এই সময় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। যখন জ্ঞান ফিরে পাই তখন সামান্য বেলা ছিল। আমি একজন পুলিশকে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি। তখন আমাকে একটা ছোটো ঘরে রাখা হয়। রাতে আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি বা কোনো জামা কাপড় দেওয়া হয়নি। পরদিন সকালবেলা দুইটা লাঠি দিয়া গায়ে চাপ দেওয়া হয়। পায়ে ও পিঠে লাঠি দিয়া খুব আঘাত করা হয়। বৈকালে আমাকে মারা হয়। নবাবগঞ্জ থানার দারোগা আমার বুকে লাথি মারায় আমার গলা দিয়া রক্ত বেরোয়। সেখানে যে কয়দিন ছিলাম ততদিনের মধ্যে শুধু মুড়ি খাইতে দেওয়া হইত, জল খাইতে চাইলে সেপাইরা মুখে প্রশ্রাব করিত। মারের চোটে বাম হাতের Cup ভাঙিয়া যায় ও ডান হাতে কব্জির কাছে ভাঙিয়া যায়। মারের জন্য Central Jail Hospital-এ ২৬ দিন থাকি। এখনো আমার বুকে ব্যথা আছে, ডান পা ও বাম হাতে এখনও ব্যথা আছে।" গ্রেফতারকৃত সাঁওতালদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে শেখ আজাহার হোসেনের সাক্ষাৎকার থেকেও কিছুটা জানা যায়। তিনি বলেছেন যে, তখন থানার হাজতে রাখার জায়গা থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি তার দরকার ও ছিলনা, কেননা সাঁওতালদেরকে মেরে এমন অবস্থা করা হয়েছিল যে তাদের বাইরে বাঁধনমুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হত অথচ কারো পালিয়ে যাবার সাধ্য শারীরিকভাবে ছিল না।

তবে সে সময়ে পুলিশি নির্যাতনের ভয়াবহতা বিধৃত ইলা মিত্রের ওপর নির্যাতনের বিবরণে। ইলা মিত্র রাজশাহী কোর্টে তাঁর নিজের জবানবন্দীতেই 'ইসলামী রাষ্ট্র' পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকারের আসল চেহারার একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন যথার্থভাবে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। পুলিশ কর্তৃক ইলা মিত্রের ওপর অমানবিক ও বর্বরোচিত নির্যাতনের পর তাকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলে সরকারি ডাক্তার কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকায় স্থানীয় প্রখ্যাত ডাক্তার আইয়ুব আলী তাঁর চিকিৎসা করেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে ঐ নির্যাতনের কথাকে সত্য বলে বর্ণনা করেছেন।

নাচোল পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে প্রাদশিক বিধান পরিষদে আলোচনা উত্থাপনের জন্য প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী ও মনোহর ঢালী কতকগুলি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারকে দেন। কিন্তু তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদ এবং মুসলীম লীগ সদস্যরা পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপনের ব্যাপারে এই মর্মে বিরোধিতা করতে থাকেন যে, পুলিশহত্যা সম্পর্কিত বিষয়টি কোর্টের বিচারাধীন, কাজেই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা পরিষদে হতে পারে না। জবাবে প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী ও বিরোধী দলের নেতা বসন্তকুমার দাস বলেন যে তারা পুলিশহত্যার বিষয়টি আলোচনা করতে চান না, বরং আলোচনা করতে চান ঘটনা ঘটে যাবার পরবর্তী সময়ে ঐ এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারীর নির্যাতনের বিষয়টি। কিন্তু নানা কূটতর্ক টেনে নুরুল আমিনরা এর বিরোধিতা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীর অনুগত স্পিকার রায় দেন সে এ ব্যাপারে পরিষদের কোনো মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না বা কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। এভাবে নুরুল আমিন সরকার নাচোলে সরকারি বাহিনীর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাবলি জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নাচোলের ঘটনাটি যে সময়ে ঘটে তার বেশ আগেই চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফৌজদারি ও দেওয়ানি কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পুলিশ হত্যা সম্পর্কিত ঐ মামলাটির বিচার চাঁপাইনবাবগঞ্জ কোর্টে না করে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহীতে এবং সেখানকার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আহমেদ মিয়ার কোর্টে মামলাটি ন্যস্ত করা হয়। এ পর্যায়ে আসামি করা হয় মোট একত্রিশ জনকে।

পরবর্তীকালে মামলাটি ঐ কোর্ট থেকে স্থানান্তর করা হয় জেলা সেশন্ জজ জনাব এস আহমেদের কোর্টে এবং আসামির সংখ্যা ৩১ থেকে কমিয়ে করা হয় ২৩ জন। জনাব এস আহমেদ আসামিদের সবাইকে Trasportation for life দণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ড দেয়া হয় পাকিস্তান পিনাল কোডের ৩০২/১৪৯ ধারা অনুযায়ী।

সেশন্ জজের উপরিউক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয় এবং হাইকোর্টের রায়ে আসামিদের শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে দশ বছর করা হয়। এদের মধ্য থেকে এ.কে ফজলুল হকের গভর্নরশিপের সময় ইলা মিত্রকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয় চিকিৎসার প্রয়োজনে ভারতে যাবার জন্য। ইলা মিত্র আর ফিরে আসেননি এবং ধারণা করা হয়ে থাকে যে সে রকম একটা ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়েছিল। পুলিশ ও আনসারের ব্যাপক নির্যাতনের মুখে নাচোল এলাকা থেকে সাঁওতাল-রাজবংশীসহ কয়েক হাজার আদিবাসী নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে গমন করেন। এদের অধিকাংশই আর ফিরে আসেননি। স্বল্প সংখ্যক যারা ফিরে এসেছেন তারাও আর তাদের পূর্বের ভিটেমাটিতে ফিরে যেতে পারেননি। কেননা স্থানীয় বা ভারত থেকে রিফিউজি হয়ে আসা বাঙালি মুসলমানদের দ্বারা সেগুলো দখল হয়ে গেছে। এরা নাচোলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায়, যেমন আমনুরা বা মুন্ডমামলার হাট অথবা তানোরের কষ্ণপুরের মতো জায়গায় নতুন করে বসতি গড়েছেন।

কিংবদন্তীর ইলা মিত্র

ইলা মিত্রের অসাধারণ সাহসী ও সংগ্রামী জীবন 'পঞ্চাশ' ও পরবর্তী বছরগুলিতে দুই বাংলার মানুষের সংগ্রামী জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছিল। তাঁকে ঘিরে সে সময়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এসব রচনা শুধু যে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তা ও আবেগের প্রতিফলন তাই নয়, ইলা মিত্র ও নাচোল বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমনে যে ব্যাপক আবেগ ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তারও প্রতিফলন এগুলো। বস্তুত এসব রচনা, জনশ্রুতি এবং আবেগ ও আলোড়নের মধ্য দিয়েই ইলা মিত্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে অতিক্রম করে পরিণত হয়েছিলেন 'কিংবদন্তীতে'; আর একইভাবে নাচোল বিদ্রোহ সাধারণ একটি কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা বা রাজনৈতিক ঘটনা না থেকে পরিণত হয়েছিল বিশেষ উপাখ্যানে। এ কথা সত্যি যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশই ইলা মিত্র বা নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে না জানলেও, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাচোল এবং সংলগ্ন এলাকাগুলোতে ইলা মিত্র, রমেন মিত্র ও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বিশেষত নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের ঘটনাটির কথা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে :

পূর্ববঙ্গে লোক দেহত্যাগী
তুমি গেলে দেশের গভীরে
কৃষকের হৃদয়ের কাছে।
'ওঠো, জাগো, নাচোলের চাষী।'
ঘরে দিলে তুমি ডাক
'জাগো লাল ঝাণ্ডা নিয়ে, জাগো।'
শঙ্কাহীন জানালে আহ্বান।
ক্ষুধাতুর ব্যথাতুর যারা
সাড়া তারা দেয় ধীরে ধীরে।
ধীরে ধীরে চেতনা কন্দরে
ঝরে পড়ে আশার আলোক।

গোলাম কুদ্দুসের লেখা 'ইলা মিত্র' স্টালিন-নন্দিনী, ফুচিকের বোন ইলা মিত্রের সেই আশ্চর্য বন্দনাতে ইলা মিত্রের গোটা সংগ্রামী জীবনের চিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই কবিতায় কিভাবে তিনি কৃষকের ঘরে গেলেন, সংগঠন গড়লেন, বিদ্রোহের আহ্বান জানালেন 'নাচোলের চাষি'কে অতঃপর তার বন্দীদশা, বন্দী অবস্থায় চরম নিগ্রহ ও নির্যাতনের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে তার পলাতক স্বামী ও শিশু সন্তানের কথা :

ইলা মিত্র রাজশাহী জেলে
স্বামী তার শান্ত ঋজু দৃঢ়
ফেরারী এখনো পাকিস্তানে,
উভয়ের শিশু পুত্র কোথা
মাতাপিতা সঙ্গহীন বাড়ে।

ইলা মিত্র ও নাচোল বিদ্রোহের কথা সে সময় শুধু দুই বাংলায় নয়, ভারতের অন্যত্রও সচেতন ও সংগ্রামী মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যুক্ত হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শোষণ ও নির্যাতন বিরোধিতার অন্যান্য নাম ও উপাদানের সাথে :

ইলা মিত্র স্ট্রেচারে আবার
ফিরে আসে কয়েদ খানায়।
ফেরে না কাহিনী তবু তার।
বাতাসে ছড়ায় মুখে মুখে,
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
দেশ হতে দেশান্তরে
সীমান্ত পেরিয়ে সেই নাম
ব্যাপ্ত হয় ভারতের বুকে,
যায় মুক্ত মানুষের দেশে
সেই নাম চীনে সোভিয়েতে
ছড়ায় স্পেনের কারাগারে।

নাচোলের পুলিশ হত্যার ঘটনার পরে ইলা মিত্র ও তাঁর সহযোগীরা যখন কারাগারে বন্দী, সে সময় পূর্ব বাংলার জেলখানাগুলো ভরে উঠেছিল আরো অনেক রাজবন্দীতে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর নিদারুণ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিলেন এঁরা। যখন জানা গেল ইলা মিত্রের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন সবকিছুকে অতিক্রম করেছে, তখন এই রাজবন্দীদের মাঝেও তা ব্যাপক ক্ষোভ ও উষ্মার সৃষ্টি করে। ইলা মিত্রের সমর্থনে তাকে সাহস জুগিয়ে, তার অবদানকে স্মরণ করেও তার সাথে একাত্ম হয়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতা রচনা করেন, ১৫.০১.৫০ তারিখে শহীদ সাবের রচিত 'শোকার্ত মায়ের প্রতি' এমনি একটি কবিতা।

পৃথিবীর দেশে দেশে পরিচালিত শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের উল্লেখ করে রচিত দীর্ঘ এই কবিতাটির একাংশে স্থান পেয়েছে পুলিশি নিপীড়নে জর্জরিতা 'ইলা মাতা'র কথা।

মা গো আর তো সহে না প্রাণে তোমার নির্যাতন
নাচোলের কৃষক রমণী মা
লীগ নাৎসী অত্যাচারিতা ইলা মাতা।

তদানীন্তন পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী কর্তৃক চরম নিগৃহীত এবং নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ইলা মিত্রের বড় বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি লজ্জায় বা ভয়ে সেই অত্যাচারের কথা গোপন করেননি। বরং তাঁর জবানবন্দীতে বিস্তারিত বিবরণ দেন সেই অত্যাচারের। তাঁর সেই জবানবন্দী সে সময়ে লিফলেট আকারে বিলি হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে। অবর্ণনীয় সেই অত্যাচারের বিবরণে মানুষের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল শহীদ সাবেরের কবিতার কয়েকটি ছত্র থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

তোমার জবানবন্দী এসেছে হাতে
নাৎসী কাঠগড়ায় দিমিট্রভের জবানবন্দীর মতো;
বারুদ ঠাসা
খোদার আরস কাঁপানো কি ভীষণ তোমার জবানবন্দী মাগো।

ইলা মিত্র এবং নাচোল বিদ্রোহের পর সে এলাকায় যে পুলিশি নির্যাতনের তাণ্ডব চালানো হয়েছিল তা সে সময়ের পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে শুধুমাত্র একটি বিক্ষোভ বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের নেতার প্রতি প্রশাসনের রোষ হিসেবে প্রতিফলিত হয়নি। বরং এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল পুলিশি রাষ্ট্র পাকিস্তানের চরম স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতিটি :

বৃটিশ রাজের বানানো ফাঁড়িতে
লীগ সরকারের নাৎসী সান্ত্রীরা
তোমাকে আনলো ধরে আর এক শীতের দিনে
নতুন ভের্নে বড় দারোগা পশু,
আবার জিজ্ঞাস শুরু
বিদেশী রাজ্যের গোলামী পীড়িত উত্তরবঙ্গ
ডলার রাজ্যের গোলামী পীড়িত পাকিস্তান
নুরুল লিয়াকত খড়গ ঝোলে
জমি ভুখ কৃষকের কাঁধে। তাই
জমি দখলের লাগি যারা লড়ে
তারা কোথায়? তারা কোথায়?
ইলা মাতা বলবে না তা।

শত অত্যাচারের মাধ্যমে যে পুলিশ ইলা মিত্রকে নতি স্বীকার করাতে পারেনি বা তার বিদ্রোহের সহযোগীদের পরিচয় আদায় করতে পারেনি, উল্লিখিত কবিতাংশের শেষ দুটি লাইন থেকে তা প্রতীয়মান হয়। এই অসাধারণ সাহসী 'মা'কে তাই কবি শক্তি ও প্রতিশ্রুতি জোগাচ্ছেন এভাবে :

দারোগা তোমায় যতই ভয় দেখাক বলাৎকারের
সে তো তোমার একার লজ্জা নয়কো মা
তোমার সন্তানেরা তাদের রাখবে চিনে ইলামাতা...

এমনি আরেক জেলবন্দী নুরুন্নবী চৌধুরী ১৫৫৩-র মে দিবসে ইলা মিত্রকে উদ্দেশ করে লিখেছেন কবিতা, 'আমার দিদিকে' :

দিদি। তুমি কাঁদছ?
তুমি যে নতুনের জন্মদাত্রী মা।
ঐ যে আমাদের বুড়ি মা মংলী
কেবলি বলতো তোমার কথা;
বোলত—
তুমিই ছিলে

ওদের মা
ওদের সাথী
ওদের বোন
ওদের সন্তান।

ইলা মিত্রের লোকপ্রিয়তার পরিচয় মেলে কবিতার উপরিউক্ত অংশটি থেকে। বোঝা যায় কী অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন তিনি, গ্রামের সাধারণ বুড়ি মা মংলীও যার কথা বলে, এবং যে নাকি তাদের বাঁচার আশ্বাস যোগায় :

তোমার দিকে চেয়ে আছে
ভিন গাঁয়ের কিষাণ,
সুতাকলের মজুর,
আর দাঁড়টানা মাঝি।
তোমার দিকে চেয়েই,
ওরা বাঁচবে,
ওরা দাঁড়াবে,
ওরা বোলবে,
ওরা শিখবে,
একটা গান,
সে গান মানুষের গান।
তোমারই নামে ওরা পাথর কাটে,
ওরা চাষ করে,
ওরা কাজ করে,
কোলের শিশুকে ওরা দুধ খাওয়ায়।
তুমি আছ
ওরা তাই বাঁচবে।

এ থেকেই বোঝা যায় যে কৃষকদের নিয়ে ইলা মিত্র আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর প্রতি তাদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিটা ছিল অনেক সুগভীর। তাঁর নাম তাদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।

প্রথিতযশা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সে সময়ে ইলা মিত্রকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম "কেন বোন পারুল ডাকো রে।" ইলা মিত্র জেলে বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সফরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছিলেন একটি নিবন্ধ "সূর্যমুখী"। তাঁর এই নিবন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত কবিতাটির জন্মের একটি ইতিহাস পাওয়া যায় এভাবে :

"সেদিনের এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতা। কত রকমের কত লোকজন আসছে ইলা মিত্রকে দেখতে। কথা কেউই বলছেন না। নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে, স্নেহ জানিয়ে চলে যাচ্ছেন তারা। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও দেন না আশেপাশের রোগিণীরা। বলেন : আপনারা

এবার যান। ওঁর শরীর ভালো নেই। শুনলাম হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স. জমাদার প্রত্যেকেরই নাকি ইলা মিত্রের ওপর সশ্রদ্ধ সতর্ক দৃষ্টি। তাই তিনি বেঁচে উঠছেন।"

সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল বোন আমার—।

অর্থাৎ হত্যা মামলার আসামি হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার, নার্স, জমাদার আশেপাশের রোগীরাসহ সাধারণ মানুষের কাছে ইলা মিত্রের গ্রহণযোগ্যতা যে কতখানি ছিল তারই প্রমাণ মেলে দীপেন্দ্রনাথের লেখাটি থেকে। আর আপাত দৃষ্টে আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ইলা মিত্রের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়নি বা তিনি যে একাকী হয়ে পড়েননি, তার পেছনে মানুষের সমর্থন অব্যাহত তা ফুটে উঠেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাংশটি থেকে।

ইলা মিত্রের অসাধারণ মনের জোর এবং সংগ্রামী মানুষদের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ও আন্তরিকতার পরিচয় মেলে যখন লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালের সাক্ষাৎপর্ব শেষে বিদায় নেবার সময় সীমাহীন নির্যাতন ও রোগযন্ত্রণায় পীড়িত ইলা মিত্র যখন বলে ওঠেন, "যাওয়ার আগে বলি, সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।"

আরো অনেক পরে ১৯৬০-এর দিকে এই একই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন "ফুল ফোটার গল্প"। এই গল্পটির আঙ্গিকটি মূলত বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে ইলা মিত্রের অবস্থা থেকে শুরু হয়ে তৎপরবর্তীকালে কলকাতায় তাঁর শয্যাশায়ী জীবন এবং তারও পরে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কর্মরত ইলা মিত্রের জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে :

"গাঁয়ে গাঁয়ে কি ঘুরতেই না হত আপনাকে" গল্পে এরকম একটা বক্তব্যের জবাবে ইলা মিত্র বলেছেন;

"ভাবলে স্বপ্ন মনে হয়। জল-বাদা-ভেঙে মাঠে মাঠে ঘুরেছি। গাঁ, ধানক্ষেত। সেই আমি বিছানায় উঠে বসতে কাতরাই—কোনো দিন ভাবতে পেরেছিলাম?"

আন্দোলন, সংগ্রামের প্রয়োজনে পুরোপুরি শহরে বেড়ে ওঠা, বেথুনে পড়া ইলা মিত্রকে যে সত্যিই জল কাদা ভেঙে মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়েছিল তার স্মৃতিচারণমূলক এই বক্তব্য সে সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর ওপর যে অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো হয়েছিল তাকে লেখক সম্মিলিত লজ্জা মনে করে বলেছেন, "বাস্তবিক পক্ষে মনে হত তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই আমাদের সময়কে, আমাদের জেনারেশনকে ক্ষমা করা।"

পূর্ব বাংলার কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ ইলা মিত্রকে কেন্দ্র করে চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশিরের জীবনের একটি অভিজ্ঞতাকে নিয়ে লিখেছেন ছোটোগল্প "কয়েকটি কমলালেবু।" বন্দী ও অসুস্থ ইলা মিত্রকে আরো অনেকের মতোই দেখতে গিয়েছিলেন মুর্তজা। কমলালেবুর রস ছাড়া ইলা মিত্র সে সময় আর কিছুই খেতে পারেন না, জানতে

পেরে শুরু হয় মর্তুজার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা—কয়েকটি কমলালেবু কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের। ইলা মিত্র যে তখনকার প্রগতিশীল তরুণ জনমনে কী প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, মুর্তজা বশিরের কয়েকটি কমলালেবু সংগ্রহের প্রচেষ্টা সে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে নতুনভাবে।

ইলা মিত্র ও নাচোল বিদ্রোহকে ভিত্তি করে এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত লেখাটি লিখেছেন সেলিনা হোসেন। সেলিনা হোসেন এ দেশের একজন প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক তথা গল্প লেখক। নাচোল বিদ্রোহকে ভিত্তি করে তাঁর লেখা 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' একটি উপন্যাস, তবে ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটি রচিত হয়েছে কল্পনা ও বাস্তবতার মিশেলে। ফলে বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাসমূহের পাশাপাশি এসেছে কিছু কিছু কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা। কাহিনীর পটভূমি শুরু হয়েছে ৪০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইলা মিত্র ও রমেন মিত্রের বিবাহের ঘটনার মধ্য দিয়ে। অতঃপর ঘটনাপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে সময়ানুক্রমিকভাবে, ঘটনা পরম্পরায়। আজমল ও আজিজ নামক দুটো কল্পিত চরিত্রের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গোটা কাহিনীটি আবর্তিত হলেও, কাহিনীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন ইলা মিত্র, অন্যান্য কর্মী-সংগঠক ও নাচোল বিদ্রোহের ঘটনাবলি। ইলা মিত্র, রমেন মিত্রসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর নাম অভিন্ন রাখা হয়েছে। ফলে সোয়েব সরকার, ফনীভূষণ মাস্টার, মাতলা মাঝি, হরেক মন্ডল, অনিমেষ লাহিড়ী, আজাহার হোসেন ইত্যাদি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে নতুন মাত্রা লাভ করেছে, তথা লোক পরিচিতি লাভ করেছে, যা গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থে সম্ভব নয়।

ঘটনার বিবরণে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা, তেভাগা আন্দোলন, আলকাপের গান, দেশবিভাগ, দেশবিভাগউত্তর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং সবশেষে নাচোলে আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব ও পুলিশ হত্যার ঘটনা ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কল্পিত কাহিনী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে জোতদারের ছেলে আজিজের 'ডি-ক্লাসড' হবার কথা। কমিউনিস্ট আদর্শিক প্রচারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজমলের আন্দোলনে যুক্ত হবার কথা। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর উপস্থাপনের সত্যতা ও যথার্থতা অনেকটাই রক্ষা করা হয়েছে; তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবেগের প্রাবল্য থাকলেও তা হয়তোবা উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে এসেছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন নিঃসন্দেহে ইলা মিত্র। তবে ইলা মিত্রের পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সাথে স্থান দেয়া হয়েছে রমেন মিত্রকে, নাচোল সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন লেখায় যে ত্রুটিটি প্রায়শই দেখা যায়। ইলা মিত্রের স্বামী, সহকর্মী, অনুপ্রেরণার উৎস এবং সর্বোপরি নাচোল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকরূপে রমেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা উপন্যাস জুড়েই বিধৃত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। আর ইলা মিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছেন তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবমূর্তি তথা "ক্যারিসমেটিক" নেতৃত্বের ইমেজে। তাঁর আগমন ও কর্মকাণ্ডে এলাকায় যে সাড়া

পড়েছিল, বিশেষত তরুণ যুবক ও আদিবাসীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

> সাঁওতাল ভাষা ইলার কণ্ঠে আগুনে-পোড়া কাঠের মতো পট্‌পট্ শব্দে ফাটে। আকাশ-জুড়ে ফুটে ওঠে তিরিশ সালের বাংলাদেশ-ব্রিটিশ বিরোধী বারুদে পুড়েছে। ওরা (সাঁওতালেরা) স্থির-নিশ্চল থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে। কালো পাথুরে মুখে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ নেই ভেতরে চলে নিজেদের তৈরি করার কারণ। বলতে বলতে ইলা মিত্র ভুলে যায় ছেলের কথা, সংসারের কথা, রামচন্দ্রপুর হাটের বাড়িটার কথা। ও এখন প্রীতিলতা। ওর শ্যামলা মুখটা তিরিশের বাংলাদেশ-ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, নিরন্ন, হাড় জিরজিরে—অথচ সূর্যসেনের মতো হাজার যুবকের পদভারে সে মুখের খানাখন্দ, ঝোপঝাড়, মেঠোপথ, চাষাক্ষেত-রক্ত-বারুদে মাখামাখি। জীবন যাপনের এই অনিয়ম—ঠিকমত খাওয়া নেই-নাওয়া নেই—রোদ্দুরে পুড়ে-পুড়ে ইস্পাত হয়েছে শরীর, শিশু পুত্রের ছবি বুকের কন্দরে লুকিয়ে রেখে বিপ্লবের উজ্জ্বল আভায় বদলে নিয়েছে নিজেকে। ইলা মিত্র বুক উজাড় করে প্রীতিলতার গল্প বলে। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাকে মিশে সে কণ্ঠ চন্ডিপুর ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। ওর দৃষ্টিতে আশ্চর্য সুদূরতা, কণ্ঠে বজ্রপাত, আসন্ন বিপ্লব ওর চেতনায় সমুদ্রের শত বছরের গর্জন।

এই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি আছে নিঃসন্দেহে, বিশেষত সাঁওতাল ভাষায় ইলা মিত্রের দক্ষতার কথায় এবং তিরিশের দশকের বাংলাদেশের পটভূমিতে ইলার আন্দোলন সংগ্রামের কথায়। কারণ রামচন্দ্রপুর বা নাচোলে ইলা মিত্রের আগমন ঘটেছিল তিরিশ দশকে নয়, বরং ১৯৪৫ সালে বিবাহের পর। সাঁওতালি ভাষা ইলা মিত্র রপ্ত করেছিলেন হয়তোবা কিন্তু কতটা দক্ষ ছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, ইলা মিত্রও তাঁর প্রদত্ত কোনো সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। এতদসত্ত্বেও বর্ণনাটির গুরুত্ব এটুকুই যে, এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তৎকালীন আদিবাসী সমাজে ইলা মিত্রের যে ভাবমূর্তি, সেটি তুলে ধরা হয়েছে এবং একই সাথে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যক্তি ইলা মিত্রের জীবনের রূপান্তরের কথা—'তথাকথিত প্রচলিত' গৃহবধূ ও মাতৃত্বের ইমেজ ভেঙে এক সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মীতে পরিণত হবার কথা, যেকর্মী প্রয়োজনবোধে মাছ কুটে শাশুড়িকে সন্তুষ্ট করেছেন, আন্দোলনরত দিনগুলিতে শিশু-পুত্রের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে একজন মেয়ের পক্ষে যে প্রচলিত কাজের বাইরে যেয়েও ভিন্ন ধারার কাজে জড়িত হওয়া সম্ভব এবং এ দু ধারার মধ্যে যে বস্তুত কোনো বিরোধ নেই, সেটিই এখানে পরিস্ফুটিত হয়েছে। আর কর্মীর মধ্যে ইলা মিত্রের প্রতি আবেগ, বিশ্বাস ও ভালোবাসা যে কতখানি প্রবল ছিল, তা পরিষ্কার ফুটে ওঠে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আজমলের একটি উক্তি থেকে। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে বন্দী অবস্থায়, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ইলা মিত্রের জবানবন্দীটি পড়ার সময়, পড়া শেষ হয়েছে কিনা এ মর্মে বন্দী বেলায়েতের প্রশ্নের জবাবে—জবানবন্দীটি তখনো পড়া হয়নি বলে বলেন, "ওটা পড়লে আমার মৃত্যুর কথা মনে হয়। আমি জানি ওটা পড়া শেষ করতে পারলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ...পৃথিবীতে যদি কোনো পবিত্র জিনিস থাকে, রাণী মা আমার কাছে তাই। শুধু কথা দিয়ে এটা বোঝানো যাবে না।"

বাস্তবিক পক্ষে লোকপ্রিয় একটি সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের সুবিধা এই যে, এখানে শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস ও ঘটনার বিবরণ প্রদানে বাধা নিষেধের গণ্ডি অল্প; ফলে সুখপাঠ্য বটে। গবেষণা গ্রন্থের বেলায় এই সুযোগটি অনেকটা সীমিত। লেখক সেলিনা হোসেন উপন্যাসের এই সুবিধাটি কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর লেখার মান আমাদের বিচার্য নয়, বা সে প্রয়োজনও এখানে নেই এবং নিঃসন্দেহে তা সাধ্যাতীতও বটে। বরং নাচোলের মতো একটি ব্যাপক আন্দোলনের অকথিত এবং সর্বসাধারণের প্রায় অজানা কাহিনীকে উপন্যাসের মোড়কে উপস্থাপন করে তিনি এই আন্দোলনের নেতা, কর্মী ও যাঁরা আত্মদান করেছিলেন তাঁদের প্রতি সুবিচার করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আমাদের মতো নাচোল বিদ্রোহ সম্পর্কে যারা উৎসাহী তাদেরকে।

'নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ' শীর্ষক বড় আকারের একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ সত্যেন সেন। নিবন্ধটি কিছুটা সিরিয়াস ধরনের এবং এতে নাচোলের কৃষক বিদ্রোহের খুঁটিনাটি বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি এতে ইলা মিত্রের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

> এই সরল প্রাণ সাঁওতাল জাতিরা তাঁর মধ্যে কি দেখতে পেয়েছিল তা তারাই জানে, তাকে নিজেদের মধ্যে তারা যেন এক নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁর নাম দিয়েছিল 'রাণী মা'। ছোট, বড়, নারী-পুরুষ সবাই তাকে এই নামেই ডাকত। কে জানে কোন গুণে, কোন মন্ত্রে, তিনি হাজার হাজার মানুষের হৃদয় রাজ্যের রাণীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই রাণী সিংহাসনের রাণী নন, তিনি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশে গিয়েছিলেন। ...
>
> তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রমের ব্যবধান ছিল না। কিন্তু নেত্রী হিসেবে তাদের ওপর তাঁর অদ্ভুত প্রভাব ছিল। এ কথা এখনকার দিনে লোকে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা তাঁর কথায় স্বেচ্ছায় জীবন দিতে পারত। এই শক্তি ও জনপ্রিয়তার উৎস কোথায় প্রশ্নটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমার মনে হয় আন্দোলনের সেই বিশেষ পরিবেশ, এতগুলি মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা, অটল বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরতা তাঁর নিজস্ব শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর এভাবেই সম্ভব হয়েছিল কিংবদন্তী ইলা মিত্রের বিনির্মাণ। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন লেখাতেও ইলা মিত্রের কথা এসেছে বিভিন্নভাবে। বিশেষত স্বাধীনতার পর যতবারই তিনি এ দেশে এসেছেন, ততবারই সে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে সংবাদপত্রসমূহে, প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে তাঁকে ঘিরে।

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সম্মেলন উপলক্ষে তিনি যখন বাংলাদেশে আসনে, তখন "দৈনিক বাংলার বাণী"তে প্রকাশিত হয় "ইলা মিত্র, এক অগ্নিদীপ্ত ফুল" শীর্ষক তাঁর জীবন ও কর্মভিত্তিক এক প্রতিবেদন। এখানে লেখক আরেক ঐতিহাসিক চরিত্র ডলোরোসি ইবারুরীর সাথে ইলা মিত্রকে তুলনা করে "বাংলার অগ্নিদীপ্ত ফুল" হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ডলোরেসি স্পেনে ফ্রাংকোর দুরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ফলে স্পেনের মানুষ ভালোবেসে তাঁর নাম

দিয়েছিল 'অগ্নিদীপ্ত ফুল।' একইভাবে, ইলা মিত্র জমিদারি শোষণ ও প্রশাসনিক নির্বিকারের বিপরীতে "নিম্নবর্গের" মানুষদের পক্ষে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ডলোরোসির সমতুল্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। লেখক এখানে তাঁকে "কিংবদন্তীর নায়িকা" এবং ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, 'যদিও "এই ঈর্ষা নীচতাজনিত না, ঔপন্যাসিক এমিল জোলার কবরে দাঁড়িয়ে আনাতোলা ফ্রাঁস বলেছিলেন : এই ব্যক্তিটিকে ঈর্ষা করো, একে ঈর্ষা করেই আমার মহৎ হতে পারি। এ হল সে ধরনের ঈর্ষা।"

ঐ একই সময়ে একতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ইলা মিত্রের সাক্ষাৎকার। লেখক একরাম হোসেন এখানে ইলা মিত্রের তুলনা করেছেন "ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাঈ"-এর সাথে, তাঁর ভাষায় "তিনি সকল বিপ্লবের মাতৃতুল্য।"

সবশেষে নাচোল এলাকায় আজও প্রচলিত একটি জনশ্রুতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। নাচোলের সাধারণ আদিবাসী জনগণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ইলা মিত্র সারাদিন আন্দোলন, সংগঠনের কাজে ব্যয় করে রাতের বেলা রামচন্দ্রপুরে ফিরে যেতেন শিশু পুত্রকে খাওয়াতে। রাত শেষ হতেই ভোর বেলায় আবার ফিরে আসতেন নাচোলে। নাচোল ও রামচন্দ্রপুরের মধ্যেকার দূরত্ব এবং তৎকালে যাতায়াত ব্যবস্থার পশ্চাদপদতার কথা বিচার করলে একরাতের মধ্যে নাচোল থেকে রামচন্দ্রপুর যেয়ে, পরদিন ভোরেই আবার ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। কাজেই জনশ্রুতিটাকে 'কাল্পনিক' বলে মনে হয়। কিন্তু নাচোলের সাধারণ মানুষের কাছে ইলা মিত্রের ভাবমূর্তি এমনই ছিল যে, তিনি যে কোনো অসম্ভবকেই সম্ভব করতে পারতেন, জনশ্রুতিটি তারই প্রতিফলন। নাচোল বিদ্রোহ অতিক্রান্ত হবার পর প্রায় পাঁচ দশক হতে চললেও, এখনো ঐ এলাকার আদিবাসী, বাঙালি আদিবাসীদের কাছে ইলা মিত্র একটি পরিচিত নাম। তেভাগার আইন কানুন এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে কেউ কেউ তাদের ইলা মিত্রের পার্টি হিসেবে জানে। ইলা মিত্রকে মানুষ কী চোখে দেখে এ প্রশ্নের জবাবে একজন সাক্ষাৎকারদাতা জানান, "ইলা মিত্রের চেহারাটা দেখবার জন্য বাংলাদেশের চার আনা লোক রাজী আছে। বিশেষ করে আমার নবাবগঞ্জ এলাকার মধ্যে, নাচোলের মধ্যে।" নাচোল তথা চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাধারণ মানুষদের দৃষ্টিতে ইলা মিত্র কোনো বেহক কাজ করেননি, হক মতোই করেছেন। উনি মানুষ দরদী, মানুষের সেবার জন্য, মানুষকে সৎপথে আনার জন্য কাজ করেছেন, রাজ্যবিরোধী বা রাজ্যের জন্য কোনো কাজ করেননি বা বলেননি যে, "আমি সিংহাসনে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে সিংহাসনে নিয়ে চলো। বলছেন যে, তারা বড়লোক, বড়লোকই থাকবে কিন্তু তোমরা গরিব শোষিত হয়ে যেও না তোমরা এক হও। তোমরা এক হলে ... তাঁরা (জমিদার জোতদারেরা) বাধ্য হয়ে যাবে। তারা কি নিজে চাষ করতে পারবে? পারবে না। কাজেই তোমাদের হক পূর্ণ হবে।" ফলে অশ্বিনী দাস যখন বলেন, "ইলা মিত্র জীবিত আছেন, আর উনার নাম হাজার হাজার বার আমরা নিচ্ছি। আমাদের বরাত কি হবে জানি না। তবে, ইলা মিত্র মুছে যাবেন না।" তখন তা সত্যি বলেই মনে হয়। আর মুছে যে যাননি তার প্রমাণ

পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালে তেভাগা আন্দোলনের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে ইলা মিত্রের আগমনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, তথা নাচোলে যে সাড়া পড়েছিল তা দেখে। ইলা মিত্রের বক্তৃতা শুনবার জন্য লক্ষাধিক লোকের জনসমাবেশ হয়েছিল নাচোলে।

উপসংহার

নাচোল এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তার পেছনে ছিল পার্টি সংগঠকদের অনেকগুলো বছরের দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শ্রম। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় এবং অর্জিত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক শক্তির ভার অনুযায়ী কর্মসূচি হাতে নেয়ার দীর্ঘ সময় ধরে তাদের অগ্রযাত্রা ছিল মোটামুটি সাবলীল। বিশেষত সাঁওতালসহ আদিবাসীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাদের একক সংঠন।

কিন্তু পুলিশহত্যার মতো একটি হঠকারী সিদ্ধান্ত তাদের এত বছরের শ্রমে গড়া সংগঠনকে একেবারে বিনষ্ট করে দেয়। আমরা জানি যে ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে রনদীভে নির্দেশিত পথ অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশে অনতিবিলম্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ একই সাথে সমাধা করার লাইন গৃহীত হয় এবং ঐ সময় আলাদা সত্তা হিসেবে আবির্ভূত নিখিল পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও একই লাইন গ্রহণ করে। আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রাম সংঘটিত করার কথা না ভেবে, কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই গৃহীত ঐ পদক্ষেপ যে অতি-বাম ঝোঁকের স্মারক ছিল তা আজকে সুপ্রমাণিত। আর ঐ অতি-বাম ঝোঁকের স্মারক হিসেবে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সামনে আনা হয়েছিল 'দালালদের' হালাল করা লাইন। নাচোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, আন্দোলনে তৎপর কৃষকদের অনুসন্ধানে পুলিশ গ্রামে এসে যখন টাকা-পয়সা আদায়ের মাধ্যমে নতুন ধরনের শোষণ শুরু করল, তখন পুলিশকে প্রতিরোধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পুলিশদেরকেও 'দালাল' হিসেবে নামাঙ্কিত করে শ্লোগান ওঠে, "দালালকে হালাল করো।" আর তার পরপরই আমরা দেখেছি পাঁচই জানুয়ারির পুলিশ হত্যার ঘটনা সংঘটিত হতে। এই যদি হয় সমগ্র ঘটনাটির একটা সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ন, তাহলে বলতে হবে যে, ঐ পুলিশ হত্যার সিদ্ধান্তের পেছনে যে হঠকারিতা, তার জন্য স্থানীয় নেতৃত্ব যতখানি দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী হচ্ছে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং তাদের প্রদত্ত হঠকারী লাইন। আঞ্চলিক নেতৃত্ব কেবল এতখানি দায়ী যে তারা কেন্দ্রপ্রদত্ত পার্টি লাইনকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করেছেন।

পুলিশ হত্যার পরে নাচোল এলাকায় সরকারি বাহিনীর যে প্রচণ্ড ও বীভৎস নির্যাতন নেমে আসে, তা থেকে মনে হয় যে তদানীন্তন সরকার সংগ্রামমুখর আদিবাসী সম্প্রদায়কে দেশ থেকে বিতাড়নের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছিল। টংক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়মনসিংহেও অনুসরণ করা হয়েছিল একই নীতি। সম্ভবত

এই নীতিরই একটি বর্ধিত রূপ হচ্ছে ১৯৭১ সালের মার্চের কালো দিনগুলোর হত্যাকাণ্ডের পরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক হিন্দু এলাকাগুলোর ওপর আক্রমণকে অনেকটা কেন্দ্রীভূত করা। অর্থাৎ সংগ্রামমুখর অধিবাসী এলাকায় প্রচণ্ড নির্যাতন পরিচালনার মাধ্যমে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করার বিষয়টি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর নগ্ন সাম্প্রদায়িক চরিত্রেরই আর একটি প্রকাশ মাত্র।

কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির বিনির্মাণ সম্ভব হলেও অনেক সময় সেই ব্যক্তি যে ঘটনাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারেন, ইলা মিত্রের কিংবদন্তীতে পরিণত হবার ঘটনা সে স্বাক্ষরই বহন করে। অনেকের কাছেই নাচোল বিদ্রোহের ঘটনা বর্তমানে প্রায় অজানা হলেও, সমাজবদলের সচেতন কর্মীমাত্রেই ইলা মিত্রের নামের সাথে পরিচিত। বস্তুত নাচোল বিদ্রোহের পরিচিতি আজ অনেকটা ইলা মিত্রের পরিচিতির সূত্রেই গড়ে উঠেছে। গল্পে, কথায়, কবিতায়, ছড়ায়, উপকথায়, পত্রিকার প্রতিবেদনে ইলা মিত্রের সাহসী, সংগ্রামী ভূমিকা এত বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন উপমায়, তুলনায় উপস্থাপিত হয়েছে, যা একজন ব্যক্তির জীবদ্দশায় নিঃসন্দেহে এক বিরাট প্রাপ্তি। একটি অনগ্রসর সময়ের মেয়ে হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত হওয়া; এছাড়া তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতা, সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা এবং জেলে নির্যাতিত হবার ঘটনা, অদম্য মনোবল ও সাহসিকতার সাথে সেই নির্যাতনের বৃত্তান্ত জনসমক্ষে তুলে ধরার ফলেই সম্ভবত আন্দোলনের অন্যান্য নেতাকর্মীদের ছাপিয়ে জনমনে ইলা মিত্রের ভূমিকা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সব মিলিয়ে একটি আন্দোলন সংগঠনের পেছনে জনসমাবেশ ও সমর্থন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় 'ক্যারিশমেটিক' নেতৃত্বের ভূমিকাটিও এ ক্ষেত্রে তিনিই পালন করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও নারীসমাজ

রোকেয়া কবীর

ব্রিটিশ শাসকদের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের ভিতর দিয়ে যে পাকিস্তানের পত্তন ঘটল ১৯৪৭-এ, তা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য লাভজনক হলেও পুরো পাকিস্তানের অধিবাসীদের জন্য সমানভাবে শুভ হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী পূর্বাংশ ও এর জনগণ প্রতীকার্থে মাথা নয়, বুক নয়, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে বরাবর পেতে থাকলো ইলিশের লেজটি এবং কখনো বা লেজও নয়, কেবল লেজের কাঁটাটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে হীন মেয়েসন্তান ছেলেসন্তানের কাছে যেমনভাবে বঞ্চিত হয়, পশ্চিমাংশের কাছে পূর্বাংশও তেমনিভাবে বঞ্চিত হতে থাকল। আর তা এই উদাহরণের মতো কেবল খাদ্যাভ্যাসে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হল সব দিকে। তা সে বচনাভ্যাস, শিক্ষাভ্যাস, স্বাস্থ্যাভ্যাস, বিচরণাভ্যাস যাই হোক না কেন। সকল অধিবাসীর জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্বেরই অন্তর্গত। কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় সুবিধা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বহাল রইল পশ্চিমাংশের জন্য। আর পূর্বাংশ হয়ে রইল মেয়েশিশুটিরই মতো ব্রাত্য ও বঞ্চিত।

নানা অজুহাতে একের পর এক দমননীতি, নিপীড়ন চলতে থাকল বাঙালিদের ওপর। ধর্মভিত্তিক দেশবিভাজনের কারণে হিন্দু অধিবাসীদের অনেকেই সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যায়। ফলে এখানকার স্কুল কলেজগুলোতে সঙ্গত কারণেই ছাত্রী সংখ্যা কমে আসে। এ অবস্থায় মুসলিম পরিবারের মেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠানোর বিষয়ে প্রণোদিত না করে শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে কাজে লাগিয়ে নারীদেরকে শুধুমাত্র মা ও গৃহিণী হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষানীতি জারি করে। জারিকৃত নারীশিক্ষা সংকোচনের এই নীতির প্রতিবাদে প্রায় ৫০০ ছাত্রীর মিছিল নেমে আসে রাস্তায়।

ধর্মভিত্তিক দেশবিভাজনের সবচেয়ে বেদনাকর ফল ফলে ৫০-এ সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনায়। মানবিক বোধসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষের কাছেই এ সময় উপলব্ধ হয় যে, দেশবিভাগের ফলাফল যে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা এ জাতির জন্য বিষফোঁড়ায় রূপান্তরিত হবে। শান্তির বাণী নিয়ে তখন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও দাঙ্গাক্ষুব্ধ মানুষের রক্তস্রোত টপকে যান, বেঁচে থাকাদের বাঁচাতে। শুধু নিজেদের এলাকা নয়, ঘুরে ঘুরে দূর অঞ্চলে নারীরাও সম্প্রীতির বাণী পৌঁছেছেন মানুষের কাছে।

বাঙালির অস্তিত্বের ওপর সবচেয়ে বড়ো আঘাতটি ওরা হানতে চাইল তার মুখের ভাষাটি কেড়ে নিয়ে। মাতৃভাষা যেন এমনই কোনো উপরি উপরি চেপে থাকা অনুষঙ্গ যে চাইলেই তা সরিয়ে অন্য কোনো ভাষা সেখানে চাপিয়ে দেয়া যায়। ৫২-এর অনেক আগে থেকেই তারা বাঙালির মাতৃভাষা নিয়ে চক্রান্ত শুরু করে। মানি অর্ডার ফরম, ডাক টিকিট, টাকা ইত্যাদিতে বাংলার বদলে ব্যবহৃত হতে থাকে উর্দু ও ইংরেজি। বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা দেবার পশ্চিমাদের এই অন্যায় চাওয়াটিরই ছাপ বহন করে এসব ঘটনা। ক্ষমতার দাপটে ওরা এই অসম্ভবকেই যখন সম্ভব করতে উঠে পড়ে লাগে, তখন বাঙালি তার অস্তিত্বের সঙ্কট অনুভব করে। কারণ মাতৃভাষা কোনো জাতির অস্তিত্বের সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, তা আলাদা করে ফেলতে চাওয়াটা রীতিমতো হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা। আর সেটা কোনোভাবে কোনো জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হলে সে জাতির উত্থান নানদিক থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। তাদের এই চাওয়াটির নেপথ্যে বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবার এমন এক দুরভিসন্ধিই কাজ করেছে। ফলে বাঙালিরা পশ্চিমা শাসকদের কখনোই আপন ভাবতে পারেনি। শত্রুকে শত্রু ভাবার মতো প্রজ্ঞা বাঙালির ছিল; সুতরাং এই দুরভিসন্ধির বিপরীতে শিক্ষিত বাঙালির চৈতন্যে জেগে ওঠে প্রতিরোধের মানসিকতা। এই মানসিকতাই তাদেরকে প্রতিবাদে মুখর করে, তাদের পথে নামিয়ে আনে। ঝরে রক্ত। আর এই রক্তদানই প্রতিহত করতে সক্ষম হয় পশ্চিমাদের মাতৃভাষাজনিত অসদাকাঙ্ক্ষা। যদিও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারীগণের মধ্যে কেউ শহীদ হননি, কিন্তু আগাগোড়াই তারা সাহসী ভূমিকায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এ আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পথে নেমে নারীদের অনেকেই মারাত্মকভাবে আহত হন।

১৯৫৪-এ অনুষ্ঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য ব্যাপকসংখ্যক নারী সক্রিয় হন। নারীদের এহেন তৎপরতা ফ্রন্টের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচিতদের মধ্যে ৩ জন সংখ্যালঘু প্রতিনিধিসহ ১৪ জন নারী আইনসভার সভ্য হবারও গৌরব অর্জন করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ৯২-ক ধারাবলে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে পাক সরকার শুরু করে দেয় ব্যাপক ধরপাকড়। সভা-সমিতি-শোভাযাত্রা, গান-বাজনা-নাচ ইত্যাদির সাথে সাথে মেয়েদের কপালে টিপ পরার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এদিকে ওলেমা বোর্ড নারী অধিকার বিষয়ে করে বিরূপ মন্তব্য।

বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরীর বক্তব্যে তার প্রমাণ মিলবে। তিনি

জানিয়েছেন, '১৯৫৪ সালে লাহোরে আপওয়া সম্মেলনে আমি সিলেটের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেই। এই সম্মেলনেই বুঝতে পেরেছিলাম বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের মনোভঙ্গি কতটুকু বিরূপ।'

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়। নিষিদ্ধ হয় সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ অবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে ওঠে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারী শাসক ও তার শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে তৎপর হন। স্বৈরাচারী শাসনামলে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলনে নারীরা উজ্জ্বল অবদান রাখে।

পাক শাসনের বিরুদ্ধে লাগাতার অসন্তোষ ৬৯-এ এসে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে সংঘটিত হয় ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। শেখ মুজিবের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা বাস্তবায়নের আন্দোলনই পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থানে। এ অভ্যুত্থান পাক শাসকদের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। এতে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। ১৯ মার্চ যে কারণে ছাত্রী মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। ২০ মার্চ শহীদ হন আসাদ। আর এর প্রতিবাদে সারাদেশে যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, তাতেও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক।

৭০-এ অনুষ্ঠিত গণভোটে বাঙালি শেখ মুজিবের পক্ষে ব্যাপক সাড়া প্রদান করে। ফলে জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে জেতে আওয়ামী লীগ। কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে পাকিস্তানিরা। জনমত শেখ মুজিবের পক্ষে থাকার পরও যখন ওরা ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃত হয়, তখন সারাদেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একের পর এক দু পক্ষের বৈঠক হয়; কিন্তু হয় না কোনোই ইতিবাচক ফলোদয়। আসলে এ সময়ক্ষেপণের ভেতর দিয়ে বাঙালির ওপর বড়ো ধরনের আঘাতেরই প্রস্তুতি নিতে থাকে পশ্চিমারা। শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করবার এ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে দেয়। প্রতিবাদ চলতে থাকে সারাদেশে।

৭ মার্চ শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে তার ঐতিহাসিক ভাষণে পাকদের বিরুদ্ধে যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুকে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। ঘোষণা দেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ মুজিবের প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলবার আহ্বানে নারীসমাজ অভূতপূর্ব সাড়া প্রদান করে এবং দেশমুক্তির আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়।

সারা মার্চব্যাপী চলতে থাকে পাকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন। জেলায় জেলায় লোকজন নেমে আসে রাস্তায়। পাক শাসন ও বর্বরতার প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদেরও উজ্জ্বল অংশগ্রহণ ছিল। অন্যদিকে পশ্চিমারাও তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে আনে এবং ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর রাতের আঁধারে মারণ আঘাত হেনে পূর্ব পাকিস্তানে তাজা রক্তের স্রোত বইয়ে দেয়। বাঙালি বুঝতে পারে সময় এসে গেছে ওদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবার।

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব

প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার প্রয়োজন অনুভূত হলেও আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে পেরে ওঠাটা খুব সহজসাধ্য ছিল না। ওদের সঙ্গে লড়তে হলে যে-পরিমাণ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা দরকার, সে পরিমাণ যোদ্ধা আমাদের ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশপ্রেম ও গায়ের জোর অচল। সেখানে অস্ত্রের বিপরীতে প্রয়োজন অস্ত্রের এবং অস্ত্রচালনা কৌশলের। ধার দেনা করে অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও সে অস্ত্রের ব্যবহার রপ্ত করতে না পারলে, লক্ষ অব্যর্থ না হলে, অন্য দেশ থেকে পাওয়া অস্ত্রের পাহাড় জমে উঠলেও বাঙালির পরাজয়ই সুনিশ্চিত হয়ে থাকত। যে-সীমিত সংখ্যক বাঙালি সেনা-নৌ-বিমান-ইপিআর ও পুলিশবাহিনী পূর্বাহ্নেই এই যুদ্ধকৌশলের সাথে সম্যক পরিচিত ছিল, কেবল তাদের করা যুদ্ধে বাঙালির মুক্তি অসম্ভব ছিল। এ যুদ্ধ ছিল সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সংঘটিত এক জনযুদ্ধ। আর তাই বেসামরিক লোকজনকেও সরাসরি যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

যার যা আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াবার বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে পারাটা বাঙালির মুক্তি আনায়নে বড়ো ধরনের ভূমিকা' রেখেছে। তাই বলে প্রকৃতই অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তাটি মুহূর্তের জন্যও লোপ পায়নি। স্বাধীনতাকামী বাঙালির বড়ো একটি অংশ সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বলেই যার যা আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ানোটা ফলপ্রদ হয়েছে। অন্যথায় কেবল রক্তক্ষয়ই সার হত। আর এ কারণেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাত্তরের মার্চের শুরু থেকেই আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হতে থাকে। যেহেতু তরুণ প্রজন্মের মধ্যেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সর্বাপেক্ষা প্রবল এবং তরুণ প্রজন্মই যেহেতু যোদ্ধা হিসেবে সবচাইতে উপযোগী, ফলে ঢাকাসহ সারাদেশের অসংখ্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সামরিক সদস্য/কর্মকর্তা, পাক সীমান্ত থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি সেনা সদস্য/কর্মকর্তা, বাঙালি সিভিল সার্জন/ডাক্তার, সক্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখ। ভারত সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো যেহেতু প্রকাশ্যে পরিচালিত হতে প্যারত এবং প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে একটি অস্ত্র পাবার নিশ্চয়তাটিও যেহেতু ছিল; তাই দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে হাজির হতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেরা যোদ্ধা হিসেবে তৈরি হয়ে ওঠে। দেশের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে অসীম সাহসে বলীয়ান হয়ে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষিত সদস্যরা যখন পুনরায় দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে, তখনই বাঙালির স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যায়।

সারাদেশে এবং দেশের বাইরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সর্বমোট কতটি ছিল সে সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিত

হলেও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা অসংখ্যই ছিল। দেশের অভ্যন্তরে অজস্র স্কুল-কলেজ, পরিত্যক্ত বাড়ি, কখনো বা নিজেদের থাকবার ঘরই গোপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভারতের প্রশিক্ষণ নানা কারণে সবার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারো কারো স্থানীয় প্রশিক্ষণই ছিল একমাত্র ভরসা। ফলে এ ধরনের প্রশিক্ষণও গোটা যুদ্ধপ্রক্রিয়ার সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে প্রায় সবগুলোই ছিল পুরুষ যুদ্ধার্থীদের জন্য, কোনো কোনোটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এবং খুব কম কেন্দ্রই ছিল কেবল নারীদের জন্য। নারীদের জন্য যেসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা হয়েছিল সেগুলো হল—ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের প্রশিক্ষণ, মরিচা হাউজের প্রশিক্ষণ, ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের পাশের বাড়িতে আয়োজিত আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ, ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলের প্রশিক্ষণ। ঢাকার বাইরে প্রস্তুতি পর্বের যেসব প্রশিক্ষণের কথা জানা যায় সেগুলো হল পিরোজপুরে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, যশোরে ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াস গ্রুপের প্রশিক্ষণ, দর্শনা গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত প্রশিক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পরিচালিত গোবরা ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ, লেম্বুছড়া ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ, উইমেন্স কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ, সূর্যমণি নগর ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ, মেজর জিয়াউদ্দিন বাহিনীর প্রশিক্ষণ, মেজর জলিল নারীবাহিনীর প্রশিক্ষণ, সিরাজ সিকদার বাহিনীর প্রশিক্ষণ, পটুয়াখালী মহিলা কলেজের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

ছাত্র ইউনিয়নই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউওটিসি মাঠে অস্ত্র প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। সিদ্ধান্ত মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেট কোরের রুম থেকে এবং আরমানিটোলা স্কুলের তালা ভেঙে বস্তায় ভরে ডামি রাইফেল নিয়ে আসা হয়। এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল কাশেম মিয়া ও মুনীরুজ্জামান। নারীদের ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন রোকেয়া কবীর। ফিজিক্যাল ফিটনেস, মার্চ-পাস্ট, অস্ত্রচালনা, ফার্স্ট এইড, ব্যারিকেড তৈরি, ট্রেঞ্চ করা এবং আত্মরক্ষা প্রভৃতি ছিল এ প্রশিক্ষণসূচির অন্তর্গত। প্রশিক্ষণটি ১৯ মার্চ পর্যন্ত চলে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়ে পরবর্তী সময়ে ডামি রাইফেল সহযোগে একটি মার্চপাস্টের আয়োজন করা হয়। মার্চপাস্টটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কার্জন হল, প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, জিপিও, জিন্নাহ এভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) হয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত আসে। এই মার্চপাস্ট সকল স্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেসিয়ামে, তৎকালীন ইকবাল হলের মাঠে এবং কলাভবনের সামনে গাদা বন্দুক হাতে ছাত্রলীগের কর্মীরা যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে, সে প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সামরিক বাহিনীর দুজন সদস্য পেয়ারু ও দুদু। মার্চের শুরু থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত চলে এই প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণার্থীগণ ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানের কুচকাওয়াজ শেষে মার্চপাস্ট করে এসে বঙ্গবন্ধুর বাসায় তাঁর হাতে বাংলাদেশের পতাকা অর্পণ করেন। এ কেন্দ্রে কিছু নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে সাজেদা চৌধুরীর কলাবাগানের বাসা 'মরিচা হাইজ'-এর সামনে মিসেস টি.এন. রশিদের পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে নার্সিং ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেয়া হত। এই প্রশিক্ষণটি চলে ২২ মার্চ পর্যন্ত। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ডামি রাইফেল হাতে করে ২৩ মার্চ তারিখে মার্চপাস্ট করে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে যান এবং বঙ্গবন্ধুর হাতে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা হস্তান্তর করেন।

ঢাকায় মেয়েদের আরেকটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বেবী মওদুদের তত্ত্বাবধানে। এটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেবী মওদুদের উদ্যোগে ধানমন্ডিতে একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে বেবী মওদুদ ছাড়াও মাসুদা মতিনসহ আরো কয়েকজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁরা ঘরে ঘরে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে বর্তমান সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের পাশের একটি বাড়িতে জমায়েত করেন। এ প্রশিক্ষণটি চলে ১৮ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। এ কেন্দ্রে ২০/২৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন ডাঃ মাখদুমা নার্গিস রত্নার কাছে। এখানে প্রশিক্ষণের বিষয় হিসেবে আত্মরক্ষা এবং ফার্স্টএইড অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মার্চে ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলেও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটির আয়োজন করেছিল ধানমন্ডির বিভিন্ন ব্লকের তরুণ ছেলেরা। এখানে প্রশিক্ষণ দেন তরু নামের একজন প্রশিক্ষক। হোসনে আরা ইসলাম ধানমন্ডি থেকে এবং নুরুননাহার ফয়জুননেসা নীলক্ষেত থেকে আরো অনেক মেয়েকে এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিয়ে আসতেন বলে জানা যায়। এখান থেকে প্রায়শই তাঁরা রাতে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত ছায়ানটের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেতেন।

ঢাকার বাইরে পিরোজপুর, যশোর, দর্শনা প্রভৃতি স্থানেও রাইফেল চালনা, গ্রেনেড ছোঁড়া, ক্রলিং করা, ক্যামোফ্ল্যাজ করা, ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়ার পদ্ধতি, যুদ্ধাহতদের সরিয়ে আনা, প্রাথমিক চিকিৎসা, আত্মরক্ষা ও অ্যাম্বুশ করা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এসব ছাড়াও ঢাকা শহরে ছাত্র ইউনিয়ন এবং মহিলা পরিষদের কর্মীগণ বিভিন্ন এলাকার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কিশোরী-যুবতী ও বয়স্ক মহিলাদের সংগঠিত করেছেন এবং প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আত্মরক্ষা, ফার্স্টএইড, ফিজিক্যাল ফিটনেস, মার্চপাস্ট, ট্রেঞ্চ করা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যে সমস্ত পরিবারের মেয়েরা নিরাপত্তাজনিত ও অন্যবিধ কারণে বাইরে বেরিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি, কিংবা পারিবারিক বাধা থাকার কারণে যাঁদের পক্ষে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোথাও গিয়ে প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি, পাড়ায় পাড়ায় প্রশিক্ষণ দেবার এ কর্মসূচিটি তাঁদেরকেও যুদ্ধের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ব্যাপকহারে নারীগণ প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছেন। সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নন এমন কেউই প্রথম দিকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা ভাবেননি; কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর রাজনীতির সাথে কোনোই সংস্পর্শ নেই এমন নারীদেরও প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। এঁরা সবাই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছেন তা নয়। কিছু একটা করার তাগিদে ও সচেতন শ্রেণীর অব্যাহত প্রণোদনা, এই দুয়ে মিলে সচেতনতা সৃষ্টির ফলেই তাঁরা প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। কেউ কেউ নিজের জন্য একটি নিরাপদ অবস্থান খুঁজে নেবার প্রয়োজনেও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

মে মাস থেকে কলকাতার পদ্মপুকুর আর পার্ক সার্কাসের মধ্যবর্তী তিলজলা এলাকায় কেবল নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গোবরা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন সাজেদা চৌধুরী। এ প্রশিক্ষণটির অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ প্রভৃতি। এখানে সিভিল ডিফেন্সসহ সশস্ত্র সংগ্রাম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে করা হয়ে থাকলেও প্রধানত নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্যই এ কেন্দ্রটি অধিকতর ব্যবহৃত হত। একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যত সংখ্যক নারীকে মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল, চাহিদা অনুযায়ী ততটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সরকারি উদ্যোগে নারীদের জন্য গঠিত এই একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে কাজেই প্রধানত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ লাল, ডাঃ ব্রহ্মচারী (নার্সিং ও ফার্স্টএইড), মীরা দেবী (যোগব্যায়াম), ক্যাপ্টেন এস. এম. তারেক (অস্ত্র), সেবা চৌধুরী ও শিপ্রা সরকার (ইতিহাস)। প্রথম দুটি ব্যাচে এখানে ১৬ জন করে ৩২ জন (সম্ভবত) নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন হাসপাতালে ও ফ্রন্টে সেবা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হন। তৃতীয় ব্যাচে আরো ১৬ জন নারী প্রশিক্ষণ নিলেও তাঁদের প্রশিক্ষণ শেষ করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত হবার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। গোবরা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা সর্বমোট কত ছিল এ ব্যাপারে ভিন্নমত লক্ষ করা যায়। কারো কারো মতে এ সংখ্যা একশোর কম, কারো মতে ৪০০। তবে নানা উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের যাচাই-বাছাই করে দেড়শতাধিক নারীর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে একমত হওয়া গেছে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে এ সংখ্যা অনধিক ১৫৭। এ সংখ্যাটিও কেবল প্রশিক্ষিতদের নয়। এর মধ্যেই রয়ে গেছেন তালিকাভুক্ত কিন্তু প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়নি যাঁদের তাঁরা এবং প্রশিক্ষক, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

গোবরায় প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জাতীয় সঙ্গীত গীত হত। সকালে পিটি-প্যারেড এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা, কোনো-কোনোদিন রাত পর্যন্ত ক্লাস হত। ক্লাসে মূল বিষয়ের বাইরেও দেশ, রাজনীতি, ইতিহাস, সংগ্রামী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনালোচনা, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হত। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য যেতে হত নিকটস্থ হাসপাতালে।

গোবরা ক্যাম্প মহিলাদের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হলেও পরবর্তী সময়ে ভারতের লেম্বুছড়া ক্যাম্পেও বেশকিছু নারীযোদ্ধা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। লেম্বুছড়া ক্যাম্পে প্রধানত পুরুষরাই প্রশিক্ষণ পেত। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ লক্ষ করে এখানেও আগ্রহী মেয়েদের প্রশিক্ষণ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে গেরিলা ও সুইসাইড স্কোয়াডের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এখানে দুজন প্রশিক্ষক কারাতে, আধুনিক অস্ত্র চেনা, অস্ত্র পরিচালনা ও ধ্বংস করার কলাকৌশল, শত্রুপক্ষকে ডিটেক্ট করা, শত্রুদের ব্যবহৃত কোড বুঝতে পারা, গ্রেনেডের ডেটনেটর দাঁত দিয়ে খোলা ও ছোঁড়া, সামরিক আয়োজনের পরিমাপ করা এবং শত্রুদের আক্রমণ করার কৌশল শিক্ষা দেন।

ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অনেক নারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রজীবন শেষ করে মহিলা পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের সিংহভাগই ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন তথা প্রগতিশীল ও বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, কৃষক সমিতির যৌথ পরিচালনায় গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং তাদের প্রভাব বলয়ের জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের সমর্থন আদায়ে মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সারা ভারতে জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করার বিষয়টিতেও এই নেতৃত্বের অবদান সিংহভাগ। এই বামপন্থীদের মূল কেন্দ্র তখন ছিল আগরতলায়। এখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীনেত্রী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বের নারী আন্দোলনের সমর্থন আদায়, ভারতব্যাপী জনগণের সমর্থন সংগ্রহের জন্য জনসভায় যোগদান, বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্প ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ, বিভিন্ন গেরিলাযুদ্ধে যোগদানকারীদের রাজনৈতিক ওরিয়েন্টেশন প্রদান, বিভিন্ন ক্যাম্পে স্কুল পরিচালনা, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও নার্সিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিবিষ্ট ছিলেন।

'উইমেন্স কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, যার আওতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপর হবার জন্য নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এ সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন রেণুকা দেবী এবং সেক্টর ইনচার্জ ছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী। বাংলাদেশের পক্ষে এ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন সাজেদা চৌধুরী। আর প্রশিক্ষক ছিলেন 'খাতুনদি' নামে পরিচিত ডাঃ লুৎফুন্নেসা খাতুন। কেন্দ্রটি ৪০ জন করে একাধিক ব্যাচে নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এর কার্যক্রম চালানো হত। সংগঠনটি তাদের ব্যবহারিক ক্লাস করত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে।

মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে সুন্দরবনের শরণখোলায় নারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভোলা নদীর ওপারে এটি ছিল সুন্দরবনের একটি মুক্ত এলাকা। মেজর জিয়াউদ্দিন ছাড়াও এখানে প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতীয় আর্মির ক্যাপ্টেন পরিতোষ বাবু।

নবম সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের সদর দফতর ছিল পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট মহকুমার টাকিতে। মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এখানে একটি ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা

করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে এখানে একটি 'নারীবাহিনী' গড়ে ওঠে। বাহিনীর অধিকাংশ নারীই ছিলেন ছাত্রী। এই ক্যাম্পটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রমা। বীথিকা বিশ্বাস এ দলের জন্য নারীযোদ্ধা সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এগুলোর বাইরেও সারাদেশে এবং দেশের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। সেখানে দলীয় এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক নারীযোদ্ধা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং স্ব স্ব কর্মস্থলে উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন কিংবা অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের বিস্তৃতি

'ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।'—মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবল এই স্বীকৃতিটুকুই উচ্চারিত হত। সুতরাং যোদ্ধা নারীগণও তাঁদের নিজেদের বীরত্বের কথা বলতে আগ্রহী হননি। কারণ তাতে সমাজমানসে এই ধারণাটিরই সঞ্চার করা হত যে, ইনিও কথিত দুই লক্ষেরই একজন। পরবর্তী সময়ে যখন বিভিন্ন সেক্টরে নারীর অবদান মূল্যায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখনও মুক্তিযুদ্ধে নারীকে পুরুষের সহযোগী হিসেবে দেখানো হতে থাকে মাত্র। পুরুষ সহযোদ্ধাগণও এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন নীরবতাকেই শ্রেয়জ্ঞান করতে থাকেন, কিভাবে নিজেরা যোদ্ধা হিসেবে আরো বিজ্ঞাপিত হবেন আর তার বিনিময়ে সুবিধাপ্রাপ্ত হতে পারবেন, সে চেষ্টাই তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। আর ইতিহাস প্রণেতাগণও মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য আহরণ না করে পূর্বোক্ত খণ্ডিত ও অসত্য তথ্য সম্বলিত কাগজপত্রকেই ইতিহাসোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। এই প্রক্রিয়াও দীর্ঘদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। মাত্র নব্বইয়ের দশকে এসে যখন নারী সংগঠনের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা নারীদের সামনে নিয়ে আসা শুরু হয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলো উৎসাহিত করা হয়, তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যোদ্ধা হিসেবে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখা নারী বীরপ্রতীকের সন্ধান লাভ সম্ভব হয়। এসময় থেকেই মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে লেখালেখি শুরু হয় এবং আবিষ্কৃত হতে থাকেন একের পর এক যোদ্ধা নারী। এঁদের অবদানকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল দুটি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধই ছিল না। এর ব্যাপ্তি ছিল সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় সমর্থন পর্যন্ত প্রসারিত। শেকড় প্রোথিত ছিল কিছু মূল্যবোধ বা চেতনায়। ফলে 'মুক্তিযোদ্ধা' বা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ শুধু 'সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর প্রচার মাধ্যমে এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়ে একটি ভ্রান্ত আগ্রহের সৃষ্টি করে, যার ফলে ইতিহাস তৈরির প্রক্রিয়ায় ব্যাপক জনগণের ভূমিকা বাদ পড়ে যায়। সেই সঙ্গে বাদ পড়ে যায় নারীর ভূমিকা। এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক চেতনার ফলে মুক্তিযুদ্ধে যে মেয়েটি

ধর্ষিতা হল, তাকে মুক্তিযুদ্ধে শারীরিকভাবে নির্যাতিত একটি পুরুষের মতো ভাবা হয় না। ধর্ষিতা হিসেবে সমাজে অপাংক্তেয় করে দেয়ার এ প্রক্রিয়াটিও আমরা রুখে দিতে পারিনি। এই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফলে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনে যে মেয়েটি খাদ্যসংগ্রহ, রান্নাবান্না, আহত মুক্তিযোদ্ধার নার্সিং, ওষুধ সংগ্রহ, খবর সংগ্রহ, অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজ করল, সেই কাজ স্বীকৃতি পেল না মুক্তিযুদ্ধের কাজ হিসেবে। কিন্তু একই কাজ একটি ছেলে করলে হয়ে যেত মুক্তিযুদ্ধের কাজ।

সরকারিভাবে নারীযোদ্ধা অনুসন্ধানের প্রয়াস নানা কারণেই অনুপস্থিত ছিল এবং এখনও আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে দীর্ঘদিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায় না থাকায় এ প্রক্রিয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। নব্বইয়ের দশকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসলেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন হওয়ায় তাদের দ্বারাও এ ধরনের কোনো উদ্যোগ গৃহীত হবার কথা শোনা যায়নি। তবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও সরকারিভাবে বাংলা একাডেমী মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে নারীযোদ্ধা অনুসন্ধানের যা কিছু অর্জন তা ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগেরই ফল। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ও বেসরকারি অনুসন্ধান প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে কর্মরত সংগঠন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) নারীযোদ্ধা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্যতম। দীর্ঘদিন থেকে এই সংগঠন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখা নারীদের কীর্তিগাথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। সংগ্রামী নারীদের একাধিকবার সংবর্ধিত করেছে। বাংলা একাডেমীর সহযোগিতায় সংগঠনটি 'মুক্তিযুদ্ধে নারী' শীর্ষক একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও সমাপ্ত করেছে। এ নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের অবদান বিষয়ে সংগঠনটির দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যাদিরই সারাংশ উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের নারীসমাজ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষ-যোদ্ধাদের মতোই যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরে কর্মরত ছিল। সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে শুরু করে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন পর্যন্ত সবধরনের কাজেই তাদের অবদান ছিল। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে আরো যেসব অবদান নারীরা রেখেছেন, তার কোনোটিকেই গৌণ করে দেখবার অবকাশ নেই।

যুদ্ধে প্রণোদনা দান, পরামর্শ প্রদান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপকভাবে যোদ্ধাদের সংগঠিত করায় নারীরা সক্রিয় ছিলেন একাত্তরে। এ কাজে প্রধানত পুরুষগণই ব্যাপকভাবে তৎপর থাকলেও এ সংক্রান্ত যে দুয়েকটি দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসন্ধানে মিলেছে, তার মূল্যও কম নয়। যুদ্ধে পরামর্শ ও প্রণোদনা দানের কাজটিতে দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানসিকতাসম্পন্ন প্রায় প্রতি ঘরেই নারীরা যুক্ত

হন। আর যোদ্ধাদের সংগঠিতকরণে শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন নারীগণ ছিলেন অক্লান্ত। কেবল নারীদের মধ্যে নন, সংগঠিতকরণের কাজে নারীগণ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যেই কাজ করেন। এর অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু সিদ্ধান্তগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নারীদের যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল কম, কাজেই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ তাদের ক্ষেত্রে কমই ঘটেছে। ফলে এর দৃষ্টান্তও বিরল।

যুদ্ধে প্রণোদনা দান ও যোদ্ধাদের সংগঠিতকরণের এই কাজটি সভা-সমাবেশে বক্তৃতা, পারস্পরিক কথোপকথন, ব্যক্তিত্বের সম্মোহন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও করা হয়েছে। এ কাজে সারাদেশেই অসংখ্য নারী সক্রিয় হয়েছিলেন। দেশের ভেতরে এ ধরনের আয়োজন যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন দেশের বাইরে ভারতের মাটিতে শরণার্থীদের মধ্যেও পরিচালনা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতারসহ অন্যান্য একাধিক সংগঠনের মাধ্যমে এসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলো হল—মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, তুলি-কলম-কণ্ঠ প্রভৃতি। এসব সংগঠন কেবল উদ্বুদ্ধকরণের কাজটিই করেনি, বরং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থে শরণার্থীদের বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করা, আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসায় সহযোগিতা দান, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে সহযোগিতা প্রভৃতি কাজে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে একে মুক্তিযুদ্ধের 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রায় কোনো স্থির নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকা এই বেতার কেন্দ্রটি যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করত, তা যুদ্ধরতদের প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধের সংবাদ পৌঁছে দিয়ে এবং উদ্দীপনামূলক সুরের ঝঙ্কারে দারুণভাবে প্রাণিত করেছে। যোদ্ধাদের শক্তি ও মনোবল বৃদ্ধিতে এটা টনিকের মতো কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত শাহনাজ বেগমের গাওয়া 'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা, সোনা নয় ততো খাঁটি, বল যতো খাঁটি তারও চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটি' কিংবা কল্যাণী ঘোষের 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল, জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল' প্রভৃতি গান শুনে ভেতরে ভেতরে কে না তাড়িত হয়েছেন তখন?

এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা চট্টগ্রামের যোদ্ধা নারী, পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত কর্মী বেগম মুশতারী শফীর চট্টগ্রামস্থ 'মুশতারী লজ'-এ। একাত্তরের ২৬ মার্চ থেকে যাত্রা শুরু হয়ে মুক্ত মুজিবনগরে এসে স্থায়ী হতে হতে এই বেতারের কর্মীদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। এর মধ্যেও তবু এর কার্যক্রম বন্ধ হয়নি। শুরুর দিকে এর সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত নারীদের মধ্যে আরো ছিলেন ডাঃ মঞ্জুলা আনোয়ার, অধ্যাপক তমজিদা বেগম প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে অসংখ্য নারী এই বেতারের সঙ্গে যুক্ত হন ও নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারে অংশ নেন : এগুলোর মধ্যে কথিকা রচনা ও পাঠ, একক ও সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন, আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়. সংবাদ পাঠ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ও ভারতের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর তৎপরতায় ভারতে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি'র একটি কমিটি গঠিত হয় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে। এই সংগঠনের আগ্রহেই মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা দেবার জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা ভাবা হয়। ১৪৪ লেলিন সরণিতে মহড়া করে পরবর্তী সময়ে এই সংগঠনটি দুদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল কলকাতার রবীন্দ্রসদনে। এই অনুষ্ঠানে 'রূপান্তরের গান' নামে একটি গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। রবীন্দ্রসদনের এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট কুড়ি হাজার টাকা আহৃত হয়। খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সমন্বয়ে (ভারতের শিল্পীদের বাদ দিয়ে) পরবর্তী সময়ে সন্‌জীদা খাতুনকে সভাপতি ও মাহমুদুর রহমান বেনুকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত হয় 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা।' এরপর থেকে এই সংগঠন নিজস্ব ব্যানারেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। গঠিত হবার পর থেকে এই সংস্থা ডিসেম্বর পর্যন্ত অবিরাম তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে। আকাশবাণী এবং স্বাধীন বাংলা বেতারেও এই সংস্থার অনেকেই অংশ নিয়েছেন। একবার একটি অনুষ্ঠান হয় কলামন্দিরের বেসমেন্টে। এই অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও গান গেয়েছিলেন। 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা' কমলা গার্লস স্কুলে একবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুলের প্রিন্সিপাল প্রণতি দে (কবি বিষ্ণু দের স্ত্রী) এই অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতা করেন। শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরেও বিভিন্ন ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে গিয়ে গান গেয়ে আসত এ সংস্থা। এসব গান শুনে মুক্তিসংগ্রামী মানুষ পেত নবতর শক্তি, উদ্দীপনা, প্রেরণা। 'মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা'র সাথে প্রায় ২৫ জন নারী শিল্পী-কুশলী যুক্ত ছিলেন।

সিলেটের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা মিলে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সমস্বর লেখক শিল্পী সংস্থার এক জরুরি বৈঠকে কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭ মার্চ সমস্বর লেখক ও শিল্পী সংস্থার জল্লারপাড়ের কার্যালয়ে ৪০ জন কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে কবি দিলওয়ারকে সভাপতি, সিরাজউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক এবং আরতি ধর ও শামসুন্নাহার করিমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে 'কলম-তুলি-কণ্ঠ সংগ্রাম পরিষদ'-এর কমিটি গঠিত হয়। ঘোষণা অনুযায়ী এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল আন্তঃজেলা শিল্পী কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে বাংলার সংহতি ও গণবিরোধী যে কোনো কাজ প্রতিহত করবার অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সংগঠনটি যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তার মধ্যে ছিল ১৯ মার্চে শহরে বিরাট সাহায্য মিছিল পরিচালনা করা। ২২ মার্চ রেজিস্ট্রারি মাঠে উপচে পড়া দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে কবি দিলওয়ার রচিত 'দুর্জয় বাংলা' শীর্ষক আলেখ্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারীদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও গণমুক্তি শিল্পী সংস্থা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সংস্থা, মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতি, ভ্রাম্যমাণ শিল্পী সংস্থা ও অন্যান্য সংগঠনের ব্যানারেও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নারীদের অনেকেই এসব সংগঠনের কাজ করেছেন।

ঢাকার মীরপুরে কবি মেহেরুন্নেসা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা না করা নিয়ে বিহারিদের সাথে দ্বন্দ্বে 'জয় বাংলা' বলে নিজেদের বাড়ির ওপর বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এরই জের হিসেবে ২৭ মার্চ মাত্র ৩১ বছর বয়সে নির্মমভাবে তাঁকে শহীদী মৃত্যু বরণ করতে হয়। একই সঙ্গে তাঁর পরিবারের সবাইকেই মেরে ফেলে বিহারিরা। মেহেরুন্নেসা ছিলেন একজন সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক কবি। ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকেই তিনি পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে আসছিলেন। তাঁর কলম নিয়োজিত হয়েছিল পাক শাসনের বিরুদ্ধে। একাত্তরের প্রথম দিকে বাংলা একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে তিনি 'জনতা জেগেছে' নামে একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। এই কবিতাটিও তাঁকে পাকবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

ঢাকা শহরের সাংবাদিক সেলিনা পারভীন 'শিলালিপি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এর সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। নিজে তিনি কবিতা ও কলাম লিখতেন। বাম রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যুদ্ধকালে যোদ্ধাদের তিনি তাঁর বাসায় আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁদের খাবার ও ওষুধ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এসব ভূমিকা তাঁকে একজন দেশপ্রেমিক বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ১৩ ডিসেম্বর তারিখে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে রায়েরবাজার ইটাখোলার বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। সাংবাদিকতায় তাঁর মতো আরো অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওতে শামীম রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর যুদ্ধ এলাকা থেকে 'রণাঙ্গন' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে রহিমা সিদ্দিকী জনসংযোগের কাজ করেছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রাণিত করেছিল বাংলার আপামর জনসাধারণকে। নানা বয়েসের, নানা পেশাজীবী শ্রেণীর, নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের ফলেই এটি হয়ে উঠতে পেরেছিল এক সর্বাত্মক জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধে বাঙালির সর্বাত্মক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষে যতটা সংঘটিত হয়েছে, অপ্রত্যক্ষে তার চেয়েও বেশি। এ ধরনের অংশগ্রহণের অর্জন/অনার্জন অবশ্যই অনুল্লেখ্য নয়। কিন্তু দৃশ্যমান বলে প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলোই স্বীকৃত হয়। নারীর ভূমিকা যেহেতু সবসময়েই পরিবারের আড়ালে ঘটে থাকে, তার ভূমিকাও তাই স্বীকৃতি পায়নি।

ধনী পরিবারের নারীদের মতোই দরিদ্র পরিবারের নারীরাও ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের সন্তানের মতো যত্নে খাইয়ে, আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সারাদেশের অসংখ্য পরিবার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ না করলে আমাদের যোদ্ধাদের দ্বারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করা সম্ভব হত না।

কাজেই আশ্রয় ও খাদ্যদানের এসব ঘটনা যোদ্ধাদের কর্তব্যকর্মে সচল রাখবারই নেপথ্য ইন্ধন।

যখন কোনো এলাকায় বড়ো ধরনের অপারেশনের প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধারা সদলে এসে স্থাপন করেছে কোনো অস্থায়ী ক্যাম্প, তখন হয়তো ৫০/১০০ জনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়েছে। একটি পরিবারের পক্ষে এই ৫০/১০০ জনকে সপ্তাহ ধরে খাবার দেয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে তখন কারো ওপর নির্ভর না করে যোদ্ধারা এলাকার প্রত্যেক বাড়ি থেকেই সহযোগিতা নিয়েছেন। কেউ দিয়েছে দুকেজি চাল, কেউ পুকুরের একটি মাছ, কেউ প্রিয় মুরগিটি, কেউবা পিয়াজ-রসুন-আলু। আর এসব আহরিত খাদ্যদ্রব্য চলে গেছে ওখানকারই কোনো সম্পন্ন লোকের বাড়িতে। তখন দিনের পর দিন এতগুলো লোককে রেঁধে খাওয়াবার একটি দায়ও চেপে গেছে ওই বাড়িরই মহিলাদের ওপর।

বস্ত্র মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের একটি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে যোদ্ধাদের অধিকাংশেরই একবস্ত্রে ঘর ছাড়তে হয়েছিল, ঘামে-জলে ভিজে যেটি হয়তো হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ব্যবহারের অনুপযোগী। তদুপরি শীতের প্রকোপ প্রায়-বস্ত্রহীন এসব যোদ্ধাদের কাবু করে ফেলবার জন্য যথেষ্ট ছিল। যোদ্ধাদের ছাড়া উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রিতদেরও প্রয়োজন ছিল গরম বস্ত্রের। এদের মধ্যে শিশুদের প্রয়োজন ছিল আরো বেশি। সম্পন্ন নারীগণ এই প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন। এই উপলব্ধি থেকেই তারা নিজেরা তাদের সাধ্যমতো বস্ত্রদানের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বস্ত্র সংগ্রহ করে যোদ্ধা ও শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছেন।

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো মানুষের আরেক মৌলিক প্রয়োজন চিকিৎসা। ন'মাসের যুদ্ধকালে এই চাহিদার অংশতই পূরণ হবার সুযোগ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছেন যেসব যোদ্ধা তাঁদের জন্য যেমন, শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রিত উদ্বাস্তুদেরকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষার জন্যও তেমনি প্রয়োজন হয়েছে প্রচুর ওষুধের। যতটা ওষুধের প্রয়োজন, ততটার ব্যবস্থাপনা যদিও অসম্ভব ছিল—তবু কারো কারো সক্রিয় তৎপরতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নিজেদের অর্থে জরুরি ওষুধ ক্রয়, সরকারি হাসপাতাল থেকে গোপনে সরানো এবং দোকান থেকে বাকিতে বা বিনে পয়সায় সংগ্রহ করেছেন অনেকেই। এই সংগ্রাহকদের একটি বড়ো অংশ ছিল নারী। তাদের ভিতরে কাজ করেছে জীবনরক্ষা করবার মতো মহৎ এক মানবিকতাবোধ।

নাম ধরে ধরে এসব ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন সেই সব নারীর সহযোগিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। গ্রামে গ্রামে যেখানেই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প গড়ে উঠেছে, সেখানেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নানা ধরনের সহযোগিতার এবং এতে আগ বাড়িয়ে অংশ নিয়েছেন নারীরাই।

গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ ও যথাস্থানে তা সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন যুদ্ধস্থলের মধ্যে বার্তা আদান-প্রদানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নারীরা সীমাহীন পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। নানা কারণেই পুরুষের মতো ব্যাপকভাবে নারীরা সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে

পারেননি। কিন্তু প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধের যাবতীয় রসদ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করে নারীরা মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

তথ্য সংগ্রহ এবং তার আদান-প্রদানের কাজে নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন বার বার। যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে এমনও কিছু তথ্য থাকে যা যথাস্থানে না পৌঁছালে শত শত যোদ্ধার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। কাজেই যেকোনো যুদ্ধে বার্তাবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। অশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে নারীরা বারবারই সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। সারাদেশে এরকম বার্তাবাহক নারীর সংখ্যা অসংখ্য। কেউবা নিজের গৃহে থেকেই একটি সংবাদ তাঁর স্মৃতিতে ধারণ করেছেন এবং যথাব্যক্তি এলে তাঁর কাছে প্রকাশ করেছেন। কেউবা ভিখারিনী সেজে, ফেরিওয়ালি সেজে, পাগলি সেজে দুর্গম ও সমস্যাসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সংবাদ পৌঁছিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছেন, কিংবা সেখান থেকে অন্য কোনো সংবাদ সংগ্রহ করে তা পৌঁছাবার জন্য আরেক যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন রাজধানী ঢাকাসহ প্রতিটি শহর এবং প্রত্যন্ত ও দুর্গম গ্রামাঞ্চলের নারীরা। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাও জানেন না যে তাঁরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ও ভারতের সীমান্ত এলাকায় নারীরা নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসবের অধিকাংশই আয়োজিত হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্যোগে। কিন্তু কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই সারাদেশে আরো অজস্র নারী সেবাকাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নারীদের একটা বড়ো গুণ সেবাপরায়ণ মানসিকতার অধিকারী হওয়া। যুদ্ধাবস্থায় প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে গোটা দেশটাই হয়ে উঠেছিল অনানুষ্ঠানিক হাসপাতাল, আর শত শত মহিয়সী নারী হয়ে উঠেছিলেন সেসব হাসপাতালের চিকিৎসক কিংবা সেবিকা, আর্তের আত্মীয়। এছাড়াও সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিকিৎসক বোনদের মধ্যে যে যেখানে কর্মরত ছিলেন, সেখানেই তাঁরা যোদ্ধাদের প্রতি হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। এঁদের এই তৎপরতা কত যে প্রাণ রক্ষা করেছে, তার কোনো সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য আজ।

দেশকে হানাদারমুক্ত করতে যেসব সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই দেশের জন্যে অমূল্য প্রাণটাকে সঁপে দিতে হয়েছে। এই প্রাণোৎসর্গের সংখ্যাটি আরো অনেক বেড়ে যেত যদি ঘরে ঘরে সেবাদর্শে দীক্ষিত এই নারীকুল সচেষ্ট না থাকতেন, তাঁদের অসুস্থ ভাইটাকে সুস্থ করে তুলবার জন্যে। রক্তের প্রবাহ আরো দীর্ঘ হত যদি ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে এন্টিসেপটিক না লাগিয়ে দিতেন এই মহিয়সী নারীরা। কাজেই, নিজের প্রাণকে সঙ্কটাপন্ন করে একাত্তরে যাঁরাই এই ব্রতে নিয়োজিত হয়েছেন, তাঁরা সবাই সমভাবে যোদ্ধার মর্যাদায় অভিষিক্ত।

চিকিৎসা ও সেবাকাজে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমকে বাংলাদেশ সরকার বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান

আর্মিতে যোগদানকারী এই বীরনারী যুদ্ধকালে সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে কুমিল্লায় কর্মরত ছিলেন। জুলাইয়ের শেষাশেষি মেঘালয়ে পৌঁছান। পরে আগরতলায় বাংলাদেশ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন এবং এই হাসপাতালে একজন সার্বক্ষণিক চিকিৎসক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

দেশের বাইরে আমাদের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার ন্যায্যতা প্রমাণ, পাকিস্তানি হানাদারদের গণহত্যার ঘটনা বিশ্ববাসীকে অবহিতকরণ এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের জন্য যে সমস্ত নারী প্রতিনিধি একাত্তরে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁরা বাংলাদেশের হয়ে অনেক গুরু-দায়িত্বই পালন করেছেন। এঁদের কেউই পেশাদার কূটনীতিক ছিলেন না। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে তাঁদের এরকম গুরুদায়িত্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র কৃতবিদ্য নারী এক্ষেত্রে নিবেদিত ছিলেন।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রটি একটি স্পর্শকাতর কর্মভূমি। একজন কূটনীতিকের সার্বক্ষণিকভাবে মনে রাখতে হয় যে তিনি একজন ব্যক্তিমাত্র নন, বরং একটি দেশের লাখো-কোটি মানুষের প্রতিনিধি। নিজস্ব আবেগ, ক্রোধ, ভালোবাসা প্রকাশের কোনো সুযোগ সেখানে নেই। সর্বোপরি একজন কূটনীতিকের ব্যক্তিমানস রাষ্ট্রমানসের চেয়ে যথেষ্ট গৌণ।

সশস্ত্র যোদ্ধা যে নারীও হতে পারেন—এই সত্যটি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মহারাণী অবন্তী বাঈ লোধী, সদরপুরের জমিদার পিয়ারী সুন্দরী, সশস্ত্র বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তেজীয়ান সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরা, টঙ্ক বিদ্রোহী বীরকন্যা রাসমণি হাজং-এর উদাহরণ সামনে থাকতেও পুরুষপ্রধান এই সমাজ তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। নইলে একাত্তরে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যে সশস্ত্র যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়েছেন, সাফল্যের সাথে শত্রুর মোকাবেলা করে তাদের দর্প চূর্ণ করেছেন, আহত হয়েছেন—চিন্তাচেতনায় বদ্ধ পুরুষ-ঐতিহাসিকের কলমে এতদিনেও তাঁর স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা পায়নি কেন? কেন এতদিনেও এই লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগেই ব্যাপকভিত্তিক অনুসন্ধান তৎপরতা লক্ষ করা গেল না? যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের কথা নিজেরাই কখনো-সখনো বলেছেন বটে, কিন্তু সেসব কথাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র বলে গ্রহণও করা হয়নি প্রায়। সুতরাং এ যাবৎ মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত যে ইতিহাস, তা পুরুষেরই ইতিহাস।

আসলে নারীরা ব্যাপক হারে অস্ত্র হাতে পাকিস্তানি পশুশক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে নামুক, এতটা চানই নি আমাদের সমরবিশারদ কিংবা উচ্চ পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরা। সম্ভবত এ কারণেই নারীদের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করবার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে কোনো ব্যাপকতর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। তাঁরা বরং চেয়েছেন সশস্ত্র যুদ্ধের বদলে নারীরা ভারতে চলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিয়ে স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা নিক এবং পুরুষ যোদ্ধার সেবায়

তাঁদের শক্তিসামর্থ্যকে সীমিত রাখুক। অনুসন্ধানে আমরা দেখেছি যে, যাঁরা শেষপর্যন্ত যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ট্রেনিং নেবার জন্য, অস্ত্র হাতে পাবার জন্য একের পর এক ধরনা দিতে হয়েছে—নির্ভর করতে হয়েছে পুরুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর। আর এসব কারণেই একাত্তরে বাঙালি নারীর সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করবার ব্যাপকতর সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এহেন সীমাবদ্ধতার মাঝেও যেসব নারী শেষপর্যন্ত অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করবার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদের প্রথমে পুরুষতান্ত্রিক একটি প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে হয়েছে। আর এ জয়মাল্য তাঁরা রণক্ষেত্রেও গলায় ধারণ করে রাখতে পেরেছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাপক সংখ্যক নারী সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও দেশের আনাচে-কানাচে সংঘটিত যুদ্ধে নারীরা কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি, যার সবটা হয়তো আমাদের নজরে আসেনি। চট্টগ্রামের নন্দরখিল গ্রামের কিষাণি ও জেলেনিরা মিলে যে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে, তাঁর জবাবে ওই গ্রামের জীবিত প্রত্যেক সক্ষম নারীকেই সম্মুখযোদ্ধার মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কতটা মনে রেখেছি ওই গ্রামের নারীদের? পাশাপাশি দুটি ঘটনা ঘটেছিল এই গ্রামে, দুটি ঘটনাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনা দুটি আমাদের নারীদের বীরত্বের, দেশপ্রেমের নমুনা তুলে ধরবে।

প্রথমটি জুন মাসের ঘটনা। প্রচণ্ড গরমে কাতর হয়ে মুক্তিযোদ্ধা শ্রীমতী মিনা বিশ্বাসের স্বামী ও অতনু বিশ্বাসের পিতা শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস নন্দরখিল গ্রামে আশ্রিত হয়ে পুকুরঘাটে বসে বই পড়ছিলেন। এসময় দুজন লোক চুপি চুপি এসে তাঁর ছবি তোলে। এ দৃশ্য গ্রামের মেয়েরা দেখে লোক দুটিকে ঘিরে চেঁচামেচি শুরু করলে গ্রামের নারী পুরুষ সবাই মিলিত হয়ে লোক দুটিকে ধরে ফেলে। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর জানা যায় লোক দুটি পাকিস্তানি গোয়েন্দা শাখার প্রতিনিধি। পরে তাদের বেঁধে রাখা হয়। রাতে মুক্তিবাহিনীর লোকজন এসে ওদের নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে এবং ক্যামেরাটি মাটিতে পুঁতে রাখে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এর কিছুদিন পরের। নন্দরখিল গ্রামের কাছাকাছি পাকবাহিনীর একটা ছোটোখাটো ক্যাম্প গড়ে ওঠে। খবর পেয়ে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির মেয়েদের হাতে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটি গ্রেনেড দিয়ে যায়। কিভাবে গ্রেনেড চালাতে হয় কয়েকজন সাহসী মেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তা-ও শিখে নেয়। রাজাকাররা গ্রামে বেশ উপদ্রব শুরু করেছিল। আগের দিন পাশের গ্রামের চাষিদের হালের গরু ধরে নিয়ে ওরা জবাই করে খেয়েছে, লুটপাট করেছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে এবং অনেক মানুষ মেরেছে। নন্দরখিল গ্রামের মেয়েরা পরদিন তাঁদের গ্রামে হামলা হবে অনুমান করে তা ঠেকাবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়।

সেটি ছিল অমাবস্যার রাত। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা সিদ্ধান্ত নেয় পাকসেনাদের ছাউনিতে হামলা চালাবে ওই রাতে। ওরা খবর পাঠিয়েছে যাতে নন্দরখিল গ্রামের

মেয়েরা সাবধানে থাকে। কিন্তু না, তাঁরা শুধু সাবধানে থাকবার নির্দেশ পেয়েই সন্তুষ্ট হল না। সিদ্ধান্ত নিল তাঁরাও একই সময়ে পাকসেনাদের ছাউনিতে গ্রেনেড চার্জ করবে। ওরাও বাঁশবন আর ঘন জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। শুরু হল একের পর এক গ্রেনেড ফাটার শব্দ। সাথে সাথে ভেসে আসল মানুষের আর্ত চিৎকার। মেশিনগানের শব্দে কেঁপে উঠল গ্রাম। রাত বাড়তে থাকল আর আওয়াজ কমতে থাকল। ভোরবেলা গিয়ে দেখা গেল ১৭ জন পাকসেনা মরে পড়ে আছে ছাউনিতে। শহীদ হয়েছে তিনজন নাম না জানা কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। নন্দরখিল গ্রামের মেয়েদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা কটি ইতিহাস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে? কজন মনে রেখেছে এই যোদ্ধা নারীদের কথা? কিংবা কজন জানেন তারামন বা কাঁকন বিবির কথা?

দরিদ্র কৃষকের কন্যা তারাভানু যুদ্ধকালে হাবিলদার মুহিবের সংস্পর্শে এসে 'তারামন' নামে পরিচিত হন। হাবিলদার মুহিব তাঁকে ধর্মমেয়ের স্বীকৃতি দিয়ে কাছাকাছি রাখতেন। দিনরাত ধর্মপিতার অস্ত্রশস্ত্র নাড়া-চাড়া, খোলা-জোড়া দিতে দিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরযোদ্ধাদের সাহসিকতার বর্ণনা শুনতে শুনতে তারামনের মনে যোদ্ধা হবার প্রেরণাবীজ উপ্ত হয়। তাঁর ভেতরে রাইফেল চালনা শিখবার আগ্রহ দানা বাঁধে। হাবিলদার মুহিবও তারামনের সেই আগ্রহের যথামূল্যায়ন করেন। তাঁকে শিক্ষা দেন অস্ত্রচালনা। ধর্মপিতার রান্নাবান্নার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তারামন এসময় প্রায়ই ডিফেন্স এরিয়ার গেরিলা যুদ্ধগুলোয় সশরীরে উপস্থিত হতে শুরু করেন, যদিও সশরীরে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে তাঁর আরো পরে আগস্ট মাসে।

সেদিন ১৩ আগস্ট। চরনেওয়াজী স্কুলের কাছে পাক হানাদারবাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। বিকাল ৩টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় এ যুদ্ধ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুপক্ষেরই অবিরাম গোলাবর্ষণ চলতে থাকে। ফলে উভয়পক্ষের প্রাণহানিসহ ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এদিনের সম্মুখযুদ্ধে তারামন নিজেও অস্ত্রচালনা করেন ও শত্রুসৈন্য নিধনে ভূমিকা রাখেন। চরনেওয়াজী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছাড়াও কোদালকাঠি, রাজীবপুর, তারাবর, সাজাই যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। মুক্তিসেনাদের বিজয় অগ্রাভিযানগুলোতে অংশ নিয়ে তারামন বিবি গাইবান্ধা পর্যন্ত গমন করেন। পরবর্তীকালে তারামন বিবি মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হন।

এখানে কাঁকন বিবির বীরত্বের কথাও প্রণিধানযোগ্য। কাঁকন বিবির পাঞ্জাবি স্বামী তাঁকে নিরন্ন অবস্থায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার থানায় অবস্থিত বোগলা ক্যাম্পে ফেলে রেখে সহযোগীদের নিয়ে সিলেট চলে যায়। পেটের দায়ে তিনি স্বামীকে খুঁজতে বেরোন ক্যাম্পে ক্যাম্পে। তখন বাঙালি মেয়েদের প্রতি পাঞ্জাবিদের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। দোয়ারাবাজারের উত্তরের একটি ক্যাম্পে একদিন কাঁকন বিবি মুক্তিবাহিনীর লোক সন্দেহে ধরা পড়ে বাধ্য হয়ে ওই ক্যাম্পেই বসবাস শুরু করেন। আর্মিরা তখন তাঁকে কাজে লাগায়। ভিখারিনী সেজে মুক্তিবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের কাজ করতে বেরোন কাঁকন বিবি। কিন্তু তাঁকে দিয়ে পাঞ্জাবিদের প্রত্যাশা

পূরণ হয় না, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যোগ দেন মুক্তিবাহিনীর দলে। শুরু হয় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কাঁকন বিবির ভয়ানক অভিযান।

আগস্ট মাসে পাকিস্তানিরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করলে তাদের পথ রোধ করতে গভীর রাতে জর্ডিয়া ব্রিজ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযোদ্ধারা। কাঁকন বিবি এই অপারেশনকে সফল করার জন্য কলাগাছের ভেলায় করে বোমা, অস্ত্র ও অন্যান্য রসদ বহন করে একাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জর্ডিয়া সেতুর কাছে পৌঁছে দেন। তাঁর বিশেষ সিগন্যাল পেয়ে অন্যপথে আরও তিন/চারজন মুক্তিযোদ্ধা পৌঁছে যায় ব্রিজের কাছে। মাইন বিস্ফোরণে এই ব্রিজ ধ্বংসের বড়ো কৃতিত্ব কাঁকন বিবির। দলের প্রায় প্রতিটি গেরিলা অপারেশনে তিনি নিজেও সক্রিয় ভূমিকায় নিয়োজিত থাকতেন। মহব্বতপুর, কান্দাগাঁও, বসরাই টেংরাটিলা, বেটিরগাঁও-নূরপুর, দোয়ারাবাজার, টেবলাইয়া, সিলাইরপাড়—এরকম প্রায় কুড়িটির মতো যুদ্ধে সামনাসামনি অবস্থানে থেকে তিনি অংশ নেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাসে সারা পূর্ববঙ্গে ১৪ লাখ বাঙালি নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও স্বজনহারা অবস্থায় নিঃস্ব হতে হয়েছে। এই ১৪ লাখ (মতান্তরে ২ লাখ ৫০ হাজার; ডঃ জিওফ্রে ডেসিবের মতে এই সংখ্যা ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে) নারী বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস এবং বিহারিগণ কর্তৃক বলাৎকারের শিকার হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ পরে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সংখ্যার এই আধিক্য প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একাত্তরের স্বাধীনতা আনায়নে বাঙালি নারীকে কী চরম বীভৎসতার শিকার হতে হয়েছে। কোনো মিনারেই এই নির্যাতিতদের নাম খোদাই করে রাখা হয়নি। এঁদের কী ভয়ানক পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসাসেবা দানে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আগত শল্য চিকিৎসক জিওফ্রে ডেভিসের মন্তব্য থেকে। তিনি তাঁর কতর্ব্যকর্মে নিয়োজিত হয়ে বাংলাদেশের প্রায় সকল জনপদ ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে দৈনিক 'বাংলার বাণী'র গণহত্যা বিশেষ সংখ্যার প্রতিবেদনে উল্লিখিত ডাঃ জিওফ্রে ডেভিসের এসব মন্তব্য প্রকৃত অর্থেই বিভীষিকাময়। তাঁর মতে, 'নমাসে পাকবাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা ৪ লাখ মহিলার বেশির ভাগই সিফিলিস অথবা গনোরিয়া কিংবা উভয় ধরনের রোগের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশই ইতোমধ্যে ভ্রূণহত্যাজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এরা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারেন কিংবা বাকি জীবনভর বারবার রোগে ভুগতে পারেন।' তিনি জানান, 'বাংলাদেশে কোনো সাহায্য এসে পৌঁছার আগেই পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের ফলে ২ লাখ অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ স্থানীয় গ্রামীণ ধাত্রী বা হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাত ঘটিয়েছেন।' ডাঃ জিওফ্রে ডেভিস চিকিৎসা সেবাদানের জন্য বাংলাদেশে আসতে আসতে অধিকাংশ মহিলা ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্য সংক্রান্ত কর্মসূচি শুরু হবার আগেই দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার অন্তঃসত্ত্বা নানা স্থানীয় উপায়ে গর্ভপাত ঘটাতে

বাধ্য হন। অবশিষ্ট ৩০ হাজারের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করেছেন, কেউবা তাদের শিশুদের নিজের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে অধিকাংশেরই। এই 'যুদ্ধশিশু'দের একটা বড়ো অংশ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক হিসেবে রয়েছে, যাদের সম্পর্কে পরবর্তীকালে আর কোনো তথ্য সরকারি বা বেসরকারিভাবে সংগ্রহ করা হয়নি। নিঃসন্দেহে ৪ লাখ নারীর বলাৎকারের শিকারে পরিণত হওয়া আমাদের জন্য অতীব কষ্টদায়ক ঘটনা।

এই বেদনাকর বাস্তবতাটি বর্বর খানসেনাদের ভোগোন্মত্ততার চূড়াস্পর্শী প্রমাণ; যে ভোগোন্মত্ততা মাত্র নয় মাসেই পাকিস্তানি দাপটে সেনাবাহিনীর পর্যুদস্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণে পরিণত হয়ে উঠতে পেরেছে। নিপীড়িত এসব নারীর অবদানকে একজন সম্মুখ-যোদ্ধার চেয়ে খাটো করে দেখবার কোনো অবকাশ নেই। এখন পর্যন্ত প্রণীত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের লেখক নারীকে ধর্ষিত হবার অধিক আর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখেননি। ইতিহাস প্রণেতাগণ নারীর এই শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাকে মুক্তিযুদ্ধের অংশ হিসেবে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

'যুদ্ধ ময়দানে নারী গণীমতের মাল', ইসলামের মোড়কে রাজাকার-ঘোষিত এই বাক্যকে খানসেনারা প্রতি মুহূর্তে তাদের মস্তিষ্কে লালন করেছে। তাদের নয় মাসের আচরণে এর কোনো অন্যথা ঘটেনি। নারীর প্রতি তাদের আচরণ এতটাই অমানবিক, রোমহর্ষক ও পাশবিক হয়ে উঠেছিল যে, এসব ঘটনার আনুপূর্বিক বয়ান আজ সভ্য মানুষ মাত্রকেই স্তম্ভিত করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

যুদ্ধকালে পাকসেনাদের প্রতিটি ক্যাম্প শত শত নারীর আহাজারিতে পূর্ণ ছিল। খান সেনাদের ধর্মান্ধ দোসর স্থানীয় রাজাকার আল-বদর, আল-শামসরা ছিল প্রায়শই এসব নারীর জোগানদাতা। পরিবারের অন্য সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে প্রতিটি বাড়ি থেকে উঠিয়ে আনা হত নিরস্ত্র সাধারণ বাঙালি নারীকে। দোসরদের লক্ষ ছিল চতুর্মুখী। প্রথমত, এতে পাকিস্তানি সেনারা খুশি হবে, রক্ষা পাবে নিজস্ব সম্পদ এবং পরিবারের অন্য সদস্য-সদস্যার জান ও ইজ্জত। তাছাড়া ওরা খুশি হলে যথেচ্ছ লুণ্ঠনের মাধ্যমে আত্মস্বার্থ চরিতার্থের সুযোগ ঘটবে। দ্বিতীয়ত, পরনারী ভোগের আনন্দ নিজেরাও লাভ করতে পারবে। তৃতীয়ত, এই সুযোগে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তাদের নিধন-ধর্ষণের মাধ্যমে নির্মূল করা যাবে। এই চতুর্মুখী লক্ষ বাস্তবায়ন করতে যেয়েই এরা প্রতিবেশীর কিশোরী কন্যাকে, যে হয়তো যুদ্ধপূর্বকালে তাকে ডাকতো কাকা বা দাদা বলে; বিজাতীয় বর্বর খানসেনার কাছে সোপর্দ করে দিয়েছে। স্থাপন করেছে নিষ্ঠুরতার জঘন্য সব উদাহরণ।

ভোগোন্মত্ত খানসেনারা নারীর প্রয়োজনে সর্বদা তাদের দোসরদের ওপরই নির্ভরশীল থাকেনি। প্রায়শ এরা নিজেরাই স্কুলে কলেজে হামলা করে ট্রাক ভরে নিয়ে এসেছে নিষ্পাপ কিশোরীদের। তারপর তুমুল আনন্দে হৈ চৈ-এর ভিতর দিয়ে দলেবলে উপগত হয়ে চরিতার্থ করেছে পশুসুলভ প্রবৃত্তিকে। শুধু ক্যাম্প নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাপের সামনে মেয়েকে, ছেলের সামনে মাকে বলাৎকার করে এরা স্থাপন করেছে হীন মনোবৃত্তির নিকৃষ্ট পরিচয়।

ধর্মকে রক্ষার নামে এই পাষণ্ডরা ইসলামের ধ্বজা উড়িয়ে অধর্ম করেছে ন'মাস ধরে। অপকর্মের স্থান হিসেবে এরা মসজিদকেও ব্যবহার করেছে। নামাজরত কিংবা কোরআন শরিফ পাঠরত নারীদেরকেও এরা হত্যা ও নির্যাতন করেছে। রমজান মাসে রোজদার নারীদেরকেও এরা ক্ষমা করেনি। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে রাজশাহীর বাঘমারা সাকিনের এরকম দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে। জানা যায়, দেলজান বিবি ও সোনাভান খাতুনের ওপর এরা যেদিন দলবদ্ধভাবে বাড়িতে এসে পাশবিক নির্যাতন চালায়, তখন ছিল পবিত্র রমজান মাস। ধর্মপ্রাণ এ দুজন মহিলাই রোজা রেখেছিলেন সেদিন।

বলাৎকারের সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে। নিত্যই এখানে ধৃত হয়ে এসে নির্মম ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে অজস্র কিশোরী-যুবতীকে। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এখানে যাদের ধরে আনা হত, তাদের অনেকের হাতেই থাকত বই, খাতাপত্র। অর্থাৎ এরা ছিল স্কুল বা কলেজের ছাত্রী। হয়তো রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতার মধ্যেও ওরা পড়াশুনাটা নষ্ট করে ঘরে বসে থাকতে চায়নি। চেয়েছে নিজেদের ব্রতে নিজেরা নিয়োজিত থাকতে। অথচ আকস্মিক আক্রমণে তাদের সদলে ধরে নিয়ে গিয়ে বর্বররা তাদের ব্রতের থালায় ঢেলে দিয়েছে এঁটোকাঁটা। কখনো কখনো কোনো মহল্লা ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গৃহবধূ ও কিশোরী-যুবতীদেরও এখানে উঠিয়ে আনা হত। ভয়ে বিহ্বল, আতঙ্কগ্রস্ত এসব মেয়েকে নিয়ে যখন ট্রাক এসে পৌঁছত পুলিশ লাইনের ভিতরে, তখন সৈন্যদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত। ট্রাক থেকেই তারা পছন্দমতো মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে নামাত। প্রকাশ্যে তাঁদের গায়ের-পরনের পোশাক খুলে ফেলত। সর্বসমক্ষে কিংবা গাছ বা দেয়ালের একটু আড়ালে নিয়ে লিপ্ত হত বলাৎকারে। প্রথম দিন যথেচ্ছ ব্যবহারের পর এসব মেয়েকে হেড কোয়ার্টারের চতুর্থ তলায় নিয়ে রাখা হত সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, যাতে কেউ কাপড় পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করতে না পারে। সেখানে তাঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে চুল দিয়ে রডের সাথে বেঁধে রাখা হত। রাতের বেলায় পুনরায় শুরু হত পৈশাচিকতা। কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলেও রেহাই মিলত না। যাঁরা প্রতিবাদ করত তাঁদের জন্য রোমহর্ষক সাজার ব্যবস্থা হত। কাউকে-বা উলঙ্গ অবস্থায় পা ওপরে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হতো, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কারো-বা কেটে নেওয়া হত স্তন, কারো বা যোনিপথে ঢুকিয়ে রাখা হত রাইফেলের বাট। প্রতিনিয়ত এঁরা আর্ত চিৎকার করত, কিন্তু পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরে থাকা বাঙালি সিপাহিদের এসব আর্তনাদ দারুণভাবে স্পর্শ করলেও তাঁদের কিছুই করার থাকত না। কারণ তাঁরা নিজেরাও প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুণত।

স্বাধীনতার দাবিতে বাঙালির অব্যাহত সংগ্রামকে সমর্থন করে একাত্তরে বাংলার বাইরে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা, কানাডা, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপক কর্ম-তৎপরতা অব্যাহত ছিল, এখন পর্যন্ত যার কিয়দংশই বাঙালিদের গোচরে এসেছে। অধিকাংশই রয়ে গেছে অগোচরে। ক্রমশ এসব অজানা তথ্য জানার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের দলিলপত্র'ও এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য দিতে

পারে না। আমরা বিদেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে তৎপরতার যে তালিকা পেয়েছি, সে তালিকা অনুযায়ী এঁদের অবদান প্রধানত দুভাগে বিবেচ্য হতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছেন তাঁরা, যাঁরা জন্মগতভাবেই বিদেশী নাগরিক; বাঙালির দাবির ন্যায্যতা উপলব্ধি করে এঁরা গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। দ্বিতীয়ভাগে রয়েছেন জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিকগণ, যাঁরা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রবাসী। নারী পুরুষ মিলিয়ে এই তালিকায় রয়েছেন অজস্র মহৎজনের উপস্থিতি।

বিদেশে পূর্ব বাংলার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে পরিচালিত কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে প্রধানত মিছিল-মিটিং-শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রকাশনা, অর্থসাহায্য, পত্রিকায় বিবৃতিপ্রদান ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কর্মকাণ্ড একাত্তরের ২৫ মার্চের গণহত্যার অব্যবহিত পর থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যেহেতু বিশ্বাসের আন্তরিকতায় বিদেশী নাগরিকগণ লিপ্ত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডে, সুতরাং বাঙালিদের মতো এঁদেরও প্রত্যাশা ছিল বাংলা নামের নতুন দেশ। বাংলাদেশের মানুষের আত্মত্যাগ উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল এসব খ্যাতনামাদের। বাঙালি জীবনের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ দিনে এঁরা ভালোবেসে প্রসারিত করেছিলেন তাঁদের হাত, শক্ত করে ধরেছিলেন আমাদের হাতকে। এঁদের তৎপরতায় ইউরো-আমেরিকার রাজধানীগুলোর সুপ্রশস্ত পথ, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার, লন্ডনের এলবার্ট হল, বার্লিনের আলেকজান্ডার প্লাজা, দিল্লির সঙ্গীত-নাটক একাডেমী, কলকাতার রবীন্দ্রসদন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। এই কারণে ১৬ ডিসেম্বরের বিজয়ের আনন্দ বাঙালিদের মতো এঁদেরও স্পর্শ করেছিল। একটি জাতির মুক্তি কেবল অস্ত্রসজ্জিতদের সম্মুখযুদ্ধই নিয়ে আসতে পারে না। এর বাইরেও আরো বিচিত্র ধরনের কাজের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, পূর্ব-পরিকল্পনার মধ্যে যেগুলোর কোনো উল্লেখই হয়তো থাকে না। এগুলোর প্রয়োজন উপলব্ধ হয় মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যাবার পর। কৃত এসব কাজের সাথে যুদ্ধপ্রক্রিয়ার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় যে, কোনোভাবেই এসব কাজকে গৌণ বলে শনাক্ত করা যায় না। একাত্তরে এরকম ইতিবাচক অজস্র কর্মকাণ্ডে নারীদের দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। প্রকারান্তরে এসব কাজই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের জয়ের সম্ভাবনাকে বেগবান করে তুলেছে।

নানা কারণেই হয়তো সম্মুখযুদ্ধে নারীর ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কিন্তু দেশপ্রেমিক নারীমাত্রই চেয়েছেন কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে। ফলে এই মানসিক চাওয়াই তাঁকে দিয়ে সম্পাদন করিয়ে নিয়েছে প্রয়োজনীয় অথচ বিচ্ছিন্ন অজস্র দায়িত্ব।

একাত্তরে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ ও অর্জন

পশ্চিমা হায়েনা ও তাদের দোসরদের অপতৎপরতার কুফল বাংলার প্রায় ৩০ লক্ষ দেশপ্রেমিক নারী-পুরুষের জীবন ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, পাশাপাশি প্রায় ৩ লক্ষ (মতান্তরে ৪ লক্ষ) নারীকে তাদের দ্বারা ধর্ষিতাও হতে হয়েছিল। এদের একটা বড়ো

অংশ পাকপশুদের নির্যাতনের কালেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ কেউ যুদ্ধোত্তরকালে পাকসেনাদের সঙ্গী হয়েছেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত নারী দেশেই থেকে গিয়েছিলেন, যাদের অনেকেই অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ করেন এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেন। এরা সমাজ-ধর্মের চোখে হয়ে পড়েন অশুচি, অপবিত্র। সমাজ তাদের কখনোই গ্রহণ করতে চায়নি। মুক্তিযোদ্ধা একজন পিতা-ভাইও গ্রহণ করতে চায়নি তাদের ধর্ষিতা মেয়ে বা বোনকে। স্বামী গ্রহণ করতে চায়নি তার স্ত্রীকে, প্রেমিক গ্রহণ করতে চায়নি তার প্রেমিকাকে। ফলে দেশে থেকে যাওয়া ধর্ষিতাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং আত্মহত্যাকে বরণ করে নেন। এই পরিণতি সমাজদেহে এক বিষফোঁড়ার আকৃতি পেলে বঙ্গবন্ধু তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেন, যাতে নির্যাতিত এই শ্রেণীটির প্রতি উন্নত সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের কারণে যারা ধর্ষিত হয়েছিলেন, সদ্বিবেচনায় তারাও মুক্তিযুদ্ধে আহত বা নির্যাতিত হয়েছেন বলা যায়। তারাও তাই মুক্তিযোদ্ধা খেতাব পাবার যোগ্য। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা' খেতাব দিয়ে এদেরকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। পরবর্তী তিন দশকে আমরা এদের প্রতি যে ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক-পারিবারিক হেনস্তা প্রত্যক্ষ করেছি, তার অনেকটাই হয়তো হত না। ধর্ষিতাদের আলাদা করে না দিয়ে যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সকল নারীকে একইভাবে বিবেচনা করা হলে সেটা হত অধিকতর যৌক্তিক ও মানবিক। সেক্ষেত্রে ধর্ষিতাদের আলাদাভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য প্রায়-ব্যর্থ চেষ্টাটি করতে হত না। সংগ্রামটি তখন হত একমুখী, অর্থাৎ নারী যোদ্ধাদের যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়।

যাহোক স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কথিত 'বীরাঙ্গনা'দের পুনর্বাসনের জন্য গঠিত হয় 'জাতীয় পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন' এবং 'মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা'। ১৯৭২-এর প্রথম দিকে পুনর্বাসনের এই পদক্ষেপের সূচনা ঘটে নারী পুনর্বাসন বোর্ডের মাধ্যমে। ১৯৭৪-এ এদের সপক্ষে আইন প্রণীত হয় এবং ১৯৭৫-এর ১৭ জানুয়ারি এই বোর্ডই 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপ লাভ করে। এই ফাউন্ডেশনের কাজের অন্যতম ছিল নির্যাতিতাদের ধর্ষণজাত সন্তান সংগ্রহ, লালন পালন এবং বিদেশে দত্তক হিসেবে প্রদান করা। এই বিশেষ কাজের জন্য গঠন করা হয় 'আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়ন বেশকিছু যুদ্ধশিশুকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে দত্তক হিসেবে দিতে সক্ষম হয়। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় নির্যাতিত কিয়দংশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে তাদেরকে নানা কর্মে দক্ষ করে তোলা, আগ্রহী অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্যাতিতদের নিকটজনদের নিকট হস্তান্তর করা, বিবাহ দেয়া প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতিতদের বিয়ে দেবার মতো মানবিক কাজটি কোনো ধর্মের লোকদের কাছেই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ আমাদের সমাজ তো মূলত পুরুষতান্ত্রিক এবং শাস্ত্রশাসিত। ধর্ষিতা সম্পর্কে তাদের কঠোরতা দারুণভাবে অমানবিক হলেও এই কর্মকাণ্ডের পক্ষে সমাজে ধর্ষিতাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্যাপক কোনো আন্দোলন তখন গজিয়ে ওঠেনি। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য না থাকার কারণে আশির দশকে এসে এই প্রকল্পের

বিলোপ ঘটে। তদুপরি ৭৫-এর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনও এক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

'নারী পুনর্বাসন বোর্ড'-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেগম সাজেদা চৌধুরী। এই বোর্ডের সাথে আরো যুক্ত ছিলেন ড. নীলিমা ইব্রাহীম, বিচারপতি সোবহান, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, নওশেবা আহমদ, মালেকা খান, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ প্রমুখ। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এ ধরনের পুনর্বাসন কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছে। এই ধরনের একজন উদ্যোক্তা মুক্তিযোদ্ধা আফতাবুন নাহার। তিনি যুদ্ধোত্তরকালে বীরাঙ্গনাদের জন্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য নারী নেত্রীসহ তিনি বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক দেয়া অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। এই পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি বেশ কিছু বীরাঙ্গনাকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব এবং দেশে বিরাজিত ধর্মাচ্ছন্ন রাজনীতির কারণে একাত্তরে ক্ষতিগ্রস্ত এসব নারীর পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে পূর্বেই চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার কারণে এদের পক্ষে সমাজে মিশে গিয়ে সাধারণ জীবনযাপনও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই তাদের পক্ষে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়া ছাড়া জীবনধারণ করবার আর কোনো পথই খোলা ছিল না। 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিদেশে গিয়ে বিয়ে করে এদের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এরা খোলাখুলিভাবে যুদ্ধকালীন নির্যাতন এবং পরবর্তীসময়ে তাদের পরিবার কর্তৃক কৃত নিষ্ঠুর আচরণের সবিস্তার বর্ণনা উপস্থাপন করতে পেরেছেন। সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসিত নারীর সংখ্যা ধর্ষিতা নারীর প্রকৃত সংখ্যার এক-শতাংশেরও কম।

একাত্তরে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজে লিপ্ত থেকে ড. নীলিমা ইব্রাহিম যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার ভিত্তিতে লেখা 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থটি বেঁচে থাকা মেয়েদের জীবন সংগ্রামের একটি বেদনাকর দলিল। এই গ্রন্থে যাঁদের কথা বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই একাত্তর উত্তরকালে খান সেনাদের চাইতে বেশি ভয় পেয়েছে আমাদের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকেই। এ গ্রন্থের তারা ব্যানার্জী (পরবর্তীকালে মিসেস টি নিয়েলসেন), ময়না, মর্জিনা, সুলতানা, মেহেরুন্নেসা, নীরা, রীনা, বাঁশি, শেফালী, ফাতেমা কিংবা মিনা প্রমুখের ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র পরিণতি এ সমাজেরই দান। আমাদের সমাজের এই কূট-রক্ষণশীলতার কারণেই একাত্তরের আরো অনেক ধর্ষিত নারী কাউকে জানান না দিয়ে নীরবে তাঁর বেদনা লালন করে মৃত্যুবরণ করেছেন বা এখনও জীবিত আছেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ৯২-এর ২৬ মার্চে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের জন্য যে গণআদালতের আয়োজন করা হয়, তাতে সাক্ষ্য দেবার জন্য কুষ্টিয়া থেকে তিনজন বীরাঙ্গনা ঢাকায় এসেছিলেন। এই তিনজন সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও হয়। এঁরা যখন গ্রামে ফিরে গেলেন, তখন নিজেদেরকে আবিষ্কার করলেন একঘরে অবস্থায়। সমাজের লোকজন তাদেরকে নানাভাবে বিদ্রূপ-উপহাস করেছে, তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে এক নতুন বিড়ম্বনা। এই ঘটনাটি এটাই প্রমাণ করে যে

আজও একাত্তরের যৌননির্যাতিত কোনো নারীর পক্ষে প্রকৃত সত্যভাষণ উপস্থাপন করবার মতো প্রগতিপন্থী আমরা হতে পারিনি।

এটি আশার কথা যে, ধর্ষিতাদের কেউ কেউ সবধরনের সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তাঁদের বেদনাকর অভিজ্ঞতার কথা জনসমক্ষে বলতে শুরু করেছেন। যদিও আমাদের সামাজিক অবস্থানে থেকে কোনো ধর্ষিতা নারীর পক্ষেই এই বর্ণনা দান সহজ নয়। শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত এবং 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কর্তৃক প্রকাশিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' গ্রন্থে একজন নির্যাতিত নারী—খ্যাতিমান ভাস্কর্য শিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী সম্পাদককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ওপর কৃত নির্যাতনের সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। নয় মাস ধরে তাঁকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে পাকপশুরা। এই বর্ণনা রোমহর্ষক তো বটেই, আবেগ জাগানিয়াও বটে। ১৯৯৯ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 'একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে স্বামী-সন্তানের অনুমোদনক্রমে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ভর্তি দর্শকের সামনে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী জানান যে, 'এ ঘটনা বলায় কোনো অবমাননা নেই।' এতদিন পরেও নির্যাতিতাদের মুখ না খুলবার কারণ হিসেবে আমাদের সমাজ ও পরিবারের রক্ষণশীল বৈরী পরিবেশকে দায়ী করে তিনি বলেন, 'আমি আশা করব আমার এই জবানবন্দি অন্যসব নির্যাতিতা নারীকে সোচ্চার হতে অনুপ্রাণিত করবে।'

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিএনপিএস প্রকাশিত 'সংগ্রামী নারী যুগে যুগে' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশনা উৎসবে সংগ্রামী নারীদের স্মৃতিকথা পর্বে দর্শক-শ্রোতাগণ বরিশালের আরেকজন বীরাঙ্গনা নূরজাহান বেগমের (গ্রন্থে তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে) বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নূরজাহান বেগম বলেন, 'আমার এক ভাইগ্না আবুবকর রাজাকারদের ক্যাম্পে থাকত। সে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে অস্ত্র দিত। আমি ক্যাম্পে গিয়া তার কাছ থাইক্যা চিঠি আর শাড়িতে প্যাঁচাইয়া অস্ত্র আনি ও মুক্তিযোদ্ধাগরে দেই। এসব খবর জানাজানি হবার পরে একদিন শিকারপুরে আবুবকরসহ রাজাকারদের কাছে আমরা ধরা পড়ি। তারপর আবুবকরকে আমার সামনেই গুলি করে ও আমারে ক্যাম্পে নিয়া যায়। ওইখানে চারমাস রাইখ্যা পাঞ্জাবিরা আমারে খুব টরচারিং করে।' বিএনপিএস কর্তৃক একাত্তরে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদানকে জীবনীগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করায় এবং স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ দেয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এখন থেকে মনে করব যে আমি জীবিতই আছি, এতদিন মনে করতাম আমি মারা গেছি।'

বিশাল সমাবেশে এই দুটি স্বীকারোক্তির ঘটনা ঘটার নেপথ্যে বেশকিছু ঘটনা কাজ করেছে। ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর ক্ষেত্রে কাজ করেছে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও পারিবারিক স্বীকৃতি। নূরজাহান বেগম স্বকর্মে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর মতো খ্যাতিমান নন, কিন্তু বীরাঙ্গনা হবার কারণে তিনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে অন্য অনেকের মতো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। আর পরিবারের নিষ্ঠুরতার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার নূরজাহান

বেগম দায়ে পড়ে হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল। তাছাড়া বিচ্ছিন্ন হবার কারণে পরিবারও এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। যদি বীরাঙ্গনাদের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান এবং পারিবারিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে অকপটে পাকবাহিনীর নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশে তারা উৎসাহী হবেন, যে স্বীকারোক্তি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংঘটিত করার জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বীরাঙ্গনার জীবন-বাস্তবতাই চরম দারিদ্র্যকে ছুঁয়ে আছে। সংবাদপত্রের পাতায় এখনও যেসব বীরাঙ্গনার খবর পত্রস্থ হয়, তাতে তাদের চরম অর্থনৈতিক দৈন্যের চিত্রই ফুটে ওঠে। তদুপরি স্বাধীনতার ঊনত্রিশ বছর পূর্তিতেও আমরা বীরাঙ্গনাদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। তবে সুশীল সমাজ ও প্রগতিশীল উন্নয়ন সংগঠনসমূহ মুক্তিযোদ্ধা নারীদের অনুসন্ধান, উপস্থাপন এবং তাদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার যে লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন, তার সুফল ইতোমধ্যে ফলতে শুরু করেছে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যেখানে যুদ্ধ-নির্যাতিত নারীরা সমাজে যথাযথ স্থান করে নিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা লিখিতভাবে উপস্থাপন করবার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে আমাদের দেশের এই বাস্তবতা অতিশয় লজ্জাজনক। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যারা গণহত্যা নারী নির্যাতন ও অন্যান্য দুষ্কর্মের জন্য দায়ী প্রমাণিত হচ্ছেন, সেইসব নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের আজও খুঁজে বের করে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যদের নারী নির্যাতনের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত বসে জাপানের রাজধানী টোকিওতে। চীন, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রায় ২ লক্ষ নারী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে জাপানের অধিগত থাকাকালে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে যারা এখনো জীবিত আছেন, ৫০-৫৫ বছর পরও তারা তাদের প্রতি কৃত অপকর্মের বিচার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে জোর আওয়াজ তুলেছেন। আর আমরা মাত্র ঊনত্রিশ বছর আগের ঘটনার বিচাব কেন পাব না, এটি বোধগম্য নয়। সম্প্রতি পাকিস্তানের বর্তমান স্বৈরাচারী শাসক হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে সম্মত হয়েছেন। সরকারিভাবে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিকভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উত্থাপন সহজতর হবে। আন্তর্জাতিক আইনে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক—এটি বাঙালিদের প্রাণের দাবি।

উপসংহার

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধ, যে-যুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সকল শ্রেণীর বেসামরিক লোকজন বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। এর একটি বড়ো অংশ ছিল দেশপ্রেমিক বীর নারীরা। শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে লেখাপড়া না জানা নিম্নবিত্তের নারীদের অবদানও ছিল। সবাই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুক্ত হয়েছেন তা নয়। কাউকে কাউকে যুদ্ধের অব্যবহিত আগে বা যুদ্ধ চলাকালে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কিংবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছেন এবং সংগঠিত করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারাও প্রশিক্ষণ গ্রহণ

করে মুক্তিযুদ্ধে যথাসাধ্য অবদান রেখেছেন। এই প্রণোদিত শ্রেণী এবং প্রণোদনাদানকাবী শ্রেণী যে চিন্তা-চেতনার একই স্তরে অবস্থান করতে পারেন না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যে-সচেতনতা একজন নূরজাহান মুরশিদ বা সুফিয়া কামালকে যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত করেছে, নিশ্চয়ই একজন তারামন বিবি বা ভাগীরথীর যুক্ত হওয়াকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। প্রত্যেকের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াই তাঁর নিজস্ব পারিবারিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রথম দুজন মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ভূমিকায় লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দুজন তা নন। তাঁরা যুদ্ধ চলাকালে পারিপার্শ্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধা বা এর সংগঠকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই মহান দায়িত্বে নিয়োজিত হন এবং সাহসী ভূমিকা রাখেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে সচেতন শিক্ষিত নারীর সংখ্যা যত বেড়েছে, একাত্তরে এই সংখ্যাটা তত বেশি ছিল না। অব্যাহত নারী আন্দোলনের ফলে নারী অধিকার সম্পর্কে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত এখনকার নারীরাও কমবেশি সচেতন। তিন দশক আগে এই শ্রেণীর সচেতনতার মাত্রা এখনকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কিন্তু এরপরও এই শ্রেণী একাত্তরে বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জাতীয় ইস্যুতে জেগে উঠবার মতো একটি বীজমন্ত্র ষাটের দশকের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অধিকাংশ নারীর মধ্যে কাজ করেছে। ষাটের দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এই নারীরা যেহারে শক্তিমত্তা নিয়ে রাজপথে নেমে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল-মিটিং করেছে; সেই তুলনায় সম্মুখসমরে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা কমই দেখা গেছে। সম্মুখযোদ্ধা নারীর সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে কাজেই নারী অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা বা অশিক্ষাকে দায়ী করা চলে না। এজন্যে দায়ী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা। এই মানসিকতার জগদ্দল পাথরটি আমরা আজও বহন করে চলেছি।

পুরুষদের একটা অংশ এখন যেমন নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল, তখন এই অংশ অতটা বড় ছিল না। ফলে অনেক নারীই অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হলেও সে সুযোগ তারা পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র কারো কাছ থেকেই পাননি। দুয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা যোদ্ধা নারীদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি বরং অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেছে। রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণকারী নারীদের বেলায় এমনটি ঘটতে দেখা গেছে। সশস্ত্র যুদ্ধে যুক্ত হতে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, তার বিপরীতে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। বাঙালি সমরবিশারদ থেকে শুরু করে উচ্চ-পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরাও এতটা আস্থা পোষণ করেননি যে, নারীর সম্মুখসমরে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা রাখবে। নারীযোদ্ধা তৈরি করবার জন্য ব্যাপক কোনো প্রস্তুতি নীতি-নির্ধারক বা রাজনৈতিক নেতাগণ গ্রহণ করেননি বলেই জনসংখ্যার অর্ধেক নারী আড়ালে-আবডালে থেকেই তাদের মতো করে যুদ্ধ করে গেছেন। নারীর নিরাপত্তা-সঙ্কট নেতা-নেত্রীদের ভাবিয়েছে বেশি। এ ধরনের

উৎসাহ-নিরপেক্ষ মানসিকতা ব্যাপকসংখ্যক নারীর সশস্ত্র যোদ্ধা হয়ে উঠবার যে অমিত সম্ভাবনা ছিল, তাকে নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে সঙ্গত কারণেই পুরুষদের মতো নারীরা যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় অতটা দৃশ্যমান হতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্যে থেকে বিবিধ উপায়ে সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আজ বলতে দ্বিধা নেই, এরা নিজেরা এবং এদের কৃত কর্মকাণ্ড ছিল জনযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক শক্তি। কিন্তু জনযুদ্ধের এই চরিত্রগুণ সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে সহযোগীর ভূমিকাকে মুক্তিযুদ্ধের জন্যে কোনো ইতিবাচক কর্ম বলেই মনে করা হয়নি এতদিন। অথচ যেকোনো জনযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নেপথ্যে সংঘটিত এসব আপাততুচ্ছ কাজের সমাবেশ না ঘটালে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা কখনো সম্ভব হয় না। যারা অজস্র সীমাবদ্ধতাকে পরাস্ত করে সরাসরি যুদ্ধে যুক্ত হয়েছেন, প্রায়শই তাদেরকে তা করতে হয়েছে পরিবারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে। আর বদ্ধমূল পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতার কারণে নারীরা ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হলেও শহীদের তালিকায় পুরুষদের মতো তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক স্বীকৃতির বেলায়ও তারা উপেক্ষিত থেকে গেছেন। এই উপেক্ষা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা প্রণোদিত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনেক নারীকেই যুদ্ধপরবর্তী সময়ে আত্মগোপনের আড়াল রচনা করতে প্ররোচিত করেছে। কারণ আমাদের সমাজ-মানসিকতা 'বীরনারী'কে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবেই চিনতে চেয়েছে। এ প্রবণতা দুঃখজনকভাবে এখনও উপস্থিত।

মাত্র গত শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সাধারণ সমাজ অবগত হতে শুরু করেছে যে মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও ব্যাপক অবদান ছিল। এই সময়ে শনাক্তকৃত কারো কারো ব্যাপারে তথ্যাহরণ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, এদের অনেকেই ছিলেন নিতান্তই দরিদ্র ও নিরক্ষর। কাজেই নানাভাবে তারা সমাজে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। তাদের প্রতি সমাজের এই অনীহা পরবর্তী সময়ে তাদের নিজেদেরকেও যুদ্ধ সংক্রান্ত স্মৃতি ধরে রাখতে অনীহ করে তুলেছে। কেবল যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, এর অধিক স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ে অন্য কোনো তথ্যই তাদের স্মৃতিতে রক্ষিত হয়নি। শিক্ষিত ও নাগরিক শ্রেণী বরাবরই তুলনামূলকভাবে বেশি খ্যাতি পেলেও নিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকায় নিয়োজিত অসংখ্য দরিদ্র ও গ্রামীণ নারীযোদ্ধা এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। এর দায় আমাদেরই মাথা পেতে না নিয়ে উপায় নেই। আমাদের সমাজ আজও চায় না যে তারা নিজেরা 'বীর' পরিচয় নিয়ে সগর্বে সামনে এসে দাঁড়াক।

এমন অনেক নারী মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিলেন, যাদের অনেকের পরিবারের কেউ না কেউ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, নিদেনপক্ষে আহত হয়েছেন বা যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছেন। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতো। আশঙ্কা ছিল যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাবার। এরই প্রতিক্রিয়ায় নিজেও হয়েছেন যোদ্ধা। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সরাসরি যুদ্ধের সাথে যুক্ত হওয়া ছাড়া বাঁচবার অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট নেই। চারপাশে সংঘটিত ঘটনার নমুনা দেখে তাদের এ বোধ জন্ম নিয়েছিল

যে, তাকে তার সমাজ যেমন রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না, তেমনি শত্রুপক্ষ সন্ধান পেলেও জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে। ফলে হাতে অস্ত্র নেয়া কিংবা যুদ্ধের প্রয়োজনে বিশেষ কোনো ভূমিকায় লিপ্ত হওয়াই উত্তম বলে তারা বিবেচনা করেছেন। তারামন বিবি যেমন তার তৎকালীন পরিস্থিতির শিকার, তেমনি কাঁকন বিবিও। তারামন বিবি তবু হাবিলদার মুহিবের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু কাঁকন বিবি কিংবা ভাগীরথীকে নিজে নিজেই এগিয়ে আসতে হয়েছে। কেউ তাদের হাত ধরে এই মহান ব্রতে নিয়োজিত করেনি।

সভ্যতার সকল অর্জন নারী-পুরুষের মিলিত কর্মেরই ফল। বাঙালি জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অধ্যায় রচনায়ও নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান স্বীকার্য। এই বিশ্বাসে যতদিন পর্যন্ত আমরা স্থির হতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত আমরা জাতি হিসেবে খণ্ডিত ও পক্ষপাতপূর্ণ চিন্তা-চেতনাই বহন করতে থাকব। আশা করি অচিরেই সচেতনতার এই পর্যায়টিকে স্পর্শ করবার মতো উন্নত মানসিকতার অধিকারী আমরা হয়ে উঠতে পারব।

সুফিয়া কামাল ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলন

আয়শা খানম

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামালের কাছ থেকে এবং তাঁর সম্পর্কে লেখা সংক্ষিপ্ত জীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে সুফিয়া কামাল বরিশালের এক ঐতিহ্যবাহী বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে ওঠেন। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী পরিবার, জমিদারি প্রথা বিলোপ পেয়েছে, তবে সেখানে মার্জিত শিক্ষিত একটা সাংস্কৃতিক পারিবারিক পরিমণ্ডল ছিল। বরিশালের তৎকালীন বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় আবহাওয়া ও পরিবেশের এক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তাঁর ওপরে পড়েছে বলা যায়। জীবনে বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে এমন অনেক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে, যা অধিকাংশ সময়ই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে। শৈশব থেকেই তাঁর মাঝে এক গভীর আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাঁর জবানিতেই আমরা দেখি তিনি তাঁর মাতার কাছে তাঁর পিতার বিষয়ে সংবাদ জানতে চান এবং এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তিনি তার জীবনের প্রথম বেদনাবোধের কথা আমাদের বলেন। তাঁর এই আত্মানুসন্ধান প্রবণতা তাঁকে নতুন নতুন মানুষ, নতুন নতুন ঘটনা ও নতুন জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

বলা যায় তাঁর এই আত্মানুসন্ধান প্রবণতার জন্য পরবর্তী সময়ে তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সুস্থ উন্নত প্রগতিশীল জীবন চেতনাবোধের আন্দোলন, নারীর জাগরণ ও মুক্তির আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক কালপর্বে স্বাধীন বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও মুক্তির আন্দোলনে এক জাগ্রত অগ্রসর পথিকের ভূমিকা পালন করেন তিনি।

খুব অল্প বয়স থেকেই সেই সময়ের স্বদেশী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব তাঁর ওপর পড়ে। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তসহ অনেক স্বদেশী আন্দোলনের ব্যক্তিত্বের ভূমিকার কথা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। চরকায় সুতা কাটা, গান্ধীর আগমন, জাতীয়তাবাদী

চেতনার স্ফুরণ, স্বদেশী সংগ্রামীদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পোশাক পরিবর্তন করে বরিশালেব বিভিন্ন আন্দোলনের সভায় যোগদান, জমিদার পরিবারের ঐশ্বর্য ও সামাজিক মর্যাদার মাঝে থেকেও মায়ের নিঃসঙ্গ জীবন এবং পরবর্তীকালে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পথপরিক্রমায় সুফিয়া কামাল আমাদের এই অঞ্চলের পরিবারে ও সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থানের পরিচয় পেয়ে যান। ভাইদের সাথে ছেলেদের পোশাক পরে স্কুলে যাওয়া, উদার মানবতাবাদী সাংবাদিক সওগাত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রয়াত নাসিরুদ্দিন সাহেবের সাথে যোগাযোগ ও কবিতা প্রকাশের সুযোগ তৈরি, কলকাতায় অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়ে একাকী হয়ে যাওয়ার পর কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি গ্রহণ এবং কঠিন জীবন সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা পাওয়া, সেই সময়ের আন্দোলনের বিভিন্ন সভায় যোগদান, মায়ের মাধ্যমে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার সাথে আলাপ-পরিচয়, তাঁর চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া, তাঁর সাথে কিছু কিছু কাজ করা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে পত্রালাপ, তাঁর সাহিত্যের সাথে পরিচয়, তাঁর জীবনদর্শন, জীবনভাবনা, মানবতাবাদী চেতনা ও আদর্শ কবি সুফিয়া কামালের চেতনার জগতে বিরাট মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবাত্মক সাম্যবাদী চিন্তাধারা, অবনমিত নারীর জয়গান তাঁর চেতনা ও মনোজগতে পরিবর্তন আনতে থাকে। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত ও গবেষণামূলক পৃথক প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। আমি এখানে সংক্ষেপে বলতে চাই যে তাঁর শৈশব, পরবর্তী জীবনের বাস্তব পরিবেশ, নানা ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় ও নিজের জীবনজিজ্ঞাসা এবং সচেতন চিন্তাচেতনা তাঁকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। ইতোপূর্বে (তাঁর নিজের স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী গ্রন্থ "একালে আমাদের কাল"-এর সূত্র ধরে ও তাঁর নিজের কাছ থেকে জেনে) বরিশালে সুকুমার দত্তের স্ত্রী সাবিত্রী দত্তের সাথে মাতৃমঙ্গল, শিশুমঙ্গল, মহিলা সমিতির কাজ করা, বরিশালে যখন মহাত্মা গান্ধী এলেন সেই সূত্রে স্বদেশী নেতাদের স্ত্রীদের সাথে চরকায় সুতা কাটা, কলকাতায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গড়া সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের সদস্য হওয়া, বস্তিতে কাজ করা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করা, অল ইন্ডিয়া উইমেন্স এসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হওয়া, সেখানে বেগম রোকেয়া, শামসুন্নাহার মাহমুদও জড়িত ছিলেন বলে তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি। এই সংগঠনে থাকাকালে মেয়েদের ভোটাধিকার, স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে তিনি যোগদান করেন এবং তাঁর আত্মচেতনার বিকাশ ঘটে।

কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাইয়ের স্ত্রী নারীনেত্রী রেনু চক্রবর্তীর মায়ের সাথে নারীদের সভায় গেছেন, সেই আন্দোলনের সংগঠনের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং বেগম রোকেয়ার হাতে গড়া সংগঠন "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নামক সংগঠনে কাজ করেছেন। বস্তিতে বস্তিতে মানুষের মাঝে কাজ করেছেন। শামসুন্নাহার মাহমুদের সাথেও পরিচয়-যোগাযোগ হয় ঢাকায় এসে।

একটা পর্যায়ে এখানকার কবি সাহিত্যিকদের সাথেও যোগাযোগ হয় তাঁর। সমকালীন কবি সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, নারী সংগঠক অনেকের সাথেই আলাপ-পরিচয় ও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। শামসুন্নাহার মাহমুদ ও অন্যান্যদের নিয়ে সামাজিক কাজ শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের পর ধীরে ধীরে কাজী মোতাহার হোসেন, প্রগতিশীল শিখাগোষ্ঠী, সাহিত্য চক্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালে মহান মাতৃভাষা আন্দোলনে যোগদান, নিজের বাসায় ছাত্রী নেত্রীদের নিয়ে সভা করা—এমনিভাবে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল আদর্শ চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশের আন্দোলন ও সংগঠনগুলির সাথেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

কবি সুফিয়া কামাল বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে নিয়ে মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কথা তোলেন তৎকালীন সরকার ও শাসকমহলের সাথে। গোটা পাকিস্তানি আমলের বলা যায় ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এই পুরো সময় শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামাল ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে এবং সাংগঠনিকভাবে দেশের বিভিন্নমুখী প্রগতিশীল কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার পাশাপাশি নারীসমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক নারীব্যক্তিত্ব ও নারী সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ এবং নারী সংগঠনের কাজকে অগ্রসর করতে থাকেন। ক্লাব, সমিতি, সংগঠন, পত্রিকা সম্পাদনা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বিবৃতি প্রদান, মৈত্রী-শান্তি ইত্যাদি চিন্তাধারা এবং প্রচারমূলক সংগঠনে যুক্ত হওয়া, রাজবন্দী মুক্তির দাবিতে নারীসমাজের পক্ষে স্বাক্ষর ও বিবৃতি প্রদান—এভাবে জাতীয় আন্দোলনমূলক ধারার সাথে ধীরে ধীরে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৬৮-৬৯ সালে গড়ে ওঠা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে যুক্ত হন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-মানবতাবাদী আদর্শ ও চেতনার একজন বলিষ্ঠ ধারক বাহক হিসেবে বিশেষ ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হন। সংগঠিত নারী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের প্রধান কর্ণধার হয়ে দাঁড়ান।

নারী আন্দোলনের সাথে কবি সুফিয়া কামালের যেন একটা আত্মিক যোগাযোগ জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই ছিল।

সওগাত সম্পাদকের সাথে পরিচয় তাঁর জীবনের এক সবিশেষ স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে জীবন-যুদ্ধ করা, সংগ্রাম, মন্বন্তর চিরজিজ্ঞাসু সুফিয়া কামালকে গভীর ও বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছে। বরিশালের মেয়ে বর্ধমানে গিয়ে নারী আন্দোলনের কাজে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাথে যুক্তে হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও নারী আন্দোলনের নেত্রী মনিকুন্তলা সেনের সাথে কাজ করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত

মেমোরিয়াল স্কুলে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষ আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী কাজে যোগ দেন। লীলা নাগের সাথেও কাজ করেন। এ সময় আনোয়ারা খাতুন, দৌলতুন্নেছা, ডলি ঘোষসহ অনেকের সাথে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা নাগদের সাথে যুক্ত হয়ে পূর্বপাকিস্তান মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। ওয়ারী মহিলা সমিতিতে প্রথমে সুফিয়া কামাল সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক লায়লা সামাদ; পরে সুফিয়া কামাল সভাপতি, রাইসা হারুন সাধারণ সম্পাদক হন। মাতৃভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল, লায়লা সামাদ, সন্‌জীদা খাতুন, বেগম কাজী মোতাহার হোসেন ও অন্যান্যদের সাথে শোক মিছিলে যোগদান, নারীদের নিয়ে সভা করা ইত্যাদি কাজে যোগ অবদান রাখেন। নাদেরা বেগম, সুফিয়া প্রমুখ ছাত্রী নেতাদের সাথেও সুফিয়া কামালের যোগাযোগ ছিল।

পাকিস্তানি আমলে নারীর আইনগত অধিকার ও পরিবারে নারীর অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে সুফিয়া কামাল সক্রিয় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। সুফিয়া কামাল বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ আইন ও তালাক রেজিস্ট্রেশন বিলের সংশোধনীর প্রতিবাদ জানানো, বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা জনমত গঠনের কাজ শামসুন্নাহার মাহমুদ, দৌলতুন্নিসা খাতুন, আনোয়ারা খাতুন এদের সাথে করেন। মহিলা প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী আইন সংশোধনীর প্রতিবাদে মহিলা সম্মেলন করতে উদ্যোগী হলেন সুফিয়া কামাল, নূরজাহান মুরশিদ, লায়লা সামাদ, ড. হালিমা খাতুন প্রমুখ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পুনর্বিবেচনার দাবিতে তারা বিবৃতি প্রদান করেন। এসময় সুফিয়া কামালের সাথে বেগম রোকেয়া আনোয়ার, হাজেরা মাহমুদ, নুরজাহান মুরশিদ, আমিনা বেগম, কামরুন্‌নাহার লাইলী, রাইসা হারুন, বদরুন্নেছা আহমেদ, লুলু বিলকিস বানু, জোবেদা খানম প্রমুখ ছিলেন। ১৯৬২ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করে নারীস্বার্থ রক্ষামূলক যে ধারা যুক্ত হয়েছিল, একটি প্রতিক্রিয়াশীল মহল যখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে, তখন এই নারীস্বার্থ রক্ষাকারী অর্ডিন্যান্স বানচালকারীদের বিরুদ্ধে বিবৃতি, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সীমিতভাবে হলেও একটা প্রতিবাদ আন্দোলন করেন। সুফিয়া কামাল এর প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুফিয়া কামাল ১৯৫৩ সালে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দাবি করেন। কামরুন্‌নাহার লাইলী তাঁর সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ' গঠন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। লক্ষ করা যায়, সুফিয়া কামাল পাকিস্তানপূর্ব ও পাকিস্তানি আমলে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও নারী অধিকার বিষয়ক ইস্যুতে বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছেন, অন্যদের সংগঠিত করেছেন এবং নারী আন্দোলনের একটা ধারাকে অগ্রসর করেছেন। সেই আন্দোলন যত দুর্বল, অসংগঠিত এবং বিক্ষিপ্তভাবেই গড়ে উঠুক না কেন, সুফিয়া কামালের একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতা ছিল। যে-চেতনা, যে-ধারা, যে-উদ্যম, যে-আগ্রহ-উদ্যোগ পরবর্তীকালে তিনি গ্রহণ করেন; তা তাঁকে অগ্রসর নারী আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্বে আসীন করে।

১৯৬৮-৬৯-৭০ সালের উত্তাল গণজোয়ার ও গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির যে ঐতিহাসিক উত্তরণ সংগঠিত হল, সেই জাগরণের অগ্নিমশালবাহী চেতনা স্ফুরণের আন্দোলনের সাথে সুফিয়া কামালও যুক্ত ছিলেন। তিনি আরো অগ্রসরভাবে এগিয়ে আসলেন মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের নারীসমাজকে তাঁর অধিকার অর্জনের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা নিতে। বাঙালি জাতির সেই অবিস্মরণীয় জাগরণের কালে, আত্মজাগরণ আর আত্মদানের প্রস্তুতিলগ্নে, শতমুখী কর্ম প্রচেষ্টার একটি ধারায় নারীর মানবাধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে, জন্ম নেয় আরেক সংগ্রামের। সংগ্রামের যে বীজ সেদিন উপ্ত হয় তার নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) নামে একটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর লক্ষ ছিল পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা। নারীমুক্তি প্রতিষ্ঠা, শোষণ নির্যাতনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল বাম নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকে যখন এই কর্মধারায় নেতৃত্ব প্রদানের আহ্বান এল, সুফিয়া কামাল তাঁর সহজাত আগ্রহ ও কর্তব্যবোধ থেকে এই নতুন কাজের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের নারী জাগরণ ও মুক্তি সংগ্রামে সুফিয়া কামাল এক চিরভাস্বর নাম। একটি পশ্চাদপদ দেশে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিবার-সমাজ পরিচালিত ও প্রভাবিত হয়, সেখানে নারীর ব্যক্তিঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও চেতনাকে বিকশিত করার সংগ্রামে সুফিয়া কামাল নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।

মহীয়সী রোকেয়া ছিলেন সুফিয়া কামালের অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব। সুফিয়া কামালই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের মূল ও প্রধান ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর অগ্রজ, দূরদর্শী ও নিজ-সময় ও পারিপার্শ্বিকতার তুলনায় অগ্রসর চিন্তা-চেতনার অধিকারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতিকে ধরে রাখার উদ্যোগ নেন। প্রথমে আয়শা জাফরকে সহযোগী করে এবং পরে মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারাকে প্রচার করার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নেন।

সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়ার স্মৃতিরক্ষা ও তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ প্রচারের এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হন তাঁর অনুসারী, সহযোগী নারীকর্মী, সংগঠক, নারী সংগঠন ও সমচিন্তার অধিকারী বুদ্ধিজীবী, বাংলা একাডেমী, কবি আবদুল কাদির ও অন্যদের সহযোগিতায়। এক অর্থে বলা যায়, পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনে যেমন ম্যারিউলস্টোনক্রাফ্‌ট বা সিমোঁ দ্য বোভেয়ার, গ্রিমিক ভগ্নিদ্বয় (এঞ্জেলিনা ও সারা), তেমনি এশিয়ার এই অঞ্চলে চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর এক নারীবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। সেই কণ্ঠস্বর, সেই চেতনা ও আদর্শ বিস্তারে সুফিয়া কামাল অনেক ক্ষেত্রেই এককভাবে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নেন। একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে, সুফিয়া কামাল বেগম রোকেয়ার আদর্শ ও চেতনাকে সামনে আনার জন্যে মহিলা

পরিষদের মাধ্যমে প্রথম সংগঠিত পরিকল্পিত প্রয়াস রাখেন। অবশ্য তাঁর এই কাজে অন্যান্য সহযোগী নারীকর্মী ও পুরুষ বুদ্ধিজীবী সহযোগীরাও এগিয়ে এসেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবিতকালেই রাষ্ট্রীয়ভাবে বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের প্রচলন হয়। জাতীয় নারী আন্দোলনের আদর্শিক ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া অনেক সময় সামনে চলে এসেছেন। রোকেয়াকে সামনে আনার ক্ষেত্রে সুফিয়া কামালের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ঐতিহ্যিক সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত সমাজ হিসেবে বাংলাদেশ পশ্চাদপদ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল (বিশেষ করে নারী অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রশ্নে)। ধর্মীয় দিক থেকে গোঁড়া সমাজে সুফিয়া কামাল নিজের জীবনে যেমন অনেক প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করেছেন, তেমনি আবর্জনা কেটে পথ তৈরি করেছেন শত সহস্র নারী সংগঠকদের জন্য। বিশাল মহীরুহের মতো ছায়া দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন শত সহস্র নারীকর্মীকে, প্রগতিবাদীকে। পথ তৈরি করেছেন আজকের সাহসী আলোকিত লক্ষ লক্ষ নারী কর্মীর জন্য, যারা কাজ করছেন মাঠে-প্রান্তরে, কলে-কারখানায়, অফিসে-আদালতে, শিক্ষাঙ্গনে। যারা সাহস নিয়ে, শক্তি নিয়ে, মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াচ্ছে পরিবারে, সমাজে, জীবনের সবক্ষেত্রে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং কবি সুফিয়া কামাল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দুটি নাম। বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় সাহসী আত্মদানের গৌরবের মুহূর্তে সীমাহীন কর্মপ্রেরণা, কর্মউদ্যোগ ও বহুমাত্রিক কর্ম প্রচেষ্টার পটভূমিতে শতাব্দীর নারী আন্দোলনের আদর্শ চেতনা ও ধ্যানধারণায় স্নাত হয়ে ১৯৬৯-৭০ কালপর্বে একটি নতুন সংগ্রামের ধারা সৃষ্টি হয়। নারী জাগরণ ও মুক্তির এই ধারার নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী, প্রগতিশীল সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, সচেতন গৃহিনী সকলেই এর সংগঠক। নেতৃত্বের পুরোভাগে সুফিয়া কামাল। লক্ষ্য পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। মূল দৃষ্টি হচ্ছে পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে বিবেচনা করা। শতাব্দীর শুরুতে পূর্ব এবং পশ্চিমে নারীর ব্যক্তি হিসেবে পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, সেই সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করা, আরো সামনের দিকে অগ্রসর করে নেয়া। নারী পুরুষের মাঝে সমতাপূর্ণ, বৈষম্যমুক্ত, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

সমাজ-রাষ্ট্র-দেশবাসী-নরনারী সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কাজ, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা এবং এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে জনমত গড়ে তোলার কাজ, নারীসমাজকে সচেতন ও সংগঠিত করার কাজ, নারীসমাজকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত জন্মগত অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা, অধিকার অর্জনের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করা, নারী-পুরুষের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শিক্ষাগত-সাংস্কৃতিক-আইনগত তথা সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলা—যে আন্দোলনের যোগসূত্র রয়েছে এই উপমহাদেশে গড়ে ওঠা নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে—মহিলা সমিতি সেইসব কাজও

করছে। মনে করা হয় যে আন্দোলনের এই ধারা মানবিক মুক্তি আন্দোলনের ধারার সাথে ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হয়ে ব্যাপক মাত্রা লাভ করবে। সুফিয়া কামাল আমাদের এই বিরামহীন, বহমান সংগ্রামের ধারায় অতীত ও বর্তমানের মাঝে ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন, অপূর্ব যোগসূত্র।

আমাদের নারী আন্দোলনের লক্ষ্য হল নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে, জনসাধারণের জাগরণের সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় আন্দোলনের একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আজ কেবলমাত্র মহিলা পরিষদ নয়, অন্যান্য নারী ও মানবাধিকার সংগঠন, উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় আন্তর্জাতিক নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ও প্রভাবে নারী আন্দোলন মানবাধিকার হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। নারী আন্দোলন শক্তি অর্জন করছে। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের পুরোভাগে সুফিয়া কামালের কণ্ঠে শুনি, "নারীমুক্তি মানেই মানব মুক্তি" এই শ্লোগান। সুফিয়া কামাল যেমন ছিলেন অগ্রসর চেতনার অধিকারী, তেমনি সমসাময়িক চেতনাকে দ্রুত ধারণ করার অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই পরিবারে নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচলিত বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করে নতুন সমতার নীতি সম্বলিত আইন প্রচলন করা, পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, যৌতুক ও বহুবিবাহ বিরোধী দাবি ও কর্মসূচিতে আইন তৈরি ও জনমত গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উদ্যোগে ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বা সর্বজনীন পারিবারিক আইন বাংলাদেশের আজকের নারী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হয়ে উঠেছে। আজ অন্যান্য নারী ও মানবাধিকার সংগঠন এই দাবিতে যথেষ্ট সোচ্চার। প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার ও পরিবর্তন এবং নতুন আইন প্রণয়নের দাবি আজ বাংলাদেশের সমগ্র নারী আন্দোলনেরই দাবি ও কর্মসূচি। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীসমাজকে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ দান ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, অর্থনীতির মূলস্রোতধারায় নারীসমাজকে বাস্তব অর্থে সম্পৃক্ত করার দাবিও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা আজ দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, নারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে। আজকের এই পরিবর্তন, সরকারি নীতি প্রণয়ন, অর্থনীতিতে নারীর দৃশ্যমানতায় সরকারের সদিচ্ছা, বেসরকারি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রভাব যেমন আছে, তেমনি নারী আন্দোলনেরও ভূমিকা রয়েছে। পূর্ণ মানবাধিকার ও মর্যাদা ভোগ করার জন্য, নারীর রাজনৈতিক অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুস্পষ্ট কর্মসূচি ও দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে মহিলা পরিষদ। রাষ্ট্র ও দেশ পরিচালনার নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যাতে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সচেতন ও দক্ষ হয়ে উঠতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ কাজ করছে সূচনা থেকেই। একজন সচেতন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য

নিজেদের আত্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, নারী কর্মীদের গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি দাবি রাখছে, লবি করছে দীর্ঘ সময় ধরে। ফলাফল আকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আজও উন্নীত হয়নি এটা সত্য হলেও আবার এটাও সত্য যে, মহিলা পরিষদ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন দীর্ঘকাল থেকে উদ্যোগ নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা, নারী নির্যাতন ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক জাগ্রত করার জন্য কাজ চলছে অক্লান্ত উদ্যোগে। নির্যাতিতা, আশ্রয়হীনা নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৫ বছর ধরে 'রোকেয়া সদন' নামে পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। 'রোকেয়া সদন' নামটি কবি সুফিয়া কামালেরই দেওয়া। বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের সেই 'তারিনী ভবন' হল সুফিয়া কামালের 'রোকেয়া সদন'। রোকেয়া সদনের প্রতিটি কাজে সুফিয়া কামাল উদ্যোগী ও সক্রিয় ছিলেন। এত আগ্রহ এত আনন্দ রোকেয়া সদনের কাজে! অনেক দুর্ভাবনাও ছিল এই সদন পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ হবে কিভাবে? একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থল হিসেবে কিভাবে একে তৈরি করা যাবে? কী অসীম অপার মমতাবোধ ছিল তার এই সদনে আশ্রিত নারী শিশুদের জন্য।

মহিলা পরিষদ যে ধারায় কাজ করছে, তাতে অন্যতম একটি প্রধান কাজ হলো নারীর স্বদেশ চেতনাবোধকে শাণিত করার কাজ। দেশপ্রেম জাগরিত করার কাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র ৪ বছরের মধ্যেই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমি বদলে যায়। স্বাধীনতার স্থপতি স্বাধীনতাবিরোধী ক্ষমতালোভীদের চক্রান্তে ও যোগসাজসে সপরিবারে নিহত হন।

দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে, শুরু হয় হত্যা, 'কু', পাল্টা 'কু' এবং ক্ষমতা দখল, পরিণতিতে দেখা দেয় সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, গণতন্ত্রের বিকাশের পরিবর্তে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। প্রায় দুই দশক ধরে চলে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জাতীয় সংগ্রাম। সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মহিলা পরিষদ দেশবাসীর পাশে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। স্বৈরশাসনের পতন, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠাসহ প্রায় সকল জাতীয় দাবিতে মহিলা পরিষদ সোচ্চার থাকে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত হয় ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ। ঐক্যবদ্ধ নারীসমাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী সংগঠন মহিলা পরিষদ-এর পুরোভাগে ছিলেন সুফিয়া কামাল। শতাব্দীর সহস্র বাধা, নিপীড়ন, অন্ধকার গৃহকোণে পড়ে থাকা নারীসমাজের মাঝে চেতনা সৃষ্টি, আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা, জাগরণ সৃষ্টি করার কাজ মহিলা পরিষদ আজও চালিয়ে যাচ্ছে। এই নিরলস প্রচেষ্টার আমৃত্যু নেতৃত্ব দিয়েছেন কবি সুফিয়া কামাল।

সুফিয়া কামাল এমনিভাবে মহিলা পরিষদ পরিচালনা এবং নেতৃত্বদানসহ অন্যান্য নারী সংগঠন ও ব্যক্তিদের সাথে ব্যক্তিগত যোগযোগের মাধ্যমে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের নারী আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন।

গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের যে নতুন পর্যায় শুরু হয়, তাতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও নারী সংগঠনগুলিও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সুফিয়া কামাল অতীতের নারী আন্দোলনের রেশ ধরে তাঁর সময়ের পরিবর্তনশীল নারী আন্দোলনকেও অগ্রসর করার ক্ষেত্রে দিকপালের ভূমিকা পালন করেছেন। মহিলা পরিষদ ছাড়াও অন্যান্য অনেক সংগঠন ও সংগঠনের নেত্রী ও সংগঠকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে উপদেষ্টা ও পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। নারী সংগঠন, নারী আন্দোলন ছাড়াও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিশু-কিশোর-ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মুক্ত চিন্তা-চেতনা বিকাশের সচেতন প্রয়াসে গড়ে ওঠা সাহিত্যিকদের সংগঠন শিখাগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত থেকে সুফিয়া কামাল প্রায় সকল ধরনের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও কর্মপ্রচেষ্টার সাথে যেমন জড়িত ছিলেন, তেমনি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে সেইসব দলের নেতা সংগঠকদের অনেকের সাথে তাঁর একটা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তিনি যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বা তাঁর পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছেন, তেমনি অন্যদিকে ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে মনি সিং প্রমুখ বামপন্থী নেতাদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভানেত্রী হিসেবে সোভিয়েতসহ অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ ও তাদের ধ্যান-ধারণা জানা ও দেখার সুযোগ তাঁর হয়। আমার কাছে শ্রদ্ধেয়া কবি সুফিয়া কামালের সারা জীবনের কর্মকাণ্ড ও জীবনাচরণ দেখলে মনে হয় কবি সুফিয়া কামাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই ভাবনার অনুসারী ছিলেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ...।"

সামগ্রিকভাবে একটা ইতিবাচক সমাজের আবহ তৈরি করার জন্য দরকার হয় যে মানবমুক্তি, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার, সেই সামগ্রিক আবহ তৈরির সকল প্রকার প্রয়াসে তিনি যুক্ত থাকার আগ্রহ, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা রেখেছেন তাঁর আপন কর্মপদ্ধতিতে। কোনো সংগঠনে তিনি সদস্য হয়ে যুক্ত হয়েছেন, কোথাও ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখেছেন, কোথাও পরামর্শ দিয়েছেন। নারী আন্দোলনের সময় শাসকগোষ্ঠী বা ক্ষমতাসীনদের সাথে কথা বলা, লবি করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজে শাসকদের চাপ দেয়া, কথা শোনানো, মানানো, দাবি আদায়—এইসব দুরূহ কাজে ব্যক্তি সুফিয়া কামাল নিজেই একটা বড়ো আন্দোলন, বড়ো শক্তি ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ সময়ের গড়েওঠা সাহসী সংগ্রামী ভাবমূর্তি বাংলাদেশের নারী আন্দোলন সর্বদাই কাজে লাগিয়েছে। সুশীল নাগরিক সমাজকে প্রভাবিত করা, সমাজের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠন পরিচালনা—এসব ক্ষেত্রেও কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন অগ্রণী। বিশাল বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবি সুফিয়া কামাল তার বহুমুখী কর্মপ্রতিভা দিয়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সংগঠকদের, নারী আন্দোলনকে লালন করেছেন, বিকাশের পথে অগ্রসর করেছেন।

আজকের বাংলাদেশে নারী আন্দোলনের চিত্র অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশেষ করে গত দুই দশকে বৈশ্বিক নারী আন্দোলনে জাতিসংঘের উদ্যোগে, প্রচেষ্টায়, কর্মসূচিতে, উন্নয়ন সংস্থার কার্যকলাপে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোগ চলছে। শত বছর বা পঞ্চাশ বছর পূর্বে নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, আজ নারীর সেই ব্যক্তিঅধিকারের স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে, জাতীয়ভাবে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নারীর ব্যক্তি অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ঘোষণা, বিশেষ কর্মসূচি দিচ্ছে। জাতীয়ভাবে শাসনতন্ত্রে নীতি গ্রহণ করছে, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা করছে। বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে সরকারিভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে।

বাংলাদেশের আজকের নারীসমাজের চেহারাও পরিবর্তিত হচ্ছে, শতমুখী বাধা ও শত সংকটের মাঝেও বাংলাদেশের নারীরা অগ্রসর হচ্ছে। পরিবারে, ব্যক্তিজীবনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, দেশের উন্নয়ন কাজে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, রাজনৈতিক অঙ্গনে মেয়েরা এগিয়ে এসেছে। মেধায়-মননে-চিন্তা-চেতনায়-কর্মে-স্পৃহায় এক নতুন আলোকিত নারীসমাজ তৈরি হচ্ছে।

দুহাতে আঁধার ঠেলে নারীরা এগিয়ে আসছেন আজকের বাংলাদেশে। নারীর এই জাগরণে—এই এগিয়ে আসার পথ যাঁরা একদিন পাথর কেটে তৈরি করেছেন, তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব কবি সুফিয়া কামাল। তাই তিনি আমাদের জননী সাহসিকা।

বাংলাদেশের মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রাম এবং জননী জাহানারা ইমাম

কামাল লোহানী

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটেছে বাংলাদেশে। এদেশের মানুষ জীবন ও সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় লড়াইয়ে দস্যু-হার্মাদ দলকে যেভাবে অতীতে পর্যুদস্ত করেছেন, ঠিক তেমননিভাবে আজও তাঁরা কখনও প্রবল পরাক্রমে, কখনও হতাশাগ্রস্ত দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধের মশাল হাতে ছুটে চলেছেন। কিন্তু একদিন, বাংলার মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস ভুলে গিয়ে আমরা কেমন যেন নির্জীব প্রেতাত্মার মতো সবকিছু আবার সইতে শুরু করে দিয়েছিলাম। ঠিক এমনি সময় আমাদের চৈতন্যে আঘাত করলেন এক মহীয়সী নারী। রাজনৈতিক প্রগতিশীলতায় উদ্ভাসিত স্নেহময়ী জননী জাহানারা ইমাম। যাঁকে আমরা ডাকি 'শহীদ জননী' বলে। তিনি দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার গৌরবদীপ্ত মুক্তির লড়াইয়ে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বন্দীশিবিরে নির্মম হত্যার শিকার তেজোদৃপ্ত তরুণ শহীদ রুমীর মা। কিন্তু তিনি হয়ে উঠেছেন প্রত্যয়দৃপ্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত নতুন এক লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি, বাংলার সকল মানুষের শহীদ জননী বীরমাতা জাহানারা ইমাম। এই ভূখণ্ডে জীবন্মৃত বাঙালি জাতিকে নতুন পথনির্দেশ করে এই মহান নেত্রী সূচনা করেছিলেন এক নতুন মুক্তিযুদ্ধের, যে-যুদ্ধ জয় আমাদের আজও সম্পন্ন হয়নি এবং যে-বিজয় আমাদের অনিবার্য। তাকে পূর্ণ করার প্রবল বাসনা প্রাণে পুষে জননী আমাদের ছেড়ে গেছেন কিন্তু তাঁর নির্দেশ আজও অব্যাহত। কারণ তিনি বলেছিলেন : 'স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্র আজও রাজনৈতিক অঙ্গনসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।"

তাই বাঙালি জাতির অংশ হিসেবে, গৌরবদীপ্ত অতীতের সংগ্রাম সংক্ষুব্ধ ইতিহাস বুকে ধারণ করে আমরা বারো কোটি মানুষ বেঁচে আছি সোনার বাংলা গড়ে জননীর সূচিত গণআন্দোলনের সফল বিজয়স্তম্ভ রচনার নিয়ত যুদ্ধে। যতদিন আমরা এই দেশকে

জামাত-শিবির, রাজাকার-আলবদর, আল শামস, ঘাতক দালালদের ঘৃণ্য চক্রান্তের রাহু থেকে মুক্ত না করতে পারব, ততদিন লখো শহীদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা কণ্টকমুক্ত হবে না। তাই শহীদ জননী সূচিত গণআন্দোলন বাংলার মানুষের প্রাণে যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল, তাকে আজ আবার জাগ্রত করতে হবে। করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সৎ ও দেশপ্রেমিক জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। গণঐক্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলতে হবে আমাদের। তবেই বিনাশ হবে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক অপশক্তির এবং এভাবেই শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আজ তাই শহীদ জননীর প্রয়াণ উপলক্ষে আসুন আমরা আমাদের সংকল্পের কথা পুনর্বার ব্যক্ত করি নবীন প্রয়াসে; জামাত-শিবির, রাজাকার, আলবদর, আল শামসসহ সকল ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে যতদিন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে রাহুমুক্ত করতে না পারব, ততদিন সচেতন প্রচেষ্টা যেন অব্যাহত থাকে শহীদ জননী সূচিত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গণআন্দোলন।

মনে পড়ে, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ক্যান্সারের সাথে সুদীর্ঘ একযুগ বসবাসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট হাসপাতালের বেড থেকে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর প্রতি 'শেষ আহ্বান' রেখে গেলেন। বললেন :

"সহযোদ্ধা দেশবাসীগণ,

আপনারা গত তিন বছর ধরে একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ স্বাধীনতাবিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। এই লড়াইয়ে আপনারা দেশবাসী অভূতপূর্ব ঐক্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আন্দোলনের শুরুতে আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের অঙ্গীকার ছিল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ রাজপথ ছেড়ে যাব না। মরণব্যাধি ক্যান্সার আমাকে শেষ কামড় দিয়েছে। আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি, রাজপথ ছেড়ে যাইনি। মৃত্যুর পথে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং অঙ্গীকার পালনের কথা আরেকবার আপানাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার ওয়াদা পূরণ করবেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে থাকবেন। আমি না থাকলেও আপনারা আমার সন্তান-সন্ততিরা, আপনাদের উত্তরসূরিরা সোনার বাংলায় থাকবেন।

এই আন্দোলনকে এখনও অনেক দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র ও যুবশক্তি, নারীসমাজসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই লড়াইয়ে আছে। তবু আমি জানি, জনগণের মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নয়। জনগণই সকল শক্তির উৎস। তাই একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধী বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় আন্দোলনের দায়িত্বভার আমি আপনাদের—বাংলাদেশের জনগণের হাতে অর্পণ করলাম। জয় আমাদের হবেই।" [সংবাদ : ০৭.০৭.৯৪-এ প্রকাশিত]

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মৃত্যুর আগেও যে প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনগণের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন এবং গণআন্দোলনকে সম্মিলিত প্রয়াসে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বভার আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন, তা কেবল সর্বস্তরের মানুষের প্রাণে প্রলয়ের দোলা লক্ষ করেছিলেন বলেই। সাধারণ মানুষের শক্তিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এটাও তিনি জানতেন, এই সাধারণ মানুষের একটি রাজনীতি আছে, যা শেষ বিশ্লেষণে সংগ্রাম সংক্ষুব্ধ জীবনের মানুষগুলোকে নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান দেয়। সে পৃথিবী অবশ্যই শান্তির। অসাম্প্রদায়িক এবং সন্ত্রাসমুক্ত। মৌলবাদী অপশক্তির দাপটকে উপেক্ষা করতে জানে সেই পৃথিবী। ভয়হীন নিঃশঙ্কচিত্ত দেশপ্রেমের সে দুনিয়া। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই কোনো, ঈপ্সিত সেই পৃথিবীতে। দুনিয়াজোড়া নিপীড়িত মানুষ জাগে সেই পৃথিবীটাকে প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্পে। তাই সাধারণ মানুষ—বাঙালি জনগোষ্ঠী শহীদ জননীকে তাঁদের জননী সাহসিকার আসনেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জাহানারা ইমাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সেই সংকল্প লক্ষ করেছিলেন 'নিবীর্য-দুর্বল' অপবাদে অবহেলিত বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনবাজি লড়াইয়ে। জানিদুশমন, ঐ পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রের গোলাবারির সামনে আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্ত বাংলার অকুতোভয় মানুষ—মেয়ে মরদ মজুর আর কিষানের বুক চেতিয়ে এগিয়ে চলার দৃপ্তদম্ভ পদবিক্ষেপ, তাই এনে দিয়েছে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লাল সূর্যকে স্বাধীনতার সবুজ জমিনে। কিন্তু যেদিন আমাদের পরিকল্পিত কল্যাণময় বাংলাদেশে পৌঁছবার যাত্রা হল শুরু, সেদিন থেকেই মুখব্যাদান করে এগিয়ে এল শ্মশানের চতুর শৃগালগুলো গোপন আস্তানার ফোঁকড় গলে। আশ্রিত পরভোজী ঘৃণিত নরকীটগুলো অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে উঠে আসতে থাকল বিদেশী প্রভুদের উচ্ছিষ্টের ভোজে, কেঁউ কেঁউ করে লেজ নাড়তে থাকল মনিবের করুণা আকর্ষণের নিরন্তর কামনায়।

মানুষের কল্যাণ ও সুন্দরকে হত্যার পাশবিকতায় যারা উন্মাদ, সেই পিশাচীশক্তির নতুন করে প্রাদুর্ভাব ঘটল মুক্ত স্বদেশেই। নবীন প্রয়াসকালেই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পিত জাল নিমেষেই গ্রাস করল বাংলাদেশকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হতবাক বিপুল সংখ্যক মানুষ। প্রাণ হারাতে হল বাংলাদেশের স্থপতি, অবিসংবাদিত জননেতা বাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে। কারণ, তাঁর ঔদার্য। তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলায় নতুন কোনো রক্তপাত ঘটাতে চাননি। চেয়েছিলেন দেশ গড়তে। সবাইকে সম্পৃক্ত করে নবনবীনজগত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। এই উদারতাকে দুর্বলতা ভেবে তাঁকেই আঘাত হানল এদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একটি সংকীর্ণ স্বার্থবাদী কুচক্রী সেনাদল পরাশক্তির মদদে। সেই সাথে পদলেহনকারী খুনি লুটেরা ঘাতক ও দালালগুলোও যেন লাইসেন্স পেয়ে গেল। ওরা তৎপর হয়ে উঠল নিজেদের সাংগঠনিকভাবে গুছিয়ে নিতে। যখন নানা প্রক্রিয়ায় ওদের উপস্থিতি ও অবস্থান লক্ষ করা গেল, তখন আমরা নিঃসহায়, নিরুপায়, কারণ মুক্তিযোদ্ধা বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করার অপপ্রয়াসে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কার্যকলাপ

ধীরে ধীরে প্রসারিত, মুক্তিযুদ্ধেই অংশগ্রহণকারী কিছু কুলাঙ্গার বাংলাদেশী পরভোজীর কূটকৌশলে, ক্ষমতায় আরোহন ও অবস্থান পোক্ত করার নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে।

বাংলাদেশের যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো গণতান্ত্রিক শক্তি ছাত্র ও সচেতন জনগোষ্ঠী—এই সব যুদ্ধাপরাধী, ঘাতক, দালালদের বিচার ও তাদের পুনর্বাসিত না করার লক্ষ্যে প্রবল দাবি উত্থাপন করে আসছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আন্দোলন এবং ছাত্রসমাজের মাধ্যমে। মানুষ ক্ষুব্ধ। নৃশংস আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর এই যুদ্ধবাদী নরককীটগুলোর সামাজিক নয় শুধু রাজনৈতিক পুনর্বাসন শুরু হলে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বাংলার স্বজনহারানো প্রতিটি বাঙালির প্রাণে। এমনি এক দীর্ঘ সময় অতিক্রমণের কালে আশির দশকের প্রথম দিকেই জামাত ও তার অঘোষিত আমির গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই আন্দোলনে না এগুনোর নির্দেশ দেন। তখন এই মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নীরব হয়ে যায়। অথচ ১৯৯১ সালের ২৯ ডিসেম্বর জামাতে ইসলামী ঐ যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকেই তাদের আমির হিসেবে ঘোষণা করল। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক আনুকূল্য পেয়ে যে গোলাম আযম ১৯৭৮ সালে মাকে দেখতে আসার অছিলায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে, সেই গোলাম আযম বায়তুল মোকাররমে নামাজ পড়তে এসে মুসল্লিদের হাতে জুতো খেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল। কোথাও গিয়ে তার জনসভা করতে পারেনি এগারো বছর। সেই গোলাম আযমকেই যখন আমির ঘোষণা করল; তখন বাংলার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত মানুষ প্রচণ্ড অপমাণিত বোধ করলেন। প্রতিবাদে ফুঁসে উঠলেন। এ যদি প্রতিরোধ করা না যায় তবে বাংলার মানুষের আজন্মলালিত স্বপ্ন ও একনদী রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অবমানিত করা হবে। তাই জামাতি ফ্যাসিবাদ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে 'সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি' গঠন করলেন জাহানারা ইমাম ১৯৮০ সালেই। প্রগতিশীল চিন্তা চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ এবং মুক্ত বাংলাদেশের সচেতন কিছু বাঙালিই এই উদ্যোগ নিলেন। ১৯৮১ সালের ২৫ মে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণের স্টেডিয়াম গেটে এই কমিটিই এক জনসমাবেশের আয়োজন করল মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিশাল এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ড. আহমদ শরীফ। এইখানেই যখন জাহানারা ইমামকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করলেন ঘোষক, তখনই জনারণ্যে উঠল গগবিদারী শ্লোগান, 'মাগো তোমায় কথা দিলাম, অস্ত্র আবার হাতে নেব, মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার।' তিনি দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়ালেন, দৃপ্তকণ্ঠে সবাইকে 'সন্তান' সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করলেন। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ডাক দিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান জানালেন। জাহানারা ইমাম হলেন 'শহীদ জননী'। শহীদ রুমী নয় শুধু, সকল মুক্তিযোদ্ধার মা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা তাই আমরা লক্ষ করেছি জাহানারা

ইমামের আন্তরিক ও অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মতৎপরতায়। তিনি দেশময় ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গণআদালত সংগঠনের মধ্য দিয়ে। এবং এই প্রয়াসেই তিনি জাগরিত করেছিলেন বাংলার আপামর জনগণের বিবেক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রদীপ্ত মশালকে সমুন্নত রেখেছিলেন বিভ্রান্ত এবং মোহগ্রস্ত আমাদের অনুভূতিকে আঘাত করে, বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সাধারণ ক্ষমার সুযোগ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অধিকার ভোগ করলেও আশির দশকে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্য তারা ধর্মকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। দেশীয় সংবিধানের মৌলস্তম্ভ 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে উপেক্ষা করে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোগ এবং সমর অধিনায়ক জিয়াউর রহমানের হত্যার পর ক্ষমতায় আরোহণকারী নব্যশাসক এরশাদের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ধর্মকে ব্যবহার ও ব্যবসার বিষয়বস্তুতে পরিণত করল মধ্যপ্রাচ্যের প্রভুদের তুষ্ট করা এবং বাংলার সরলমনা ধর্মপ্রাণ মানুষকে নতুন করে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাজনীতি এরশাদের সামরিক শাসনামলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। একে প্রতিরোধ করার অঙ্গীকার নিয়ে সৃষ্টি হল 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি।' জাহানারা ইমাম হলেন এ কমিটির সদস্য। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সমর্থনের অভাবে প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। অথচ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামাত-শিবির অপশক্তির তৎপরতা বেড়েই যেতে থাকল এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ওরা ঘাঁটি স্থাপন করল চট্টগ্রামে। গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলল গোপনে। কৌশলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে ক্রমশ অবস্থান দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে যেমন বসবাস করতে শুরু করল, তেমনি পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজেদের 'ছাউনি' তৈরিতে মনেযোগী হল। ক্রমশ বসতি স্থাপন, গরিব ছাত্রদের সাহায্য, ভর্তিতে সহযোগিতা, গরিব কৃষকদের লাঙ্গল কিংবা গরু কেনার অর্থ জোগান, দায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যাদানে অর্থ দিয়ে ঘরের চালা তুলতে টিন কিনে দিয়ে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে জামাতিরা নিজেদের কর্মধারা শুধু অব্যাহতই রাখল না, মানুষকে বাহ্যিকভাবে দুর্বল করে ফেলল। এইভাবে ওরা ওদের ছাউনি পত্তন করে যাচ্ছিল। সরলমনা গ্রামবাসীকে ধর্মের দোহাই পেড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, সংগঠন ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্ত করতে সামান্যতম কসুর করেনি জামাত-শিবির। কিন্তু সেই তুলনায় প্রতিরোধের কোনো শক্তির যৌথ উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছিল না। অবশ্য বিচ্ছিন্ন ভাবনা, বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ যে হয়নি, এটাও বলা যাবে না। এমনি এক মোক্ষম মুহূর্তে জামাত তাদের দলীয় আমির হিসেবে পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে ঘোষণা করার দুঃসাহস দেখাল। দিনটি ছিল ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১। এই ঘোষণা প্রচারিত হবার সাথে সাথে সারা বাংলায় যেন এক প্রচণ্ড প্রতিবাদী ঝড় উঠল। চারদিক থেকে খবর আসতে থাকল স্বতঃস্ফূর্ত সভা-সমাবেশ, মিছিল আর ক্ষোভ-বিক্ষোভের। এই সময় শহীদ জননী তাঁর ব্যাকুলতা ও ঘৃণা প্রকাশ করে বলেছেন : এই ঘৃণিত শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল সব

সময়ই। অনেকে নানাভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনও তৈরি করেছেন কিন্তু তা বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের শক্তির বিতর্কিত অবস্থান বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে মানুষের মধ্যে, সচেতন মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন, খানিকটা হলেও। ফলে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনো অবস্থাই সৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছিল না।

কিন্তু স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল একধরনের পরোক্ষ ঐক্য। দেশে গণজোয়ার সৃষ্টি হল, পতন হল সামরিক দুঃশাসনের নরপতি এরশাদের। তারপর রাজনৈতিক নবযাত্রার যে সূচনা হল, তার মাধ্যমে কৌশলে জামাতিরা নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেল এবং আঠারোটি আসন জিতে পার্লামেন্টে বসবারও অধিকার অর্জন করে ফেলল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করল মৌলবাদী ঘাতক পিশাচেরা। কিন্তু এতদিন নীরব নিষ্ক্রিয় থাকলেও গোলাম আযমের আমিরত্ব সবার চৈতন্যে আঘাত হানল। তাই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নূরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, ফাতেহ আলী চৌধুরীসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ৯ জানুয়ারি ১৯৯২ কর্নেল জামানের বাসায় এক বৈঠক আহ্বান করেন। আলাপ আলোচনার পর ঘাতক দালাল প্রতিরোধে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। দুদিন পরে কর্নেল জামান জাহানারা ইমামের সাথে তাঁর বাসায় গিয়ে আলোচনাও করেন। বেগম সুফিয়া কামালকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠনের কথা চিন্তা করে ১৩ জানুয়ারি বেগম সুফিয়া কামালের কাছে গিয়ে প্রস্তাবটি পাড়েন। কিন্তু সর্বজনশ্রদ্ধেয় বেগম সুফিয়া কামাল নিজের অসুস্থতার কথা জানিয়ে জাহানারা ইমামকেই আহ্বায়ক করে কমিটি সংগঠনের প্রস্তাব দেন। অবশেষে জাহানারা ইমাম হন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র আহ্বায়ক এবং ১০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে বামপন্থী প্রগতিশীলদের প্রাধান্য ছিল লক্ষণীয়। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ এর সাথে যুক্ত ছিল না।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ মূলত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি' (প্রথমে এর নাম ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ) ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণের ঘৃণাকে আরো শক্তিশালী করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই এবং বেগবান আন্দোলন সৃষ্টি করে গোলাম আযমসহ ঘাতকদের বিচার ও শাস্তি বিধানের তাগিদে। তাই এই জাতীয় সমন্বয় কমিটি ছিল ৭০টি সংগঠনের একটি প্রতিনিধিত্বশীল মোর্চা। কিন্তু এর ঐক্য কখনও কখনও জনমনে সংশয় সৃষ্টি করেছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি বাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। ফলে এ সন্দেহ সবার মনেই ছিল, এঁরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে আদৌ উঠতে পারবেন কিনা। আর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ছিল বামচিন্তা প্রভাবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি এদের আনুগত্য ছিল না, বরং

দলীয় প্রভাব যেন আন্দোলনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে না ফেলে, সে চিন্তাই তারা করতেন। ফলে কেউ কেউ ভাবলেন দুই সংগঠনের লক্ষ্য এক হলেও যাত্রাপথের বিভিন্নতার কারণে নিজেদের শক্তিকে দুর্বল এবং সূচিত আন্দোলনের নিদারুণ ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। তাই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রচণ্ডতা গড়ে তুলবার লক্ষ্যেই একদিন এই দুটি নামকেই অক্ষুণ্ন রেখে সংগ্রামের সমন্বয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হল আর সেখানেও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেয়া হল। এত সংশয়, মতানৈক্য সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে তিনি গড়ে তুললেন জাতীয় ঐক্য। ধারা-উপধারার বিরোধ, রাজনৈতিক আদর্শের ফারাক, ভিন্নমত ও কৌশল সবকিছুকে ছাপিয়ে শহীদ জননী রাজনীতিবিদ ও দলনিরপেক্ষ শক্তির পার্থক্যকেও নিরসন করলেন, ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের সংগ্রামী চৈতন্যকে এক করে নতুন এক ধারার সূচনা করেছিলেন জাহানারা ইমাম তাঁর এই সাধনায়। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আজকের প্রজন্মকেই নবতর পর্যায়ের এই চূড়ান্ত পর্বের মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতি ঘটাতে হবে এবং অর্জন করতে হবে আরেক বিজয়, যা আমাদের সকলের প্রত্যাশিত।"

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও আধুনিক শিক্ষায় হয়েছিলেন শিক্ষিত। গড়ে উঠেছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবার ঘরে। প্রথম জীবনেই যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষকতা পেশায়। মহতী এই পেশায় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা জাহানারা ইমাম একদিন অনুধাবন করলেন—মানুষ বড়ো, মহীয়ান, এই স্কুল কলেজের গণ্ডি তার শেষ কীর্তি নয়, তার আরো অনেক কিছু করার আছে। বেড়ে গেল তাঁর মানুষের ওপর আস্থা। জীবন সংগ্রামের সংকল্প তাঁকে আরো দৃঢ় করল। তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রকৌশলী স্বামী শরীফুল আলম ইমাম আর জ্যেষ্ঠপুত্র তরুণ রুমীকে হারিয়ে প্রত্যয়দৃপ্ত জননী হয়ে উঠেছিলেন আরো শাণিত ক্ষুরধার। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলায় শকুনির মচ্ছবে তিনি শোকাভিভূত হয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেননি, হৃদয়ের সকল অনুভূতি ও চেতনার তাগিদে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের পৈশাচিক কাহিনী বিধৃত করেছেন তাঁর হৃদয়স্পর্শী লেখায়। কিন্তু শুধু আবেগ প্রকাশ করে ক্ষুব্ধ লড়াইয়ের দিনলিপি তিনি রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর বুকের ভেতর যে ঘৃণার পাহাড় ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি করেছিল, একদিন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। সূচিত হল চেতনাদৃপ্ত গণআন্দোলনের।

২৬ মার্চ, ১৯৯২। একাত্তরের ঘাতক দালাল এবং নরখাদক ও যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবির, আল-বদর, আল-শামস্ ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে বসল গণআদালত। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে কী বিশাল এক গণসমাবেশ। জাহানারা ইমাম, শহীদ জননী সেই জনতার আদালতে প্রধান ব্যক্তিত্ব। সাহসদৃপ্ত প্রত্যয়ের মূর্ত প্রতীক এই মহীয়সী নারী। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বিচারকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। গণআদালতের সূচনাই হল গোলাম আযম নামের এক কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি

দখলদার বাহিনীর হুকুম বরদারের বিরুদ্ধে ১০টি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধের বিবরণ উত্থাপন করে। তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়লো। মিছিলে মিছিলে সয়লাব নগরীর আকাশ থেকে বজ্র টেনে যেন বাংলার সকল মানুষ একই সঙ্গে শ্লোগান ধরেছে, 'খুনি গোলাম আযমের ফাঁসি চাই,' 'বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করো, গণআদালতের রায় কার্যকর করো' ইত্যাদি। এই গগনবিদারী আওয়াজ আর হাজার হাজার মানুষের পদভারে প্রকম্পিত রাজধানী সেদিন যে প্রত্যয় ঘোষণা করেছিল, তারই উদ্ঘাটন করলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, বুদ্ধিজীবী সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ৭০টি সংগঠনের সমন্বয়ে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি।' দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণজোয়ার সৃষ্টি করল সমন্বয় কমিটির এই আন্দোলন।

বাঙালি জাতিকে তার নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বঙ্গীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ক্যান্সারের সঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও ব্যাধিবোধকে অতিক্রম করে উল্কার বেগে ছুটে বেড়ালেন তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত। কী যে মন্ত্র জপলেন শহীদ জননী, সমগ্র জাতি অসীম সাহসে এক ও একনিষ্ঠ হয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়ালেন। এ যে কী অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করলেন, তার হিসাব মেলানো যাবে না আজ। দেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের চৈতন্যে বিশ্বাসী মানুষকেও যাচাই করে নিতে হচ্ছে, কারণ একাত্তরে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সবাই সেই চেতনা ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। কেউ কেউ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কৌশলগত অভিযানের দোসর বনে গেছেন ইতোমধ্যেই। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে শিরে স্থাপন করে আগাগোড়াই জামাত-রাজাকারদের সাহায্য সমর্থন নিয়ে দল গঠন ও তাদের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থানকে স্থায়ী ও দৃঢ় করার চেষ্টা করেছে। আবার এদের হটিয়ে দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতায় আরোহণ করার খায়েশ পূরণ করতে ওই জামাতি সমর্থনই নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী আওয়ামী লীগও।

শহীদ জননীর নেতৃত্বে বিপুল সংগ্রাম শুরু হবার পরিপ্রেক্ষিতে শাসকচক্র জাতীয়তাবাদী বিএনপি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হল। ভাবল, যদি তাদের ক্ষমতার পেছনের মদতদাতা শক্তিকে এভাবে নাস্তানাবুদ করা হয়, তাহলে তাদের তো টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং যে করেই হোক, এই গণমানুষের অভিযাত্রাকে থামাতেই হবে। কী যে মুর্খের চিন্তা! যায় কি কখনো জনতার রোষকে থামানো? শক্তিমদমত্ত হিটলারও কি পেরেছিল তার ক্ষমতা ধরে রাখতে? তবুও খালেদা জিয়া সরকার ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিককে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করল। এক্ষেত্রে নেত্রী জাহানারা ইমাম মরণব্যাধিতে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী হওয়া সত্ত্বেও এই অভিযোগ থেকে রেহাই পেলেন

না। গণআদালতের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি রইলেন এক নম্বরে। খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমন্বয় কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবার, কিন্তু তিনি তা নেননি। 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে গৌরবের মৃত্যুবরণ করেছেন জাহানারা ইমাম। তাকে সালাম, লাখো কোটি সালাম।

১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ। যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম অনুসন্ধানের জন্য জাতীয় গণতদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা প্রদান করলেন জাহানারা ইমাম। সেদিন ছিল গণআদালতেরও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সকল সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। সমাবেশে আগত নেতা কর্মীরা নিগৃহীত হলেন পুলিশের হাতে। এর প্রতিবাদে ২৮ মার্চ প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলেন জাহানারা ইমাম। এদিনও পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছিল বঙ্গবন্ধু এভিন্যু থেকে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত। ২৮ মার্চ জাতীয় সমন্বয় কমিটির মিছিলে আকস্মিকভাবে পুলিশ হামলা চালাল। বেধড়ক পেটাল ছেলেবুড়ো, মেয়ে-পুরুষ বাছবিচার না করেই। শহীদ জননী আঘাতপ্রাপ্ত হলেন। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত মানুষ। তার ওপর খালেদা জিয়ার পুলিশ হামলা করতে পিছপা হল না। ওদের হাত কাঁপল না। ওরা নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকল। কারণ ওরা জানে জামাত ছাড়া ওদের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশন ৩ জন যুদ্ধাপরাধীর দুষ্কর্মের বিবরণ জাহানারা ইমামের হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি আরও ৮ জনের নাম ঘোষণা করে বললেন, এদের সম্পর্কেও তদন্ত করা হবে। এরপর তিনি অসুস্থতার জন্য ঢাকা ছাড়লেন ২ এপ্রিল।

১৯৯৪ এপ্রিল শহীদ জননী জাহানারা ইমাম গিয়ে উঠলেন তাঁর বেঁচে থাকা কনিষ্ঠ পুত্র সাইফ ইমাম জামীর মিশিগান রাজ্যের ওয়েস্ট ব্লু ফিল্ডের বাড়িতে। যখন থেকে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন থেকে স্বাভাবিকভাবেই ছেলের কাছে গিয়ে উঠেছেন। এবারও তিনি তাই করলেন। ৭ এপ্রিল ডেট্রয়েট হাসপাতালে তাঁকে বলে দেয়া হল, দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে মরণ রোগ তাঁকে পর্যুদস্ত করতে রীতিমতো ফাঁদ পেতে বসেছিল, এবার সে তার শেষ চক্রান্তের জালে পেঁচিয়ে ফেলেছে শহীদ মাতাকে। জননীর কণ্ঠনালীতে ছড়িয়ে গেছে ক্যান্সার। এবার বুঝি আর ...। অজানা আশঙ্কায় অকস্মাৎ কেঁপে ওঠে প্রাণ। প্রতিনিয়ত খবর আসছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আজ তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ... কাল রাত কেটেছে আশঙ্কায় ...উদ্বেগ আকুল আমরা সবাই। আজ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ, ... খেতে পারছেন না তিনি ... লিকুইড দেয়া হচ্ছে ...তরল খাবারও যাচ্ছে না ... কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ানোর চেষ্টা অব্যাহত ... শরীর ফুলে গেছে, ইত্যাকার আশঙ্কাজনক অবনতির কথা প্রতিদিনই শোনাচ্ছেন ডেট্রয়েট থেকে ঢাকায় জাতীয় সমন্বয় কমিটির কাউকে না কাউকে। দেশের জাতীয় দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এ খবর। কারণ দেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিনকার অবস্থা জানতে চান।

মে মাসের শেষদিকে খবর এল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক শহীদ জননী জাহানারা ইমামের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। অবস্থা অপরিবর্তিত। মিশিগান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, শারীরিকভাবে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন, কিন্তু মনের বল একটুও কমেনি। ... একই সূত্র খবর দিয়েছে শহীদ জননীর চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে। তাঁকে ব্যথা প্রশমনের জন্য ওষুধ দেয়া হচ্ছে এবং ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি কথা বলতে পারছেন না। কারণ মুখের ক্যান্সারের টিউমার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তিনি যা বলার লিখে জানাচ্ছেন।

জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সবসময়ই তাঁর ছেলে জামীর সাথে যোগযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এছাড়া বাঙালি চিকিৎসক কিংবা সমন্বয় কমিটির মিশিগানের দুএকজনও ফোনের মাধ্যমে খবরাখবর দেয়া-নেয়া করছিলেন। প্রথমাবস্থায় ডাক্তাররা যখন জানিয়ে দিলেন—ক্যান্সার চিকিৎসার আওতা ছাড়িয়ে গেছে, তখন থেকে শুধু মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া আর কি কোনো উপায় ছিল? তা ছিল না বটে, কিন্তু মায়ের মন ছিল প্রচণ্ড সাহসে বলীয়ান। মে মাসে যখন অপারেশন টেবিলে গিয়ে শল্যবিদরা বুঝতে পারলেন অপারেশন করাও সম্ভব নয়, সেদিনই সবাই কেন, শহীদ জননী নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন, এখন শুধু তাঁর দিন গোনার পালা। কিন্তু মাতৃহৃদয় তাতে এতটুকুও শঙ্কিত কিংবা বিচলিত হয়নি। কারণ শহীদ জননী জানতেন তিনি লাখো লাখো মৃত্যুর জিম্মাদার, তাঁর কোনো ভয় নেই। মৃত্যুভয় এখন ঘাতক গোলাম আযম তথা জামাত-শিবির আলবদর আর রাজাকারসহ ফেলে যাওয়া পাকিস্তানি হায়েনাদের। শঙ্কিতপ্রাণ ঐ পিশাচগুলোর। ওরা তাই চিৎকার করে বাঙালির বিরুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিশ্চিহ্ন করতে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। মহিলাদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখাবার মতো সামান্যতম বোধও তারা হারিয়ে ফেলেছে। লাখো কোটি মানুষের হৃদয় জয় করা শিক্ষিকা, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতি সচেতন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মতন ক্যান্সার আক্রান্ত শ্রদ্ধাস্পদকে কুৎসিত ইঙ্গিতসহ ন্যক্কারজনক ভাষায় আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সেই গণশত্রুর বিরুদ্ধে যাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম তাঁর কিসের ভয়? অপ্রতিরোধ্য বাঙালি চৈতন্য তাঁকে দিয়েছে ঘাতকের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস। আমরা তাঁরই হৃদয় উৎসারিত প্রেরণার বিপুল বৈভবকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু মাগো তোমার আলোকবর্তিকা হাতে আমরা ধর্মান্ধতাকে ঘুচিয়ে, সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির বেড়াজাল থেকে যখন এই বিশাল উপলব্ধিকে মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা, অধিকারের প্রত্যয়ে বলীয়ান করতে চাইছি, এমনই এক সংকট মুহূর্তে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, এ যে আমরা সইতে পারছি না। তোমার খবর পেয়ে প্রতি মুহূর্তে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে আমাদের মন। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি, যখনই দেখছি সেই হায়েনার দল আবারও ঐ মুক্তিযুদ্ধের 'সৈনিকদের কাঁধে' ভর করেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। নিতান্তই ক্ষমতার লোভ আমাদের বিভ্রান্ত করে নিয়ে চলেছে নিঃসীম অন্ধকারে। চোখ থাকতেও আজ আমরা যেন অন্ধ। যে-কোনো কারণেই আমরা কি পারি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চৈতন্যকে ঘাতক পিশাচ জামাত-খুনিচক্রের কাছে সমর্পিত করতে?

জাতিসত্তার অহংকার আমাদের দেবে অভিশাপ। আমরা মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে যাতে নিজেদের গর্বিত সত্তায় বুক উঁচিয়ে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে না পারি, সে কারণেই তো ঐ ঘৃণ্য পশুর দল আমাদের রাজনীতিবিদ লেখক শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক চিকিৎসক সংগঠকদের হত্যা করেছে বেছে বেছে। মাকে অপমানিত করেছে, বোনকে করেছে লাঞ্ছিতা, স্ত্রীকে করেছে নির্যাতন। বাবাকে হত্যা করেছে। ভাইকে করেছে খুন। বন্ধুর বুক চিরে কলজে খুবলে খেয়েছে। চোখ উপড়ে নিয়েছে ঐ পিশাচের দল। ওদের সাথে সখ্য হবে কেমন করে? এটা যারা না বুঝে এগিয়ে গেছে সাময়িক স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে, তাদের নিজ সত্তায় ফিরে আসতেই হবে। নতুবা স্খলন ঘটবে অস্তিত্বের। আর এখানেও মাকেই মনে পড়ে। সে মা-ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। নাহলে গণসংগ্রামের অগণিত মানুষের ত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে আত্মাহুতি, বিপুল রক্ত বিসর্জনের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পতাকা, সর্বোপরি আমার অস্তিত্ব, আমার স্বদেশ, আমার গর্ব এই সোনার বাংলা—সবই কি মরীচিকায় বিলীন হয়ে যাবে? না, মাগো, তা হতে পারে না। আমরা তোমার অবাধ্য সন্তান তা হতে দেব না। কিছুতেই না।

তবু তোমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল। জামী জানাল, এ অবস্থায় মা ফিরে যেতে চান, কিন্তু চিকিৎসকেরা বললেন তা আদৌ সম্ভব নয়। অবস্থার অবনতি দেখে জাতীয় সমন্বয় কমিটি সার্বক্ষণিক সমাচার কেন্দ্র স্থাপন করল। পরের দিনই খবর এল, গলার টিউমার বাড়ছে। মুখ আর গলা ফুলে গেছে। ওষুধ দেয়া হচ্ছে ব্যথা কমানোর জন্যে। তাছাড়া তিনি সম্পূর্ণ সচেতন এবং চিন্তাশক্তিতে আগের মতোই রয়েছেন। মাঝে মধ্যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তরল খাবার দেয়া হচ্ছে, ফলে শারীরিক দুর্বলতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁর অনুপস্থিতি যেন আন্দোলনকে দুর্বল না করে ফেলে, তার জন্য তাগিদ দিয়ে জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতাদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন। জুনের প্রথম সপ্তাহে পারিবারিক সূত্রে খবর পাওয়া গেল অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। শরীর ফুলে গেছে। খাওয়ানো আর যাচ্ছে না। ঘুমের ওষুধ দিয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন করেই রাখা হচ্ছে প্রায় সবসময়। কারণ কণ্ঠনালীর টিউমারটি আরও বড়ো হয়ে শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। কদিন হল লিখে তাঁর মনের কথাগুলো ছেলে বা ডাক্তারদের জানাচ্ছেন। পরিবারের লোকজনকে দেখতে দেয়া হচ্ছে না। সকলকে দোয়া করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এরপর অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। আত্মীয়-পরিজনও উদ্বিগ্ন।

১০ জুন খবর এল শহীদ জননীর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। তিনি লিখে যা জানাচ্ছিলেন তাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং কথা বলার শক্তি চিরকালের জন্য রহিত। ছেলে ও আত্মীয়-পরিজন এবং চিকিৎসকরা সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক রয়েছেন। ১২ জুন পারিবারিক সূত্র থেকে জানা গেল, অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটেনি। একই অবস্থায় বিছানায় নির্জীব অবস্থায় শুয়ে রয়েছেন। ওষুধের প্রতিক্রিয়া, কিছু খেতে না পারা এবং রোগযন্ত্রণা মিলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, অন্য কোনো ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করার অবস্থাও আর নেই। ১৬ জুন শরীরের অবস্থা সম্পর্কে কোনো নতুন খবর নেই। বরং ক্যান্সার ইতোমধ্যে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। শহীদ জননীর দেহ

ও মন সংঘবদ্ধভাবে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এখনও সংগ্রাম করে চলেছে। চিকিৎসকরাও বিস্ময়ে হতবাক। ১৮ তারিখে খবর এল, এখন শুধু অবনতি ঘটছে। প্রতিদিনই অবনতি। চিকিৎসকরা, জামী ও আত্মীয়স্বজন সবাই গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন।

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই খবর পৌঁছল, অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। শ্বাসকষ্ট অত্যধিক বেড়ে গেছে। কাউকে চিনতেও পারছেন না। আরেক জায়গা থেকে জানলাম, খাওয়া একেবারে বন্ধ। কৃত্রিমভাবে খাওয়ানোও সম্ভব হচ্ছে না। সমন্বয় কমিটির যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহ্বায়ক ডাঃ নূরুন্নবী ফোনে জানিয়েছেন : অবস্থা উদ্বেগজনক। কখন যে কি হয় বলা যায় না। হলও তাই। ২৬ জুন, ১৯৯৪ মিশিগান সময় সকাল ৯টায় শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ঘুমের মধ্যেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ফোনে খবর পেলাম, মাগো তুমি আর নেই। তখন ঘরে চলছিল আমারই জন্মদিনের অনুষ্ঠান, ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড় আয়োজন প্রায়-বুড়ো বাবার জন্যে। আচম্বিতে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হল অনুষ্ঠান। স্বদেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শয়নের জন্য জননী ঢাকায় এলেন ৪ জুলাই। বিমানবন্দরে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম সুফিয়া কামাল ও ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ তাঁর কফিন গ্রহণ করলেন। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচজন সেক্টর কমান্ডার তাঁকে অভিবাদন জানালেন। বাইরে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার মানুষ। শহীদ রুমীর বীর প্রসবিনী মা জাহানারা ইমাম প্রত্যেকটি বাঙালির মনে যে আসন পেতে রেখে গেছেন, শুধু আন্দোলন করে নয়, ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে যে বিপুল উদ্দীপনায় সাহসী করে নতুন জনম দিয়ে গেছেন—তারই জন্য। ধর্মব্যবসায়ীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে শ্লোগান, আজ তা সবার মধ্যেই উচ্চারিত। এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সকল মানুষকে সচেতন করে দিয়ে গেছেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বলতেন : এই যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবির আলবদর আল শামস ও রাজাকার বিরোধী আন্দোলন দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল, একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার ও শাস্তির প্রশ্নে; তাকে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। মানুষতো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি নরঘাতক ও তাদের দোসর পিশাচশক্তির নির্যাতনের কথা ভুলে যায়নি, তাই সব মানুষই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুক্ত হয়েছিলেন এই নতুন লড়াইয়ে। সমস্বরে উচ্চারণ করেছেন বজ্রকণ্ঠে—'ঘাতক দালালদের ফাঁসি চাই।' সব রাজনীতির মানুষ এক হয়েছেন এই প্লাটফর্মে—এটা আমাদের সাফল্য।

তিনি বলতেন : যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, এই আন্দোলনের ফলে সেই নতুন প্রজন্মের মনে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে চায়। একাত্তরে কী ঘটেছিল, কারা আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে ও কারা বিপক্ষে ছিল, তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে নতুন প্রজন্মের ভেতর। আসলে এই আন্দোলন সবার মনে আশা জাগিয়েছে, ঘাতক দালালদের বিচার হবেই, এ তারা বিশ্বাস করেন। গোলাম আযমের

ফাঁসি, জামাত-শিবির-ফ্রিডম পার্টি-যুব কমান্ড নিষিদ্ধের দাবি, রাজনৈতিক দলগুলোর মিলিত প্রচেষ্টা, সত্যিই প্রশংসনীয়। এটি আমাদের সাফল্য। তাছাড়া এতদিন স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য দিয়ে ভেতরে ভেতরে যারা জামাত-শিবিরের পক্ষে কাজ করছিল, এই আন্দোলন তাদেরও মুখোশ খুলে দিয়েছে।

শহীদ জননী দৃঢ়কণ্ঠে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা না হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমার স্থির বিশ্বাস—স্বাধীনতার সপক্ষের জনগণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের জনগণ এই আন্দোলনে আছে এবং এই আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই থাকবে। জনগণের কোনো আন্দোলনই ব্যর্থ হয়নি, আমাদের অতীত ইতিহাসও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। জনগণের মিলিত শক্তির কাছে কেউ টিকতে পারে না, এবারও পারবে না। আন্দোলন যত বেগবান হবে, আমাদের বিজয় তত কাছে আসবে।"

জাহানারা ইমাম বিশ্বাস করতেন প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত হলেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ভীত হয় এবং চক্রান্ত আঁটতে থাকে। যেমন পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে আমাদের যে কোনো আন্দোলনকেই শোষক-শাসকশ্রেণী 'কমিউনিস্ট প্রভাবিত অথবা ভারতীয় দালালদের কীর্তি' বলে বাংলার সরলমনা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রয়াস চালাত। একই পাকিস্তানি স্টাইলে বর্তমান ক্ষমতাসীনরাও আমাদের আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে চায়। তাই তারা জামাতের সাথে আঁতাত করে। মুক্তিযুদ্ধের কথা তোয়াক্কা করে না।

শহীদ জননী মনে করতেন : "নারী নির্যাতনের ফতোয়াবাজদের লম্ফঝম্পের পেছনেও জামাতের কালো হাত আছে। তাই একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার ও শাস্তিই ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার নির্দশন হতে পারে। ঘাতক দালাল আর ফতোয়াবাজদের মধ্যে কোনো তফাত নেই।" তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল : "বাঙালির সাহস হারাবার নয়। অন্যায়কে রুখতে জানে বাঙালি। অতর্কিতে হামলা হলেও প্রতিরোধ গড়তে প্রস্তুত। সাহস আজ তার কব্জায়। তাই একদিন বাঙালি জেগে উঠবেই।"

তাঁর অবর্তমানে নেতৃত্ব সংকট প্রসঙ্গেও তিনি প্রত্যয়ের সাথে জানিয়ে দিয়েছেন : "নেতৃত্ব কখনও উত্তরাধিকারের ফল নয় বরং সময়ই নেতা তৈরি করে। তাই আমার অবর্তমানে আপনারা একত্রে থাকবেন, কারণ এ কাজতো আমি একা শুরু করিনি। সবাই মিলেই শুরু করেছি এবং শেষ করবার দায়িত্বও আমাদের সবার। যে গণসচেতনতা জেগেছে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে, তাকে রোখা যাবে না। আমি আশা করি, এ জোয়ার অবশ্যই থেমে থাকবে না। হাল আপনাদের হাতেই থাকবে। এজন্য আমার অবর্তমানেও আপনারা এমনিভাবে সংঘবদ্ধ থাকবেন, প্রতিবাদে-প্রতিরোধে এগিয়ে যাবেন এবং বিচার হবে তাদের যারা আমাদের সন্তানদের জান কেড়ে নিয়েছিল, স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল—এটা আমার প্রার্থনা।"

আত্মসমালোচনা করেই বলি, সূচিত সংগ্রামের বিপুল গণজাগরণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে, জামাত-শিবিরকে জাতীয় সংসদে প্রবেশ করতে দেয়নি। কিন্তু আমাদের সেই

জাগ্রত জনগোষ্ঠীর সাহসী নেতৃত্ব যেন আজ স্তিমিত, ক্লান্ত। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে কর্মসূচি অব্যাহত থাকলেও, যেন সেই তোড় হারিয়েছে প্লাবনের উচ্ছ্বাস। গণসমুদ্রে যে উত্তাল তরঙ্গ রক্তস্বাক্ষরের সীমন্তিনী এই বাংলার জনপদে মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছিল নিজ কতর্ব্য পালনের অঙ্গীকারে, শক্র হননের বিপুল প্রত্যাশায়, সে কি আজ গুমোট মেঘের আড়ালে ঢাকা সূর্যের মতন? আমরা তো চাই, শহীদ জননীর শেষ প্রার্থনার আবেগে উদ্বেলিত জনমণ্ডলীর বজ্রনির্ঘোষ কর্মসূচি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে বাধ্য করবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তিকে। নিষিদ্ধ হবে ধর্মব্যবসা, ধর্মান্ধ রাজনীতি। শাস্তি পাবে জামাত-শিবির-রাজাকার চক্র। সামাজিকভাবে ওদের বয়কট করে শেকড় উপড়ে ফেলব আমরা। আমাদের বিপন্নতাকে কাটিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠার নতুন সংগ্রামে শহীদ জননীর আশীর্বাদ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির যথার্থ নেতৃত্বে যথোপযুক্ত আন্দোলনে আবার আমরা চাঙ্গা হয়ে উঠব, এই আশাই ব্যক্ত করতে চাই আজ।

আমরা যথার্থই আশা করতে পারি, বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ এসব পদক্ষেপ কোনো না কোনো দিন গ্রহণ করা হবে। এটাই আজকের প্রত্যাশা।

সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েই ২৪ জন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার সরকারের 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, আজও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হল না। ওরা আশ্রয় পেয়েছিল, প্রশ্রয় পেল, অবশেষে মাথায় চড়ে বসল। তাই ওদের খবরদারিতে আজ বড়োবড়ো রাজনৈতিক দলও কাবু হচ্ছে, ক্ষমতায় বসেছে। কিন্তু কেন? তাই জাহানারা ইমাম বলেছেন, "ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ইতিহাসই নির্দেশ করে, কী করতে হবে। অথচ আজ নির্মম সত্য হচ্ছে, মানুষ ক্ষমতার মোহে ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চায়; কিন্তু ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা করে না।" আমরা কি একথাই মেনে নিতে পারি না যে অতীতের কোনো সরকারই ইতিহাসের এই শিক্ষাকে গ্রহণ করেনি?

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বলতেন : "আমাদের সংগ্রাম একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিরুদ্ধে। গোলাম আযমের বিচার হবে স্পেশাল ট্রাইবুনালে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস এ্যাক্টে (Act XIX of 1973)। গোলাম আযম নাগরিক কি অনাগরিক, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ এই দুর্বৃত্তপ্রধান, তার অনুচর সহচর ও গুপ্তচরেরা এবারে প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় উন্মত্ত। বাঙালির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মন ও মানসিকতায় পঙ্গু ও বিপন্ন করার অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে।" জামাতসহ ফ্যাসিস্ট সকল অপশক্তি বিশেষ করে ধর্মের ছদ্মাবরণে নানা বিভ্রান্তি ছড়াবার যে কৌশল এঁটেছে, তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে শহীদ জননী নবপ্রজন্মকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ তাই নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে আমি প্রস্তাব করতে চাই—শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যে গণসংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, তাকে নতুন করে বেগবান করার প্রয়োজনে অনতিবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী যথার্থ দেশপ্রেমিক, প্রগতির সৈনিক, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদবিরোধী এবং মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় ভিত্তিতে 'মৌলবাদবিরোধী কনভেনশন' আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি,' 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি,' 'মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,' 'মৌলবাদবিরোধী নাগরিক কমিটি,' 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট,' 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ,' 'গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য,' 'প্রজন্ম ৭১', প্রভৃতি এই কনভেনশন আহ্বানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। এভাবেই প্রতিনিধিত্বশীল জনগণের মতামত যাচাই করে ভবিষ্যৎ সংগ্রাম ও প্রতিরোধ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরাপদ জীবন স্থাপনার জন্য আমাদের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

আসুন আমরা পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ আর জনতার ঐক্য গড়ে তুলি।

জয়তু শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।